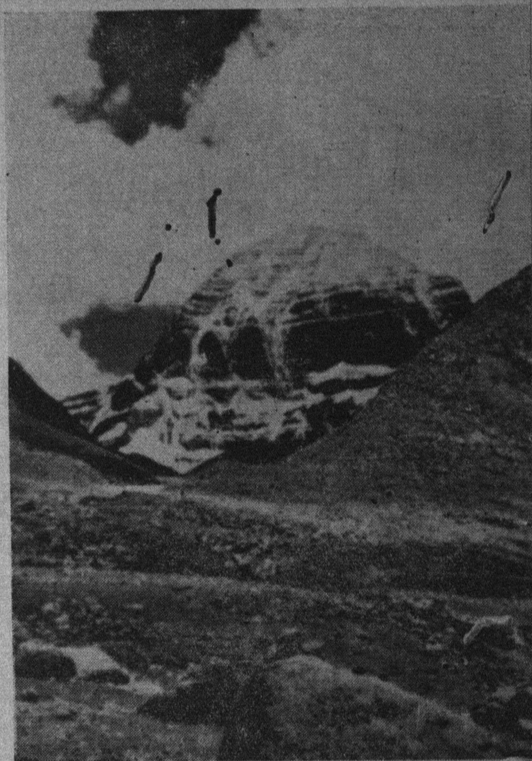
পাশে ঃ কৈলাস পর্বত
নীচে ঃ ত্রিশূল পর্বত







পিথোরাগড়





বৈজনাথ মন্দিরের সামনে স্বামী প্রণবানন্দ

ওয়ান ডাকবাংলো

গিরি-কান্তার

অমর সাহিত্য কাশন
৭ টেমার লেন, কলিকাতা ৯







বাঁদিকে ঃ ওপরে—নন্দকিশোরীর মন্দির, নিচে—মেয়েদের স্কুল-দেবল। ডানদিকে—ওয়ান



প্রথম প্রকাশ, ভাদ্র ১৩৬৭

প্রকাশক :
মণীশ চক্রবর্তী
অমর সাহিত্য প্রকাশন
৭ টেমার লেন,
কলিকাতা ৯

মুদ্রাকর :
সূর্যনারায়ণ ভট্টাচার্য
তাপসী প্রেস
৩০ বিধান সরণী,
কলিকাতা ৬

আলোকচিত্র :
অসিত বসু
অমিতাভ দাশগুপ্ত
বীরেন সরকার ও লেখক



গারবিয়াং



উৎসর্গ

দাদা

শ্রীঅমলচন্দ্র গুহ

দিদি

ডাক্তার পরী বসু

ও

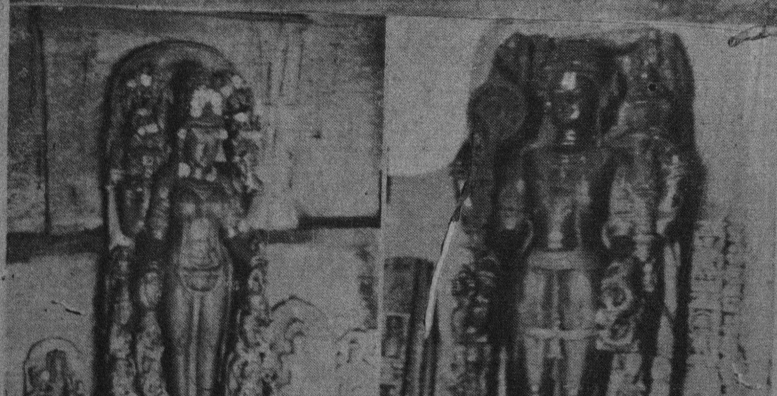
বোন

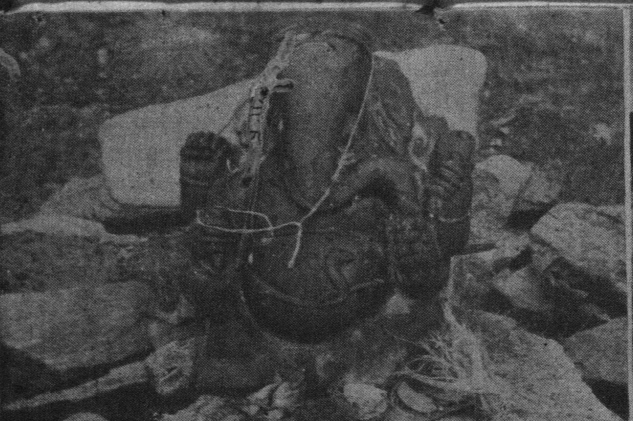
শ্রীমতী গৌরী ঘোষ-কে





মিউজিয়ামে বৈজনাথের মূর্তিসমূহ








বাঁদিকে : ওপরে—কৈলুবিনায়কের মূর্তি, নিচে—বৈদিনী শিবির থেকে ত্রিশূল ও চননিয়াকোট

॥ এক ॥

পুরাণ নয়, দর্শন নয়, কাব্য নয়।

উপন্যাস নয়, গল্প নয়, প্রবন্ধ নয়।

হিমালয়।

কিন্তু হিমালয় কি নয়?

যুগ-যুগান্ত ধরে ভারতের ধর্ম ও ঐতিহ্য, সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে সযত্নে লালন-পালন করে আসছে হিমালয়। হিমালয়ের কাহিনী মানে ভারতের মর্মবাণী।

ভৌগোলিক বিচারে ভারতীয় হিমালয় সাত ভাগে বিভক্ত—আসাম (নেফা), সিকিম, নেপাল, গাড়োয়াল, হিমাচল, কাশ্মীর ও কুমায়ুন হিমালয়।

উত্তরে শতদ্রু, পূবে কালী ও পশ্চিমে পিণ্ডারী বিধৌত পার্বত্য প্রদেশ কুমায়ুন।

কমনীয়া কুমায়ুনের কেন্দ্রভূমি আলমোরা। আলমোরা থেকেই আজ আমাদের যাত্রা হল শুরু। আমরা যাত্রা করেছি কুমায়ুনের দুর্গম গিরি-কান্তারে।

আমাদের কুমায়ুন পরিক্রমা শুরু হয়েছে দিন দশেক আগে। কাঠগুদাম থেকে নৈনিতাল, ভাওয়ালী, রানীক্ষেত, দ্বারাহাট, আলমোরা ও বিনসর হয়ে এবারে চলেছি গোয়ালদাম।

ভৌগোলিক দিক থেকে আলমোরা কুমায়ুনের প্রায় কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। তাই ১৫৬০ সালে চাঁদ রাজা ভীষ্মচন্দ্র তাঁর রাজধানী চম্পাবত থেকে আলমোরায় স্থানান্তরিত করেন। ১৮১৫ সালে কুমায়ুন বৃটিশ অধিকারে আসে। তাঁরাও কুমায়ুন শাসনে আলমোরার উপযোগিতা উপলব্ধি করেন। ... আলমোরা কুমায়ুনের সর্বশ্রেষ্ঠ নগরীরূপে গড়ে ওঠে।

... আলমোরা থেকে বাস যায় দিল্লী ও বেরিলী। যায় কুমায়ুনের সর্বত্র ... কাঠগুদাম, নৈনিতাল, রানীক্ষেত, বাগেশ্বর, গোয়ালদাম, পিথোরাগড় ও বিনসর।

গতকাল আমরা গিয়েছিলাম বিনসর। তুষারমৌলী কুমায়ুন হিমালয়ের



নন্দাঘুন্টি ও ত্রিশূল



সব চেয়ে সুন্দর দৃশ্য দেখা যায় বেরিনাগ কৌসানী ও বিনসর থেকে।

বিনসর আলমোরা থেকে বাসপথে ১৮½ ও হাঁটাপথে ১৩ মাইল উত্তর-পূর্বে অবস্থিত। আলমোরা থেকে কাফরখান হয়ে বাস্থলী পর্যন্ত নিয়মিত বাস চলে। এই পথে ১৫ মাইল গিয়ে কাঠপুরিয়া। সেখান থেকে জীপ চলার উপযোগী বন বিভাগের একটি পথ চলে গেছে বিনসর। সময় কম বলে আমরা আলমোরা থেকে জীপ নিয়ে গিয়েছিলাম।

বিনসর আধুনিক শৈলাবাস হলেও একটি প্রাচীন জনপদ। আলমোরার চাঁদরাজা কল্যাণ (১৭৩০-৪৮খৃঃ) সেখানে বিনেশ্বরের শিবমন্দির নির্মাণ করান। বিনেশ্বর শিব ছিলেন কল্যাণের আরাধ্য দেবতা। দেবতার নামানুসারেই জনপদের নাম হয়েছে বিনসর।

দেবালয়কে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে জনপদ। পেছনে বনাচ্ছাদিত পাহাড়—দেবদারু ছাওয়া ঢুধাতোলি বন। মাঝারি আকারের প্রস্তর নির্মিত মন্দির। গঠনশৈলী উড়িষ্যার রেখ-দেউলের মত। গর্ভগৃহ থেকে মন্দির শীর্ষের নিম্নভাগ পর্যন্ত ওঠার সিঁড়ি আছে। আগে সেখানেই পূজার সামগ্রী রাখা হত। তখন গাড়োয়াল ও কুমায়ুনের অনেক মন্দিরেই এই ব্যবস্থা ছিল। এখনও দু-একটি মন্দিরে এ নিয়ম চালু আছে।

বিনেশ্বর শিবের মাহাত্ম্য একটু স্বতন্ত্র ধরনের। সে মাহাত্ম্যের কথা কুমায়ুনের সর্বজনবিদিত। তাই স্থানীয়রা বলেন—'ভাই বিনসর লু জানি লিও, সমজি লিও।' ভাই বিনসর পথযাত্রী, দর্শনের পূর্বে বিনেশ্বর শিবের মাহাত্ম্যের কথা জেনে নিও, বুঝে নিও। নইলে এ তীর্থযাত্রা বিফল হবে।

বৃটিশ শাসনকালে বিনসর একটি সমৃদ্ধ ইংরেজ উপনিবেশ রূপে গড়ে উঠেছিল। বহু সম্ভ্রান্ত ইংরেজ রাজপুরুষ রাজকার্য থেকে অবসর নিয়ে এখানে বসতি স্থাপন করেছিলেন—সুন্দর সুন্দর বাংলো বানিয়েছিলেন। বাংলোগুলো এখনও আছে, কিন্তু নির্মাতারা প্রায় নেই বললেই চলে। ভারত স্বাধীন হবার পরে বাংলো বিক্রী করে তাঁরা বিদেয় হয়েছেন বিনসর থেকে। তাঁদের শখের বাংলোয় এখন নেটিভরা বাস করছে। কি হল কালে কালে!

বিনসরের পতাকাদণ্ড বা ঝাণ্ডা শৃঙ্গ সমুদ্রসমতা থেকে ৭৯১৩' ফুট। সেখানকার তাপমাত্রা আলমোরার চেয়ে প্রায় ১০° ফারেনহিট কম। তাই জনপদ গড়ে উঠেছে প্রায় তিন চারশ ফুট নিচে।

বিনসরে কয়েকটি আপেল ও নাসপাতি ও অন্যান্য ফলের বাগান আছে।

পর্যটকদের জন্য আছে ফরেস্ট রেস্ট হাউস, একটি টুরিস্ট হোম এবং কয়েকটি কটেজ। ভাড়া আলমোরা থেকে কম। তবে ভাল খাবার পাওয়া যায় না আর এখানে বৈদ্যুতিক আলো নেই। আমরা খাবার সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম। তা ছাড়া আমরা তো সেখানে থাকিনি। সকালে রওনা হয়ে বিকেলেই ফিরে এসেছি আলমোরায়।

বাস চলেছে ছুটে। পাহাড়ের গা দিয়ে পথ। ড্রাইভার রতন সিং স্ফূর্তিবাজ লোক। যেমন জোরে গাড়ি চালাচ্ছে, তেমনি জোরে কথা বলছে। সব কথা বুঝতে পারছি না। তবে তার দিক থেকে চেষ্টার ত্রুটি নেই। আর এই চেষ্টার ফলেই যত বিভ্রাট। তার ধারণা আমরা তার মাতৃভাষা বুঝতে পারব না। ফলে সে মাঝে মাঝেই ইংরেজী বলছে। সে ইংরেজী তার মাতৃভাষার চেয়ে অনেক বেশী দুর্বোধ্য। তবে তার উদ্দেশ্য মহৎ। সে আমাদের মঙ্গলার্থেই গলাবাজি করছে। আমরা তার দেশ দেখতে এসেছি। আমাদের প্রতি তার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। তাই সে যথাসাধ্য তার দেশের খবরাখবর দিচ্ছে।

আলমোরা শহরের প্রায় প্রান্তে এসে পৌচেছি আমরা। এখান থেকে শহর বড়ই সুন্দর দেখাচ্ছে। আলমোরা শুধু কুমায়ুনের কেন্দ্রভূমি নয়—ভারতের একটি শ্রেষ্ঠ শৈলাবাস। সে অপরূপ রূপলাবণ্যের পসরা সাজিয়ে পর্যটকদের আমন্ত্রণ জানায়। তার রূপের আকর্ষণে যুগে যুগে মানুষ ছুটে এসেছে এখানে। এসেছেন বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী। এসেছেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও জওহরলাল নেহেরু।

স্ত্রী কমলা যক্ষ্মায় আক্রান্ত হলেন। তাঁকে নিয়ে আসা হল ভাওয়ালীর স্বাস্থ্যনিবাসে। জওহরলাল তখন নৈনী জেলে। তাঁর অনুরোধে কর্তৃপক্ষ তাকে স্থানান্তরিত করলেন আলমোরা জেলে। স্ত্রীর জন্য তার দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। কিন্তু হিমালয়ের কাছে তিনি অভয় পেলেন। আলমোরার শীতল সমীরে তাঁর দেহমন স্নিগ্ধ ও শান্ত হয়ে উঠল। নেহেরু দর্শন করলেন বনাবৃত পর্বতমালার ওপরে তুষারাবৃত হিমালয়ের চির উন্নত শির—জ্ঞান-গম্ভীর, যুগ-যুগান্তের সদা-জাগ্রত প্রহরী। এদের দেখে তাঁর হৃদয় পূর্ণ হল, মন শান্ত হল। তিনি অনুভব করলেন—সমতলের সমাজের সংঘাত ও ষড়যন্ত্র, কামনা ও বাসনা, লোভ ও কপটতা—এই অনন্তের সামনে নেহাৎ নগণ্য।

এই হল আলমোরা। সেই আলমোরা ছেড়ে চলেছি এগিয়ে, লোকালয়

ছাড়িয়ে—দুর্গম গিরি-কান্তারে। চলেছি গোয়ালদামে—কমনীয়া কুমায়ুনের কোলে। সেখান থেকেই শুরু হবে—আমাদের প্রকৃত যাত্রা—পদযাত্রা। সে যাত্রায় বিপদকে পাশে নিয়ে পথ চলতে হবে। শারীরিক সামর্থ্য ও মানসিক সবলতা সর্বদা অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। শক্তিমান না হলে, নির্ভীক না হলে, এ পথের পথিক হওয়া যায় না। দুর্বলের প্রতি হিমালয়ের কোন দুর্বলতা নেই। যারা তার সকল বিপদ তুচ্ছ করে দুর্বার বেগে এগিয়ে যেতে পারে, তাদের সামনে দেবতাত্মা হিমালয় আপন স্বরূপ প্রকাশ করে। তাদের কণ্ঠেই দুর্গম হিমালয় জয়মাল্য দেয় পরিয়ে। সর্বদুঃখব্যথাহর না হলে অনন্ত-সুন্দরের সঙ্গলাভ করা যায় না।

স্বভাবতই সংশয়ের দোলায় দুলছে আমাদের মন—আমরা কি পৌছতে পারিব ?

নিশ্চয়ই পারব। দুর্গম হিমালয়ের আবহাওয়ায় একটা প্রচণ্ড প্রাণশক্তি লুকনো আছে। এই শক্তি অন্ধকে দৃষ্টিদান করে, খঞ্জকে বেগবান করে, রুগ্নকে রোগমুক্ত করে। কয়েক মিনিট বিশ্রাম করলে, কয়েক ঘণ্টা পথ চলার ক্লান্তি দূর হয়। এই প্রাণশক্তি পথ চলার পাথেয় যোগায় হিমালয় পথযাত্রীকে, তাকে আকর্ষণ করে দুর্গম পথে। সে জীবন তুচ্ছ করে ছুটে আসে তার কাছে।

আলমোরা থেকে একটি পথ চলে গেছে উত্তর-পূবে—বেরিনাগ, আসকোট ও পাঙ্গু হয়ে গার্বিয়াং—নেপাল-তিব্বত সীমান্তের শেষ ভারতীয় গ্রাম। বেরিনাগ থেকে একটি পথ গেছে পিথোরাগড়—জেলা সদর। আগে পিথোরাগড় আলমোরা জেলারই একটি মহকুমা সদর ছিল। চীনা আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬০ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারী আলমোরা জেলার উত্তর উত্তর-পূর্ব অংশের ২৭৮৯ বর্গমাইল নিয়ে একটি পৃথক জেলা তৈরি করা হয়েছে। লোকসংখ্যা মাত্র ২,৬৩,০০০ জন। চারটি মহকুমা নিয়ে এই জেলা—দক্ষিণাঞ্চল পিথোরাগড়, মধ্যাঞ্চল দিদিহাট, উত্তর-পূর্বাঞ্চল ধারচুলা ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল মুনসিয়ারী। লোকসংখ্যা যথাক্রমে ১,০৩,০০০ ; ৯৭,০০০ ; ৩৩,০০০ ও ৩০,০০০ জন।

পিথোরাগড় জেলা কুমায়ুন হিমালয়ের দুর্গমতম অংশ। ত্রিশূল, নন্দাদেবী, নন্দাদেবী-পূর্ব, নন্দাকোট, নন্দাখাত, ত্রিশূলী (অনেকের মতে তীরশূলী) ও পঞ্চচুলি প্রভৃতি হিমালয়ের কয়েকটি বিখ্যাত শৃঙ্গ এই জেলায় অথবা কাছাকাছি অবস্থিত। পিথোরাগড় জেলা নেপাল ও তিব্বতের সঙ্গে ভারতের সীমারেখা

রচনা করেছে। কৈলাস ও মানস-সরোবর পরিক্রমার সব চেয়ে জনপ্রিয় পথ দুটি এই জেলা দিয়ে। কিন্তু প্রচারের অভাবে এ অঞ্চল এখনও হিমালয় প্রেমিকদের কাছে তেমন প্রিয় হয়ে উঠতে পারে নি।

জেলা সদর পিথোরাগড় যাবার দুটি পথ। একটি আলমোরা থেকে, অপরটি টনকপুর রেল স্টেশন থেকে। আলমোরা থেকে পিথোরাগড় ৬৯ মাইল। নিয়মিত বাস চলাচল করে। আট ঘণ্টা সময় লাগে। এই পথে কুমায়ুনের একটি তীর্থস্থান জাগেশ্বর। আলমোরা থেকে বরছিনা অর্থাৎ বড় শৃঙ্গ হয়ে ১৯ মাইল গিয়ে পানুয়ানালা (৬,৫০০´)। সেখানে জেলা পরিষদের ডাকবাংলো আছে। সেখান থেকে আলমোরাকে বড়ই সুন্দর দেখায়।

পানুয়ানালা থেকে এক মাইল দূরে মিরতোলা। ঘন জঙ্গলে ঘেরা একটি রমণীয় স্থান। এখানে স্বামী নিকসন বা কৃষ্ণপ্রেমের আশ্রম আছে। কিছুকাল পূর্বে তিনি দেহরক্ষা করেছেন। মিরতোলা পোস্ট অফিসের কাছে যশোদা মাঈ নির্মিত উত্তর-বৃন্দাবন আশ্রম। আশ্রম থেকে পাঁচ মাইল চড়াই ভেঙে হিরিয়া শিখরে বৃদ্ধ জ্ঞানেশ্বরের প্রাচীন ক্ষুদ্রাকৃতি মন্দিরে পৌছতে হয়। এখান থেকেও আলমোরা এবং নৈনিতাল শৈলশ্রেণীকে বড়ই সুন্দর দেখায়। যতদূর দৃষ্টি চলে কেবল উঁচু-নিচু গহন বনের সবুজ ঢেউ—দিগন্তে গিয়ে নীলাকাশে মিশেছে। চারিদিকে পরম প্রশান্তির মাঝে এই অপরূপ রূপলাবণ্য মানুষের মনকে স্বর্গীয় সুষমায় পূর্ণ করে তোলে। সে উপলব্ধি করে—অনন্তের সঙ্গে তার আত্মার একটা অচ্ছেদ্য সম্পর্ক আছে। মানুষের মন থেকে মর্ত্যভাবনা মুছে যায়।

আরো দেড মাইল নেমে জাগেশ্বরনাথজীর মূল মন্দির। কুমায়ুনের বিখ্যাত মন্দিরগুলির মধ্যে এই মন্দিরটি ধর্মান্ধ মুসলমান আক্রমণকারীদের হাতে সব চেয়ে কম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মূল মন্দিরটি সম্ভবত ত্রয়োদশ শতাব্দীতে নির্মিত। অন্যান্য মন্দিরগুলি পরবর্তীকালে চাঁদরাজারা তৈরি করেছেন। কাত্যুরী আমলেও জাগেশ্বর বিখ্যাত তীর্থ ছিল। অন্যান্য মূর্তির মধ্যে অনেক পৌণ্ড্র রাজার রুপোর মূর্তি এবং চাঁদরাজা বিমলচন্দ্র (১৬২৫-৩৮ খৃঃ) ও দীপচন্দ্রের (১৭৪৮-৭৭ খৃঃ) চন্দনের মূর্তি পাওয়া গেছে। পাওয়া গেছে মাধব সেনের শিলালিপি (১১২৩ খৃঃ) ও লক্ষ্মীচন্দ্রের (১৫৯৭-১৬২১ খৃঃ) দানপত্র। এ অঞ্চলের শিব, শক্তি ও সূর্য মূর্তিসমূহকে ঐতিহাসিকরা গুপ্ত-

যুগের শিল্পরীতির পূর্বসূরী বলে অনুমান করে থাকেন।

কথিত আছে দক্ষযজ্ঞের পরে একদা শিব এখানে কিছুকাল তপস্যা করেছিলেন। স্কন্দপুরাণে জগেশ্বরনাথজীর মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। তাই স্থানীয়রা বলেন—জাগেশ্বরনাথজী দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম নাগেশ জ্যোতির্লিঙ্গ। প্রকৃতপক্ষে জাগেশ্বরের কাছাকাছি কয়েকটি নাগমন্দিরও আছে—বেণীনাগ, ধোলনাগ, কালিয়ানাগ, পিঙ্গলনাগ, মূলনাগ, ফণিনাগ ও বাসুকীনাগ। এইসব অঞ্চলও জাগেশ্বর ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত। এইসব মন্দিরের মূর্তিশিল্প ও স্থাপত্যকলা বড়ই সুন্দর। তাই পুরাতত্ত্ববিভাগ মন্দির-সমূহের রক্ষণাবেক্ষণ করছেন ও একটি ছোট সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠা করেছেন।

দেওদার বৃক্ষ শোভিত একটি অনিন্দ্যসুন্দর সংকীর্ণ উপত্যকার মধ্যে জাগেশ্বরনাথজীর মন্দির অবস্থিত। উচ্চতা ৫৬০০ ফুট। এখানে কিছু বাড়িঘর, দোকানপাট, কয়েকটি ধর্মশালা ও একটি টুরিস্ট হাউস আছে। আর আছে একটি স্বচ্ছ শীতল ঝরণা। বৈশাখী পূর্ণিমা ও শিবরাত্রিতে মেলা বসে এখানে।

আলমোরা থেকে জাগেশ্বর যাবার সহজ পথ পানুয়ানালা ছাড়িয়ে আরও দু মাইল গিয়ে আরতোলা হয়ে। জাগেশ্বরনাথজীর মন্দির আরতোলা থেকে সোয়া দুই ও আলমোরা থেকে সোয়া তেইশ মাইল। এখন মন্দির পর্যন্ত মোটর যায়।

পিথোরাগড়ের পথে আরতোলা ছাড়িয়ে গঙ্গোলীহাট (৫৫৮০´) একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম। এখানে কয়েকটি মন্দির ও বাজার আছে। বাজার ছাড়িয়ে ঘন দেওদার বনের ভেতরে মহাকালীর মন্দির। মহাষ্টমীর দিন মেলা বসে এখানে। গ্রামের দক্ষিণ-পশ্চিমে কয়েকটি প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে। কুমায়ুনের চতুর্থ ডেপুটি কমিশনার (১৮৪৮ খৃঃ) মিস্টার ব্যাটেন ১৮৪০ সালে শিকার করতে এখানে এসেছিলেন। তখন এ অঞ্চলে মানুষখেকো বাঘের খুবই উপদ্রব ছিল।

গঙ্গোলীহাট থেকে সাড়ে ছ মাইল দূরে পাতাল ভুবনেশ্বর—তিনটি প্রাচীন মন্দির আছে এখানে। মন্দিরের ক্ষত্রিয় পূজারী দর্শনার্থীদের সানন্দে পথ দেখিয়ে দেন। মন্দিরের কাছেই একটি দর্শনীয় গুহা আছে। গুহামুখটি খুবই সংকীর্ণ। টর্চ হাতে হামাগুড়ি দিয়ে ভেতরে ঢুকতে হয়। ভেতরটা অন্ধকার স্যাঁতস্যাঁতে ও ঠাণ্ডা। ওপর থেকে স্ট্যালাকটাইট (stalactite)

ও সিয়াল্যাগমাইট (sialagmite) ঝুলছে আর ফোঁটা ফোঁটা জল চুঁইয়ে পড়ছে। অথচ এই গুহার দেয়ালে কে বা কারা মহাভারতের কয়েকটি উপাখ্যানের চিত্ররূপ খোদাই করে রেখেছেন।

তার পরেই পিথোরাগড় পথের বড় জায়গা বেরিনাগ বা বেণীনাগ (৫৫০০´)। এখান থেকে পাতাল ভুবনেশ্বর ১১ মাইল। বেরিনাগ পিথোরাগড় ও থল পথের জংশন। যাঁরা সোজা গারবিয়াং যেতে চান, তাঁরা বেরীনাগ থেকে থল ও দিদিহাট হয়ে আসকোট যান। তাঁদের পিথোরাগড় যাবার প্রয়োজন হয় না। সেকালে কৈলাস ও মানস-সরোবরের যাত্রীরা যাবার পথে আলমোরা থেকে এই পথে গারবিয়াং হয়ে তাকলাকোট যেতেন। কিন্তু ফেরার পথে তাঁরা আসকোট থেকে পিথোরাগড় ও মায়াবতী হয়ে টনকপুরে এসে রেল ধরতেন।

বেরিনাগ বেণীনাগের বাসস্থান। মহাভারতে আছে, কৌরবকুলোৎপন্ন এই নাগ জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞে দগ্ধ হয়েছিলেন। এখানে বেণীনাগ নামে একটি পর্বতশৃঙ্গও আছে। এককালে এখানকার চা বিখ্যাত ছিল। এখান থেকে বাগেশ্বর যাবার একটি হাঁটাপথ আছে। এই পথে চার মাইল গেলে নারগোলী গ্রাম। সেখান থেকে এক মাইল দূরে একটি শিখরের ওপরে বিখ্যাত ভদ্রকালীর মন্দির। এখানে ভদ্রকালী বা ভদ্রাবতী নদী একটি গুহার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। বেরিনাগ থেকে দশ মাইল দূরে শনি-উদয়র। কথিত আছে, ছান্দোগ্য উপনিষদ ও শতপথ ব্রাহ্মণের অগ্নিকাণ্ড রচয়িতা ঋষি শাণ্ডিল্য এখানে তপস্যা করেছিলেন। এখান থেকে নীলকণ্ঠ, নন্দাদেবী, ত্রিশূল প্রভৃতি পর্বতশিখরের দৃশ্য বড়ই সুন্দর।

বেরিনাগ থেকে পিথোরাগড় প্রায় সমতল পথ। ভারী সুন্দর পথ। কুমায়ুনের সুন্দরতম উপত্যকা। পাঁচ মাইল দীর্ঘ ও তিন মাইল প্রশস্ত এই উপত্যকা। উচ্চতা ৫৪৬৪ ফুট। উপত্যকার বুক চিরে বয়ে গেছে রামগঙ্গা, লোহাঘাট গিয়ে কালীগঙ্গায় মিশেছে। মধ্যযুগে এই উপত্যকা শোর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল—নাম ছিল উদয়পুর। কিছুকাল আগেও পিথোরাগড ছিল একটি মহকুমা শহর। এখন জেলা সদর হয়েছে। তাই শহর ক্রমেই বড় হচ্ছে।

উপত্যকার পূবে ও উত্তর-পূবে সাত হাজার ফুট উঁচু দুর্গা পর্বতমালা—সর্বোচ্চ শৃঙ্গ ধ্বজশিখর (৮১৪৯´)। এই পর্বতমালা পেরিয়েই আলমোরা থেকে

পিথোরাগড় পৌঁছতে হয়। উপত্যকার দক্ষিণ-পূর্বে থাকিল পর্বতমালা। এর তিনটি শৃঙ্গ দেখার মত।

একালের পিথোরাগড় সেকালের উদয়পুর। একালে পিথোরাগড় পরিণত হয়েছে সমৃদ্ধ জনপদে, কিন্তু সেকালের উদয়পুরও অবহেলিত ছিল না। তাই সামন্ত রাজারা তৈরি করেছিলেন বিলকিগড়, আজও তার ভগ্নাবশেষ আছে। তারপরে এসেছে ইংরেজ। গড়েছে নতুন কেল্লা—ফোর্ট লণ্ডন। পিথোরাগড় নেপাল সীমান্ত ঝুলাঘাট থেকে মাত্র ১৪ মাইল দূরে।

এখানে আমেরিকান মিশনারীদের একটি কেন্দ্র আছে। এখানে তাঁরা স্কুল, হাসপাতাল ও কুষ্ঠাশ্রম তৈরি করেছেন।

আলমোরা থেকে কৈলাস যেতে হলে পিথোরাগড় আসার কোন দরকার নেই। যাত্রীরা বেরিনাগ থেকে থল আসকোট ধারচুলা হয়ে গারবিয়াং পৌঁছতে পারেন। কিন্তু এখন গারবিয়াং যেতে হলে 'ইনার লাইন পারমিট' নিতে হয়। জেলা সদর বলে এই পারমিটের জন্য সবাইকে পিথোরাগড আসতে হয়।

পিথোরাগড থেকে তিনটি পথ গেছে তিন দিকে—আলমোরা, গারবিয়াং ও টনকপুর। টনকপুরের পথে লোহাঘাট ও চম্পাবত। লোহাবতী নদীর তীরে নেপাল সীমান্ত থেকে মাত্র ১৫ মাইল দূরে অবস্থিত লোহাঘাট। একটি মহকুমা সদর। পিথোরাগড় থেকে ৬ মাইল ও আলমোরা থেকে ৭৫ মাইল। তৃণময় উঁচু-নিচু সবুজ প্রান্তর ও দেওদার বনের নৈসর্গিক শোভার জন্য লোহাঘাট বিখ্যাত। এখানে লোহা ও তামা পাওয়া যায়।

স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত মায়াবতী আশ্রম এখান থেকে হাঁটাপথে তিন মাইল ও মোটরপথে ছয় মাইল। মায়াবতী ছাড়াও চারিপাশে অনেক দর্শনীয় স্থান আছে। এদের মধ্যে এ্যবট্ মাউণ্ট কলোনী (৩ মাইল), ও পুল হিন্দোলা (৮ মাইল) উল্লেখযোগ্য। এখান থেকে দেবীধুরা (২৩ মাইল), মারনাউলা (৩৩ মাইল) ও লামগড়া (৪৩ মাইল) হয়ে আলমোরা (৫৩ মাইল) যাবার একটি হাঁটাপথ আছে। লোহাঘাটে নির্মাণ বিভাগের একটি চমৎকার ইন্‌স্পেকশন হাউস আছে। এখানে আগে একটি সেনানিবাস ছিল। দেবীধুরা আলমোরা থেকে হাঁটাপথে ৩০ মাইল। এখানে বরাহী দেবীর মন্দির আছে। সেখানে রক্ষা-বন্ধন দিবসে একটি মেলা বসে। রাত্রিবাসের জন্য জেলা পরিষদের ডাকবাংলো আছে।

জিম করবেটের ম্যান ঈটারস অভ কুমায়ুন গ্রন্থে চম্পাবত (৫৫৪৬´) নামটি অমর হয়ে আছে। এই বিশ্ববিখ্যাত শিকার কাহিনীর প্রথম কাহিনীটি গড়ে উঠেছে চম্পাবতের এক মানুষখেকোকে নিয়ে। নেপালে দুশো মানুষ সাবাড় করে সে এসেছিল কুমায়ুনে। চম্পাবতের আশেপাশে চার বছরে সে আরও দুশো চৌত্রিশটি লোককে ঘায়েল করেছিল। গ্রামবাসীরা এতই আতঙ্কগ্রস্ত হয়েছিলেন যে করবেট অকুস্থলে গিয়ে শুনলেন পাঁচ দিনের মধ্যে কেউ বাড়ির বাইরে আসেন নি। ভাঙা বন্দুক দিয়ে করবেট এই বাঘিনীকে মেরে চম্পাবতের জনজীবনকে নির্বিঘ্ন করেছিলেন।

নরখাদক বাঘিনীর জন্য যে চম্পাবত আজ বিশ্ববিখ্যাত, সে কিন্তু কুমায়ুনী সভ্যতার সূতিকাগার। এই চম্পাবত থেকেই চাঁদরাজাদের অভ্যুত্থান। আর তাঁদের রাজ্যই পরবর্তীকালে কূর্মাচল তথা কুমায়ূঁ বা কুমায়ুন নামে পরিচিত হয়েছে।

চন্দ্রবংশের অভ্যুত্থান হয় ৯৫৩ সালে। সেই থেকে ১৫৬০ সালে ভীষ্মচন্দ্র আলমোরায় রাজধানী স্থানান্তরিত করা পর্যন্ত চম্পাবত চাঁদরাজাদের রাজধানী ছিল। তারপর থেকেই চম্পাবতের পতন শুরু হয়। ১৮৮১ সালে জনসংখ্যা দাঁড়ায় মাত্র ৩৫৮ জন। আজও চম্পাবত নামেমাত্র আলমোরা জেলার একটি মহকুমা। সদর কিন্তু লোহাঘাট। মহকুমার লোকসংখ্যা মাত্র ৮০,৩০৪ জন। ইতিহাসের কি বিচিত্র বিধান।

সেকালের কিছু কিছু কীর্তি এখনও চম্পাবতে কোনমতে টিঁকে আছে। আছে বালেশ্বর মন্দির—প্রাচীন কুমায়ুনী বাস্তুশিল্পের একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। বিশেষ করে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরের এবং ছাদের ভেতর দিকে কালীয়দমনের খোদিত মূর্তি। বাজারের নিচেই পুরনো কেল্লা কোটালগড়—অনেক উত্থান-পতনের নীরব সাক্ষী। প্রাচীন রাজমহলের ধ্বংসাবশেষ এখনও রয়েছে। চাঁদরাজারা এখানে একটি পাহাড় কেটে সমতল করে চারটি মন্দির তৈরি করেছিলেন। এদের মধ্যে রত্নেশ্বর এবং দুর্গা মন্দির বিখ্যাত। এ দুটি মন্দির মোটামুটি অক্ষত আছে। মন্দিরগাত্রের ভাস্কর্য দেখার মত। কাছেই কূর্মপর্বতে ঘটকু দেবের মন্দির। প্রতি বছর মেলা বসে এখানে। এই কূর্মপর্বত থেকেই কুমায়ুন নামের উৎপত্তি।

দেবাসুরের সমুদ্রমন্থন শেষ হল। অমৃত পান করে দেবগণ অ-মৃত হলেন। লক্ষ্মীহীন স্বর্গে লক্ষ্মী ফিরে এলেন। কিন্তু যাঁর সাহায্য ছাড়া

সমুদ্রমন্থন সম্ভব হত না, সেই কূর্মাবতারের কথা দেবতারা বিস্মৃত হলেন। অকৃতজ্ঞ দেবতাদের আচরণে ক্ষুব্ধ হলেন তিনি। অবহেলিত কূর্মাবতার সাগর থেকে উঠে চলতে শুরু করলেন। থামলেন এসে এখানে। তিন বছর দাঁড়িয়ে থেকে বিষ্ণুর তপস্যা করলেন। কূর্মাবতারের সেই তপোভূমি পরিচিত হল কূর্মপর্বত বা কূর্মাচল নামে। পর্বতশীর্ষে একখানি পাথরের ওপর এখনও কূর্মাবতারের চরণচিহ্ন বর্তমান।

পিথোরাগড জেলার কৃষিজাতদ্রব্য—ভুট্টা, মাদিরা, বাজরা, গম, সর্ষে, মুসুর ও মাসকলাই, আলু ও লাল মরিচ আর আপেল খুবানী ও কমলালেবু প্রভৃতি ফল। পিথোরাগড় নেপাল ও তিব্বতের সঙ্গে আমাদের সীমান্ত রচনা করেছে। কাজেই এই জেলাকে খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলার চেষ্টা চলেছে। বর্তমানে পিথোরাগডের বাৎসরিক খাদ্য ঘাটতির পরিমাণ প্রায় সাড়ে সাত লক্ষ মণ। সম্প্রতি স্থির হয়েছে যে আটটি ব্লকের প্রত্যেকটিতে ২৩০০ একর চাষের জমি উদ্ধার করতে হবে। এর মধ্যে ৮০০ একরে আলুর চাষ করা হবে। 'নিজের সবজি নিজে ফলান' আন্দোলনকে জোরদার করা হচ্ছে। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে এ জেলার খাদ্যাভাব দূর হবে। সে সুদিনকে স্বাগত জানাই।

পিথোরাগড থেকে গারবিয়াংয়ের পথটি দিদিহাট গিয়ে আলমোরা—গারবিয়াং-য়ের মূল পথের সঙ্গে মিশেছে। দরমা নদীর উপত্যকায় অবস্থিত দিদিহাট সেকালে শিরা রাজ্যের রাজধানী ছিল। উচ্চতা ৬০০০ ফুট। এখন মহকুমা শহর। মহকুমার লোকসংখ্যা ৯৭,০০০। পথে রামগঙ্গা পেরোতে হয়। নদীর তীরে চাঁদরাজা উদ্যোৎচন্দ্রের (১৬৭৮-৯৮ খৃঃ) প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দির আছে। মন্দিরটি অলঙ্কারবর্জিত, তেমন উঁচুও নয়। অথচ দেখতে অনেকটা ভুবনেশ্বরের মন্দিরের মত। এই নদীর তীর দিয়ে নতুন মোটরপথ তৈরি হয়েছে তেজাম হয়ে মুনসিয়ারী পর্যন্ত।

থল আলমোরা থেকে ১০২ ও বেরিনাগ থেকে ৫২ মাইল। থল শব্দের অর্থ স্থল বা স্থান। চলতি বাংলায় আমরা যেমন স্থানকে থান বলি তেমনি কুমায়ুনীরাও স্থলকে থল বলেন। এ জায়গাটি দেওতাকা থল অর্থাৎ দেবস্থল। এখানে চাঁদরাজা ও আসকোটের রাজাদের নির্মিত কয়েকটি পুরনো ছোট ছোট মন্দির আছে। গ্রামের মধ্য দিয়ে রামগঙ্গা বয়ে যাচ্ছে। রামগঙ্গার দু-তীরেই জনপদ। বাঁ তীরে বালেশ্বর মহাদেবের মন্দির—যেখানে থলের

মেলা বসে। এখানে শীত খুব কম কারণ উচ্চতা মোটে ৩০০০ ফুট। ছোট একটি পাহাড়ের ওপর ঝরণার ধারে বনবিভাগের বিশ্রাম-ভবন আছে।

থলের মেলা কুমায়ুনের একটি বিখ্যাত সামাজিক ও অর্থনৈতিক মহাসম্মেলন। চৈত্র সংক্রান্তির দিন এই মেলা বসে ও সাত দিন স্থায়ী হয়। পঁচিশ-তিরিশ হাজার লোক এই মেলায় অংশ নেয়।* এদের মধ্যে ভুটিয়াদের সংখ্যাই বেশী। তবে আলমোরা, বেরিনাগ, পিথোরাগড় থেকেও বহু লোক আসে। পাহাড়ীরা উল ও তরিতরকারীর বিনিময়ে চাল গম নুন তেল ও জুতো নিয়ে যায়। মহাজনরা এই মেলাতে বসে হালখাতা করেন। স্থানীয় জনসাধারণেরও এই মেলা থেকেই শুভ নব-বর্ষ। শীতের শেষে কর্মজীবন শুরু করার পূর্বক্ষণে তাঁরা এই মেলায় আসেন। মেলা-শেষে যে যার আপন আপন কর্মে যোগদান করেন।

দিদিহাট ছাড়িয়ে আসকোট। একটি সুপ্রাচীন জনপদ। উচ্চতা ৪৫০০ ফুট। চতুর্দশ থেকে ষোড়শ শতাব্দীতে মধ্য হিমালয়ের একটি শক্তিশালী রাজ্য ছিল ডোটি। আসকোট ডোটির রাজধানী ছিল। শিরা (দিদিহাট) ও শোর (পিথোরাগড) এই রাজ্যের অধীনে সামন্ত রাজ্য ছিল।

কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে অযোধ্যার রাজা শালিবাহন পাল বহিঃশত্রুর আক্রমণে বিতাড়িত হয়ে আসকোটে এসে বাস করতে থাকেন। ধীরে ধীরে আশেপাশের তিরিশ মাইল বিস্তৃত এলাকায় একটি ছোট রাজ্য গড়ে ওঠে। এই রাজ্যে আটটি কোট বা দুর্গ ছিল বলে পরবর্তীকালে এর নাম হয় অষ্টকোট বা আসকোট। আরেক দল ঐতিহাসিক বলেন—রাজা অশ্বকোটের নাম থেকে এই রাজ্যের নাম হয় আসকোট। মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়নের মতে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে কাত্যুরী রাজ্য খণ্ড খণ্ড হয়ে যায়। রাজবংশধরগণ রাজ্যের বিভিন্ন অংশে ছটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। ১২৭৯ সালে ত্রিলোকপালের পুত্র নিরঞ্জনদেব ডোটিরাজ্য স্থাপন করে ছোট ভাই অভয়পালকে আসকোটের রাজওয়াড় (রাজকুমার) বা শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। তাঁর বংশধরগণ আজও রাজওয়াড় নামে পরিচিত। তাঁরা এখনও এখানেই বাস করেন।

শিল্পাচার্য শ্রীপ্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৯১৮ সালে কৈলাসের পথে আসকোটে এসেছিলেন। তখন বৃদ্ধ রাজওয়াড় সাহেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র ভূপেন্দ্রসিং পালের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। প্রমোদবাবু তাঁর কাছে একখানি তুলোট

কাগজে লেখা মানসখণ্ডের পুঁথি দেখেছিলেন। এতে হিমালয়ের সমস্ত তীর্থের কথা লেখা ছিল এবং মানস-সরোবরকে শেষ হিন্দু তীর্থ বলে বর্ণনা করা হয়েছিল। প্রমোদবাবুর ভ্রমণকালে আসকোটের ক্ষত্রিয় সমাজে একটি অদ্ভুত নিয়ম ছিল—ছেলেরা মায়ের হাতের রান্না খেত না। ক্ষত্রিয় রাজারা যে কোন জাতি থেকে স্ত্রী গ্রহণ করতে পারতেন। কিন্তু রানীদের ক্ষত্রিয়ের অধিকার দিতেন না। অথচ তাঁদের পুত্ররা পিতার বংশমর্যাদা পেতেন। তাই তাঁরা মায়ের রান্না খেতে পারতেন না। এখন অবশ্য এ নিয়ম আর নেই বললেই চলে।

আসকোটের উচ্চতম শৃঙ্গে একটি কালিকা দেবীর মন্দির আছে। সন্তান কামনা ও রোগমুক্তির জন্য সকলে এখানে পুজো দিতে আসেন।

আসকোট পরগণা দিদিহাট মহকুমার অন্তর্গত। পরগণার আয়তন ৪০০ বর্গমাইল। ১৪২টি গ্রাম আছে। পরগণার উচ্চভূমি তথা জনবিরল পাহাড়ী অঞ্চলকে বলা হয় মল্লা। এই অঞ্চলের প্রধান জীবিকা পশুপালন। কালীনদীর উপত্যকা খুবই উর্বর।

আসকোট থেকে ছ মাইল এগিয়ে কালী ও গৌরীগঙ্গার সঙ্গমে জৌলজিবী। উচ্চতা মাত্র ২১০০ ফুট। সঙ্গমের ওপরেই একটি ছোট মহাদেব মন্দির ও ধর্মশালা আছে। মন্দিরের চারিদিকে আম্রবন। ধর্মশালাটি ১৯৪৪ সালে আসকোটের রানী তৈরি করে দিয়েছেন। এখান থেকে সঙ্গমের দৃশ্য বড়ই সুন্দর। সদাচঞ্চলা কালীর ফেনিল উর্মিমালা ক্রমাগত গৌরীকে আলিঙ্গন করছে। কালী এসেছে লিপুলেখ গিরিবর্ত্ম থেকে আর গৌরী মিলাম হিমবাহ থেকে।

জৌলজিবীর মেলা কুমায়ুনের বৃহত্তম সামাজিক মহাসম্মেলন। কার্তিক-সংক্রান্তিতে এই মেলা বসে ও চার-পাঁচ দিন ধরে চলে। ১৯১৪ সাল থেকে এই মেলা শুরু হয়েছে। কালী নদী ভারত নেপাল সীমারেখা। কাজেই দলে দলে নেপালী এই মেলায় যোগদান করে। গালিচা, কম্বল, উল, গরম কাপড়, রকমারী পাহাড়ী নুন, কস্তুরী, বাঘ হরিণ ভেড়া প্রভৃতির চামড়া, টাংঘন ঘোড়া, খচ্চর ফলমূল তরিতরকারী ঘি প্রভৃতি সবই কেনাবেচা হয়।

কেবল কেনাবেচাই নয়, এখানে একটি আন্তর্জাতিক সঙ্গীত সম্মেলনও অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। প্রতি রাতেই নাচগানের আসর বসে। অভিনেতা অভিনেত্রীরা যে যার নিজ নিজ ভাষায় ও ভঙ্গিতে মনোরঞ্জন করে সবাইকে।

তিব্বত নেপাল ও কুমায়ুন এক হয়ে যায়।

জৌল শব্দের অর্থ সঙ্গম। জিব মানে জিহ্বা—দুই জলধারার মধ্যবর্তী সংকীর্ণ ভূখণ্ড। মহাদেবের মন্দিরের নিচে মুসলমান বস্তী। জোলা ও শিল্পীকার সম্প্রদায় থেকে এরা ধর্মান্তরিত হয়েছে। বস্তির পশ্চিমে ভুটিয়াদের শীতকালীন আবাস।

কালী নদীর দক্ষিণ তীরে জৌলজিবী থেকে আড়াই মাইল দূরে হংসেশ্বর মহাদেবের মন্দির। এখানে বহুকাল ধরে একজন সাধক বাস করতেন। তিনি ১৩০ বছর বয়সে ১৯৪৫ সালে দেহরক্ষা করেছেন।

জৌলজিবী থেকে মাইল বিশেক এগিয়ে ধারচুলা। পথটি বড়ই সুন্দর। পথে পড়ে বালুয়াঘাট। একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম। উচ্চতা ৩০০৯ ফুট। এটিও ভুটিয়াদের শীতকালীন আবাস। এখানে ধর্মশালা ও ডাকবাংলো আছে।

ধারচুলার উচ্চতা ৩০০০ ফুট। এখন মহকুমা শহর। মহকুমার লোকসংখ্যা মাত্র তেত্রিশ হাজার। এখানে কলা আম ও পেয়ারা প্রচুর উৎপন্ন হয়। এখান থেকে নেপালের রাস্তা আছে। বহুকাল থেকেই ধারচুলা নেপাল ভারত আমদানি রপ্তানির একটি প্রধান ঘাঁটি।

১৯৩৬ সালের জুলাই মাসে এ অঞ্চলে প্রচণ্ড ভূমিকম্পের ফলে ধারচুলার প্রভূত ক্ষতি হয়েছে। অনেক বাড়িঘর ভেঙে গেছে। আশা করি জনসাধারণের ও সরকারী প্রচেষ্টার ফলে কিছুদিনের মধ্যে ধারচুলা তার স্বাভাবিক জীবন-যাত্রাকে ফিরে পাবে।

এখান থেকে দু মাইল দূরে ক্ষমা দেবী প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশন। বর্তমানে এটি ধর্মসেবা সঙ্ঘের আশ্রম। কাছেই একটি উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। ক্ষমা দেবী গারবিয়াংয়ের জুনিয়া সিং নামে একজন অবস্থাপন্ন ভুটিয়া ব্যবসায়ীর ছোট মেয়ে। ছোটবেলায় তাঁর বাবা-মা কলেরায় মারা যান। তাঁর তিন দিদি তাঁকে মানুষ করেন। পনেরো বছর বয়সে তাঁর বিয়ে হয়। কিন্তু তিনি মাতাল স্বামীর ঘর করতে পারেন নি। ক্ষমা দেবী বাপের বাড়িতে থেকে ভগবানের নাম ও সাধুসেবা করতেন। সেকালের কৈলাসযাত্রীরা অনেকেই তাঁর বাড়িতে উঠতেন এবং তিনি তাঁদের তীর্থযাত্রার সমস্ত বন্দোবস্ত করে দিতেন। তাঁর মত মহীয়সী মহিলা বড় একটা দেখা যায় না।

ভারত স্বাধীন হবার পর থেকেই জাতীয় সরকার হিমালয়ের বিভিন্ন অঞ্চলের উন্নতি বিধানের জন্য নানা পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছেন। উত্তরাখণ্ড

বিভাগের উন্নয়নে এ পর্যন্ত ২৪ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। কিন্তু আশানুরূপ ফললাভ হয় নি। তাই কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৫৫-৬০ সালে জম্মু-কাশ্মীর, হিমাচল ও উত্তরাখণ্ডের সীমান্ত অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য মোট ১ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করেছিলেন। কিন্তু ১৯৫৫-৬০ সালে কেবল উত্তরাখণ্ডের জন্যেই দেড় কোটি টাকা মঞ্জুর করেছেন। আশা করি পরিকল্পনাকারীরা এ অঞ্চলের বিচিত্র ভৌগোলিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার কথা মনে রেখে উন্নয়ন পরিকল্পনাকে রূপদান করবেন।

ধারচুলা থেকে গারবিয়াং হাঁটাপথে ৫৫ মাইল, বাসপথে একটু বেশী। ধারচুলা থেকে মাইল পাঁচেক এগিয়ে একটি পায়ে চলা পথ দিয়ে পৌছনো যায় যুম্‌মা নামক গ্রামে। গ্রাম ছাড়িয়ে আরো কয়েক মাইল এগিয়ে, বড় রাস্তা থেকে ২১ মাইল দূরে ছিপলাকোট হ্রদ। পথটি খুবই কষ্টকর। কিন্তু সেখানে পৌছতে পারলে সকল শ্রম সার্থক হয়। চোদ্দ হাজার ফুট উঁচুতে রমণীয় প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে অবস্থিত এই হ্রদের তীরে পৌছে পথিক পথশ্রম বিস্মৃত হন। পঞ্চচুলি শৃঙ্গমালাকে এখান থেকে সব চেয়ে সুন্দর দেখায়। দুটি হ্রদ আছে এখানে। বড়টির পরিধি ১০২০ ফুট ও ছোটটির ৮৪০ ফুট। বড়টি তবু কয়েক ফুট গভীর কিন্তু ছোটটি একেবারেই অগভীর—ফলে শীতের প্রথম দিকেই শুকিয়ে যায়। এই দুটিকে ছিপলা-কেদার এবং নাজুরি-মুণ্ডও বলা হয়। চারিপাশের পনেরোটি গাঁয়ের বাসিন্দারা এদের পরম পবিত্র তীর্থরূপে জ্ঞান করেন। বর্ষাকালে হ্রদের জলে হাজার হাজার ব্রহ্মকমল ফোটে। বিকশিত পারিজাতের সুবাসে পথিক পাগল হয়।

আরও প্রায় ৫ মাইল অর্থাৎ হাঁটাপথে ধারচুলা থেকে ১০ মাইল এগিয়ে খেলা—একটি গ্রাম। উচ্চতা ৫৫০০ ফুট। এই গ্রামের অনতিদূরে একটি বিচিত্র গুহা আছে। স্থানীয়রা বলেন 'খর উদিয়ার' অর্থাৎ মৃত্যু-গুহা। গুহাটি ২৪ ফুট লম্বা ৬ ফুট করে চওড়া ও উঁচু। গুহামুখটি অবশ্য ৯ ফুট চওড়া ও ১২ ফুট উঁচু। জনশ্রুতি ছিল যে এই গুহায় প্রবেশ করা মাত্র নাকি মানুষ মরে যায়। কথাটা যে সত্য নয় তা প্রথম প্রমাণ করেন সত্যসন্ধানী সন্ন্যাসী স্বামী প্রণবানন্দ। তিনি কোমরে দড়ি বেঁধে নিঃশ্বাস বন্ধ করে ১৯৩৭ সালের ৫ই অক্টোবর এই গুহায় প্রবেশ করেন। তিনি ভেতরে কয়েকটি পশু-পক্ষী ও সরীসৃপের মৃতদেহ এবং কঙ্কাল দেখতে পান। স্বামীজী ১৯৩৯ সালের ১৮ই অক্টোবর ও ১৯৪০ সালের ১২ই নভেম্বর—আরও দুবার এই গুহায়

প্রবেশ করেন। তাঁর মতে বর্ষাকালে জল ঢুকে এই গুহার ভেতরে কার্বন-ডাইঅকসাইড গ্যাসের সৃষ্টি হয়। আর তারই ফলে পশুপক্ষী প্রবেশ করা মাত্র মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

১৯৫৫ সালে গারবিয়াং থেকে ৬ মাইল দূরবর্তী নেপালী গ্রাম টিঙ্কারের কাছে মনুষ্য-অস্থি ও পোশাক-পরিচ্ছদ পরিপূর্ণ একটি গুহা আবিষ্কৃত হয়েছে। একজন মেষপালক এই গুহাটি আবিষ্কার করে। পণ্ডিতগণ অনুমান করেন টিঙ্কার অধুনা বিস্মৃত সিমকোট রাজ্যের (খৃষ্টীয় পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দী) অন্তর্ভূত ছিল। কয়েকজন জাপানী পণ্ডিত এই গুহাটি নিয়ে গবেষণা করেছেন। এই গবেষণা সিমকোট সভ্যতার ওপরে নতুন আলোকপাত করেছে।

ধারচুলা থেকে হাঁটাপথে সাড়ে এগারো মাইল এগিয়ে ধৌলিগঙ্গা—এখান থেকেই ভুটিয়াদের নিবাস শুরু। এরা তিব্বতী মিশ্রিত ভাষা বলে। গ্রীষ্মকালে ভেড়ার পাল নিয়ে দেশ-দেশান্তরে বাণিজ্য করে বেড়ায়। আর শীতকালে অপেক্ষাকৃত নিম্নভূমিতে বসবাস করে। এরা অত্যন্ত কষ্টসহিষ্ণু ও পরিশ্রমী। গাড়োয়াল ও কুমায়ুনের ভুটিয়ারা ভুটান, সিকিম, নেপাল ও তিব্বতের ভুটিয়াদের মত বৌদ্ধ নয়—এরা ক্ষত্রিয়।

খেলা থেকে গারবিয়াং প্রায় পঞ্চাশ মাইল। গারবিয়াং ১০৩২০ ফুট উঁচু একটি বিশিষ্ট ভুটিয়া জনপদ—তিব্বত সীমান্তের শেষ ভারতীয় গ্রাম। আলমোরা ও পিথোরাগড় থেকে এখন নিয়মিত বাস চলাচল করে। তবে এই মোটরপথ তৈরি হয়েছে মাত্র কয়েক বছর আগে। অতীতে এ পথ বড়ই কষ্টকর ছিল—বিশেষ করে পাঙ্গুর আগে। কিন্তু সেই অমানুষিক কষ্ট সহ্য করেও শত শত তীর্থযাত্রী প্রতি বছর এই পথে পাড়ি দিতেন—কৈলাস-মানস পরিক্রমায় আসতেন। আজকাল পথকষ্ট দূর হয়েছে, কিন্তু তাঁরা আর গারবিয়াং আসেন না। মানস-তীর্থের পথ আজ চিররুদ্ধ। ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস।

গারবিয়াং থেকে মানস-সরোবর মাত্র ৬৪ মাইল এবং তারছেন অর্থাৎ কৈলাস পর্বতের পাদদেশ ৯২ মাইল। কৈলাস পরিক্রমা করতে হলে আরও ৩২ মাইল হাঁটতে হয়। মানস-সরোবরের উচ্চতা ১৪৯৫০ ফুট এবং তারছেন ১৫১০০ ফুট উঁচু। গারবিয়াং থেকে তারছেন যেতে হলে পথে পড়ে ১৬৭৫০ ফুট উঁচু লিপুলেখ গিরিবর্ত্ম। তিব্বতীয় নাম চাং-লাবোছে লা। এই গিরিবর্ত্ম

ভারত-তিব্বতের সীমান্ত। চীনারা সীমান্তের পথ বন্ধ করে দিয়েছে।

চারিদিকে তুষারাবৃত শৃঙ্গমালা। তাদের মাঝে ঝাউ আর দেওদারে ছাওয়া একটি উপত্যকা। নানা ধরনের লতাপাতা আর নানা রংয়ের ফুল-ফলে ঢাকা। গারবিয়াং থেকেই ব্যাস ক্ষেত্রের আরম্ভ। তাই এখানকার অধিবাসীদের বলে ব্যাসী। এরা বড়ই অতিথিবৎসল। এরা কৈলাস যাত্রীদের সর্বতোভাবে সাহায্য করতেন। সেবাপরায়ণা রুমা দেবী এখানেই বাস করতেন। তিনি পর্যটক প্রমোদকুমারকে যথাসাধ্য সাহায্য করেছিলেন। গারবিয়াংকে প্রমোদবাবুর বড়ই ভাল লেগেছিল—'কারণ এরূপ সুন্দর স্থান জীবনে পূর্বে কখনও উপভোগ করি নাই।...এমন পার্বত্য সৌন্দর্য আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। হিমালয়ের সকল প্রসিদ্ধ স্থানের... যে-কোনও এক দিকের দৃশ্যই মনোরম। বড় জোর দুই দিক হইতে সুন্দর। কিন্তু এই গারবিয়াং-এর চারিদিকের দৃশ্যই মধুর, অপূর্ব এবং যথার্থই মনোহর। ইহার চারিদিকের সেই দৃশ্যগুলি অবলম্বন করিয়া চারিখানি জগদ্বিখ্যাত নৈসর্গিক চিত্র আঁকা যায়। অতীব সুন্দর বিশাল এবং সুধামাখা এই দৃশ্য। গারবিয়াং-এর সম্মুখে ও পার্শ্বে অর্থাৎ পূর্ব ও দক্ষিণে চিরতুষারাবৃত শৈলশিখর, বিচিত্র তাহার রেখায়তনভঙ্গী, আর কোথাও এমনটি নাই। গারবিয়াং গ্রামের পশ্চাতে ও এক পার্শ্বে অর্থাৎ উত্তর-পশ্চিমে, অতীব বিশাল, রুক্ষ তৃণলতা-বৃক্ষাদির চিহ্নবিবর্জিত শ্রেণীবদ্ধ অভ্রভেদী, তাহার বিশালতা অনুভবের বিষয়। দূর হইতে মনে হয় একেবারেই খাড়া, যদিও ঠিক তাহা নয় তথাপি উহার ঋজুতা দুরতিক্রম্য। উহাতে আরোহণ কল্পনাও সম্ভব নয়। মধ্যে মধ্যে বহুতর গভীর রেখা, উর্ধ্বঅধঃ বহুদূর বিস্তৃত। সে দৃশ্য বড়ই অদ্ভুত, বড়ই গম্ভীর।'

এপারে গারবিয়াং, ওপারে তাকলাকোট—ভারত-তিব্বতের যোগা-যোগের সেতু। যোগাযোগটা আপাতদৃষ্টিতে ছিল ব্যবসাভিত্তিক, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল সামাজিক। দুই দেশের সীমান্ত অঞ্চল নিয়ে গড়ে উঠেছিল এক মিলিত দেশ, মিলিত ভাষা ও মিলিত সমাজ। সওদাগরি ওদের কেবল পেশা ছিল না, ছিল নেশা। সীমান্তের হিমালয়ে হিম গলতে শুরু হলেই ওদের শিরায় শিরায় রক্ত চলাচল দ্রুততর হত। সূর্য যখন পাটে নামে, তখন গাঁয়ের বধূরা যেমন জলকে চলে, ওরাও তেমনি বাণিজ্যে বের হতেন। বধূরা যেমন জল থাকলে, জল ফেলে কলসী কাঁখে ঘাটে আসে,

তারাও তেমনি লাভ-লোকসান, প্রয়োজন-অপ্রয়োজনের কথা না ভেবে, বাণিজ্য-যাত্রা করতেন। এরা যেতেন ওধারে, ওরা আসতেন এধারে—এ তো বাণিজ্য-যাত্রা নয়, এ যে ছিল তীর্থযাত্রা।

এ যাত্রা দু দেশের রাজনৈতিক জীবনকে বিপন্ন করে নি, বরং অর্থনৈতিক জীবনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল। একই মুদ্রা ও ডাকটিকিট ছিল দুই দেশের। ভারতীয় পুলিসরাই তিব্বতের শান্তিরক্ষক ছিল। আর সীমান্ত নিয়ে বিরোধ না থাকায়, সীমান্তরক্ষী রাখার প্রয়োজন পড়ে নি। ফলে দু দেশের কোটি কোটি টাকা অপব্যয় হয় নি। এই অপব্যয়ের সূত্রপাত করেছে চীন, অথচ চীনের এটি অনধিকার চর্চা। কারণ তিব্বতের ওপরে চীনের চেয়ে ভারতের অধিকার অনেক বেশি।

এ অধিকার ভারত অর্জন করেছে দু হাজার বছরের প্রেম ও প্রীতির বিনিময়ে। যুগে যুগে ভারতের সাধক ও পর্যটকের দল প্রেমের বাণী বহন করে তিব্বতে গেছেন—তিব্বতের ধর্ম, সংস্কৃতি ও ভাষায় নিজেদের স্বাক্ষর রেখেছেন। তিব্বতীয় পুণ্যার্থীরাও ভারতে এসেছেন। ওদের ভাল আমাদের দিয়ে, আমাদের ভাল নিয়ে স্বদেশে ফিরেছেন। এই আদান-প্রদানের মাধ্যমে সৃষ্ট হয়েছিল এক প্রেমময় মহাদেশ।

সেই মহাদেশকে দ্বিখণ্ডিত করেছে চীন—হিউ এন্ সাং বা সান্ ইয়াত্ সেন-য়ের মহাচীন নয়, মাও সে তুং ও চৌ এন্ লাইয়ের লালচীন। শক্তিমদে মত্ত সে, রক্তগঙ্গা না বইলে তার তৃষ্ণা মেটে না। তিব্বত তার রক্তনেশার শহীদ হয়েছে। সে তিব্বতের মানবিক অধিকার হরণ করেছে।

রাষ্ট্রসংঘ সাধারণ পরিষদ ১৯৫৯, ১৯৪৫ ও ১৯৫৫ সালে এই মানবিক অধিকার হরণের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে প্রস্তাব পাস করেছেন। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী চীন তাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় নি। সে সংস্কার প্রবর্তনের নামে তিব্বতের সংস্কৃতিকে বিনাশ করে চলেছে। মঠ-মন্দির ও উপাসনা-স্থলগুলি ধ্বংস করে ফেলেছে। জনসাধারণের জন্ম-জন্মান্তরের ধর্ম-বিশ্বাসকে বিনষ্ট করতে চাইছে। শ্রদ্ধেয় লাম'রা আজ সেখানে কুলি-মজুরের জীবন-যাপন করছেন। লাসার কেন্দ্রীয় বৌদ্ধমঠে পূজিত অবলোকিতেশ্বরের প্রতিমূর্তি-সহ অন্যান্য মঠের সহস্রাধিক পবিত্র মূর্তি চীনারা ধ্বংস করে ফেলেছে। এখন তিব্বত তিন লক্ষ চীনা সৈন্য ও দু লক্ষ অসামরিক চীনার স্থায়ী আবাসে পরিণত।

একটা জাতির সকল সত্তা লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে আর বিশ্ববাসী নিন্দাপ্রস্তাব পাস করেই তাঁদের কর্তব্য সমাধা করছেন, ড্রাগনের গ্রাস থেকে তিব্বতকে মুক্ত করার কোন চেষ্টাই করছেন না। এর চেয়ে দুর্ভাগ্যের আর কি থাকতে পারে? অথচ আমরা সম্মানে এই দুর্ভাগ্যকে মেনে নিয়েছি। আমরা কেবল ইতিহাসের নীরব দর্শক।

কিন্তু ইতিহাস আমাদের ক্ষমা করবে কি?

আর হিমালয়—যে আমাদের কাছে পুরাণের চেয়ে পবিত্র, দর্শনের চেয়ে সত্য, কাব্যের চেয়ে সঙ্গীতময়! হিমালয় কি কোনদিন আমাদের এই অযোগ্যতাকে মেনে নিতে পারবে? আমাদের কি ক্ষমা করবে হিমালয়?

॥ দুই ॥

অসিতবাবু বলেন, "কি বড যে চুপচাপ?"

দেবকীদা বলেন, "আরে তাই তো, তুমি যে একেবারে মৌনীবাবা হয়ে বসে রইলে।"

অমিতাভ বলে, "তুমি নিশ্চয়ই অন্য কিছু ভাবছ।"

সুজল বলে, "আপনি ঠিকই বলেছেন শম্ভুদা।" অমিতাভর ডাকনাম শম্ভু।

মোহিত বলে, "আমিও সুজলের সঙ্গে একমত। মহারাজ নিশ্চয়ই অন্য কিছু ভাবছেন।"

প্রাণেশ বলে, "কিন্তু কি ভাবছেন এতক্ষণ বসে। আলমোড়া থেকে বাস ছেড়েছে আধঘণ্টার ওপরে।" সে ঘড়ি দেখে।

দাশু বলে, "সেই থেকে আমরা কত কথা বলে ফেললাম, আর আপনি নিঃশব্দে কেবল ভেবেই চলেছেন। ভুলে যাবেন না, আমরা আপনার সহযাত্রী, আপনার ভাবনার অংশীদার।"

অতএব আর চুপ করে থাকা যায় না। "ভাবছিলাম—" আমি জবাব দিই। ওরা কৌতূহলী হয়ে ওঠে। আমি বলি, "ভাবছিলাম কুমায়ুনের কথা।"

বোধ করি ওরা সকলেই নিরাশ হয় আমার উত্তরে। তবে সেকথা প্রকাশ করেন কেবল অসিতবাবু, "কুমায়ুনের ভাবনা তো ভাবছি এই যাত্রার আয়োজন

আরম্ভ করার সময় থেকে। কিন্তু তাই বলে এমন জমাট আড্ডায় অংশ না নিয়ে চুপ করে বসে থাকতে হবে।"

"না মহারাজ, বলুন আপনি কি ভাবছেন?" দ্যুতি আবার অনুরোধ করে।

"আমি ঠিকই বলেছি ভাই। সত্যি আমি কুমায়ুনের কথা ভাবছিলাম। তবে আমরা যেখানে চলেছি সেখানকার কথা নয়, আমি ভাবছিলাম জাগেশ্বর, বেরীনাগ, পিথোরাগড়, আসকোট, গারবিয়াং ও কৈলাসের কথা।"

"কি আর হবে সেই নিষিদ্ধ তীর্থের কথা ভেবে। তার চেয়ে এসো, যে পথে চলেছি, সে পথের কথা ভাবা যাক। ভাবা যাক সোমেশ্বর কৌশানী ও বৈজনাথের কথা।"

"তোমার তো তবু মস্ত সান্ত্বনা, দর্শন করে এসেছ সেই পরমতীর্থ। আমাদের জীবনে তো আর তা হবার উপায় নেই, তাই কল্পনায় কৈলাস পরিক্রমা করতে চাইছিলাম। কিন্তু গারবিয়াং পৌছতেই তোমরা আমার পথ আগলে দাঁড়ালে। আমার আর কৈলাস দর্শন হয়ে উঠল না।"

অমিতাভ লজ্জা পায়। চুপ করে থাকে। কেন যেন সবাই চুপচাপ। আমিও কোন কথা বলি না। কেবল কর্কশ স্বরে অবিরত কথা বলছে টাটা মার্সেডিজের ইঞ্জিনটা। আমাদের নীরব হতে দেখে সে যেন আরও বেশি বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে।

কিছুক্ষণ কেটে যাবার পরে সহসা সুজল জিজ্ঞেস করে অমিতাভকে, "আপনি কোন্ সালে গিয়েছিলেন?"

"১৯৫৮ সালে।"

"একা?" মোহিত প্রশ্ন করে।

"একা কি ঐ দীর্ঘ ও দুর্গম পথে যাওয়া যায়, না যাওয়া উচিত!" অমিতাভ মৃদু হেসে মোহিতকে জিজ্ঞেস করে।

মোহিত কিছু বলার আগেই আমি বলি, "যাওয়া উচিত কিনা জানি না, তবে যাওয়া যায়।"

"কেউ গিয়েছিলেন?

"হ্যাঁ।"

"কোন সাধু—সন্ন্যাসী?"

"না একজন সংসার আশ্রমের অধিবাসী।"

"কে ?"

"আমাদের করুণাবাবু—করুণাময় দাস।"

"অনিমাদির বন্ধু ?" দাশু জিজ্ঞেস করে।

"যিনি গত বছর দার্জিলিং থেকে মাউন্টেনিয়ারিং ট্রেনিং নিয়ে এলেন ?" প্রাণেশ বোধ হয় দল ভারী করতে চায়।

"হ্যাঁ।"

"তিনি কৈলাস গিয়েছিলেন জানি, কিন্তু একা গেছেন বলে তো শুনি নি কখনও।" অসিতবাবু বলেন।

"হ্যাঁ, একা-একাই তিনি মানস-কৈলাস পরিক্রমা পূর্ণ করেছেন। তবে তিনি গিয়েছিলেন একটা গভীর আত্মবিশ্বাসে তাড়িত হয়ে।"

"কি রকম ?" দেবকীদা প্রশ্ন করেন।

"তাহলে যে গোড়া থেকে বলতে হয়।"

"বলুন না।" প্রাণেশ অনুরোধ করে। শুধু সেই নয়, সবাই দেখছি চেয়ে আছে আমার দিকে। অগত্যা শুরু করতে হয় করুণাবাবুর কৈলাস ভ্রমণ-কাহিনী—

"১৯৫৩ সালের ৪ঠা জুলাই, অনেক আশা আর আশঙ্কাকে মনে নিয়ে করুণাবাবু হাওড়ায় রেলে চেপেছিলেন। সঙ্গীহীন তীর্থযাত্রী তিনি। পথের নির্দেশ বা কোন খোঁজখবর নেন নি। শুধু জানতেন আলমোরা হয়ে কৈলাস যেতে হয়। সে বছরই অনিমাদি ঘুরে এসেছেন কৈলাস থেকে। তাঁর কাছেই শুনেছিলেন সে কথা।

"কাঠগুদাম থেকে আলমোরার বাসে উঠে আলাপ হয় এক গুজরাতী মহিলার সঙ্গে। কিছুক্ষণ আলাপের পরে প্রকাশ পেল ওরা উভয়েই পূর্ব পরিচিত। একই দিনে দুজনে কেদারনাথ দর্শন করেছেন। বিচিত্র যোগাযোগ।

"আলমোরায় এসে করুণাবাবু বস্তিতে বস্তিতে ঘুরতে আরম্ভ করলেন। উদ্দেশ্য মালবাহক সংগ্রহ। এই অন্বেষণে সর্বদাই সঙ্গে রইলেন সেই সদ্য পরিচিতা গুজরাতী মহিলা। অনেক চেষ্টার পরে অনেক বেশি পারিশ্রমিকের প্রতিশ্রুতি দিয়ে একজন কুলি পেলেন। পরদিনই শুরু হল পদযাত্রা। যাত্রাক্ষণে গুজরাতী মহিলা বিদায় জানাতে এলেন। তিনি করুণাবাবুর রুকস্যাকে ভরে দিলেন জ্যাম জেলি মাখন আর শুকনো ফল। আর বার বার তাঁর জীবন দেবতার কাছে এই অনাত্মীয় অপরিচিত দুঃসাহসী যুবকের নির্বিঘ্ন

তীর্থপরিক্রমার জন্য করুণা ভিক্ষা করলেন। সজল চোখে বিদায় দিলেন তাঁকে। বিদায় নিলেন করুণাবাবু।

"আলমোরা থেকে ধারচুলা তখন হাঁটাপথে ৯০ মাইল। পথ জনহীন না হলেও তীর্থযাত্রীহীন। কারণ বর্ষাকাল। যাঁরা যাবার তাঁরা অন্তত মাসখানেক আগে যাত্রা করেছেন। এখন তাঁরা ফেরার পথে। তা ছাড়া এ পথে চিরকালই তীর্থযাত্রী কম। কাজেই কোনকালেই এ পথের যাত্রীরা পথের মানুষের জীবন-যাত্রায় কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। তার ওপর করুণাবাবু একা—নিঃসঙ্গ কৈলাসযাত্রী। তাই দীর্ঘ ও দুর্গম পথের আদিম ও উদার প্রকৃতিকে সঙ্গী করেই তিনি এগিয়ে চলেন। স্তব্ধ ও গম্ভীর বনের নিবিড় ছায়ায় পথ চলতে চলতে রোমাঞ্চিত হন। পথের বাঁকে বাঁকে থমকে দাঁড়ান। তুষারমৌলি হিমালয়কে বার বার দর্শন করেও তাঁর সাধ মেটে না।

"মালবাহক রাম সিং মালের ভারে মাঝে মাঝেই পেছিয়ে পড়ে। করুণাবাবু চিন্তায় পড়েন। নিজেকে বড অসহায় মনে হয়। তিনি পথের ধারে প্রতীক্ষা করেন। রাম সিং আসে। দুজনে আবার একসঙ্গে পথ চলেন। আবার ছাডাছাডি হয়, আবার দেখা হয় দুজনে।

"আকাশ ভেঙ্গে বৃষ্টি নামে। অবিশ্রান্ত বৃষ্টি চলে দিনের পর দিন। বৃষ্টি মাথায় করে পিচ্ছিল পথে করুণাবাবু এগিয়ে চলেন। পাথর ফাটা রোদ ওঠে। ছায়াহীন চড়াইপথে ঘর্মাক্ত কলেবরে করুণাবাবু এগিয়ে চলেন কৈলাসের পথে।

"দিনের শেষে পথের পাশে কোন গৃহস্থের দাওয়ায় কিংবা গোয়ালে ঠাঁই নেন দুজনে। হাত পুড়িয়ে রুটি আর সবজী বানিয়ে জঠর-জ্বালা নিবারণ করেন। পথের মানুষরা একক তীর্থযাত্রীকে সাহায্য করেন যথাসাধ্য। কেউ বা আবার সন্দেহ করে গোয়েন্দা বলে। এইভাবে একদিন তিনি ধারচুলা পৌছান।

"ধারচুলার পরে পথ আরও দুর্গম আরও রুক্ষ—গাছপালা কম। পাহাড়গুলো যেন নিরেট পাথরে গড়া। গ্রামগুলি দূরে দূরে। ভেড়া নিয়ে ভুটিয়ারা আসা যাওয়া করছে। কৈলাস থেকে ফিরে আসছেন যাত্রীদল। তাঁরা তাঁর একক পরিক্রমার পরিকল্পনায় বিস্মিত হন। তবে নিরাশ করেন না। বরং নির্দেশ দেন। তাঁদের শুভেচ্ছা ও সহানুভূতি করুণাবাবুর পরম পাথেয় হয়। এইভাবে ধারচুলা থেকে [illegible] মাইল পথ চলে একদিন তিনি

গারবিয়াং পৌঁছান। ভারাক্রান্ত অন্তরে রাম সিং বিদায় নেয় এখান থেকে। সজল চোখে তার পাওনা মিটিয়ে দেন করুণাবাবু।

"বিশ্রাম আর যাত্রার প্রস্তুতিতে একটি দিন কোথা দিয়ে কেটে যায়। নতুন পথপ্রদর্শক দোরজির সঙ্গে কথাবার্তা পাকা হয়। দোরজি তার ঝাব্বুর মানে তিব্বতীয় গরুর পিঠে মাল চাপিয়ে পরদিন সকালে করুণাবাবুর সহযাত্রী হয়।

"গারবিয়াং-এর পরে পথের প্রকৃতি পালটায়, পালটায় পথ চলার গতি। এতদিন অবিশ্রান্ত বর্ষার মধ্যে পথ চলতে হয়েছে। এখন আর বর্ষা নেই। মেঘমুক্ত, নির্মল আকাশ, কালী নদীর কিনারে কিনারে আঁকাবাঁকা চড়াই উৎরাই—লোকালয়হীন হিমালয়।

"ভুটিয়া ভেড়াওয়ালাদের সঙ্গে ভিড়ে যান করুণাবাবু। তাদেরই সঙ্গে অক্লেশে পেরিয়ে আসেন লিপুলেখ গিরিবর্ত্ম (১৬৭৫০´)। ভারত থেকে তিব্বতে প্রবেশ করেন। লিপুলেখের অপর পারে উৎরাই। তুষারশুভ্র হিমালয়ের পর্বত-প্রাচীর পেছনে পড়ে রইল। মানসযাত্রী নেমে এলেন পালার সমতল-ভূমিতে—বিশ্বের উচ্চতম মালভূমি তিব্বতে।

"তিব্বত তখন সবে চীনাদের কবলে এসেছে। তাই স্বভাবটা ওদের বিগড়ে যায় নি এখনকার মত। ১৯৬০ সাল পর্যন্ত তীর্থযাত্রীরা কৈলাস ও মানস সরোবর দর্শন করতে পেরেছেন। বন্ধুবর রণেশ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীমতী অরুণা মুখোপাধ্যায় শেষ যাত্রীদলের সঙ্গে ছিলেন। কিন্তু তাঁদের কথা এখন থাক, করুণাবাবুর কথা বলে নিই।

"পালাতে তখন চীনা চেকপোস্ট হয়েছে। জবাবদিহির পরে এগিয়ে যাবার অনুমতি মিলল। এগিয়ে চললেন করুণাবাবু। পৌঁছলেন তাকলা-কোট। গারবিয়াং থেকে ৩১ মাইল। উঠলেন দোরজির বোনের বাড়িতে। সে তো তাকে দেখে হেসে হেসে সারা। এই বয়সে এমন একা একা এসেছে কৈলাসে। তারপরে ভেবেচিন্তে জিজ্ঞেস করে, 'বাড়িতে বুঝি বেঁধে রাখবার লোক নেই, তাই একা পাড়ি জমিয়েছ এই দুর্গম পথে?'

"করুণাবাবু কেবল হাসেন। হাসতে হাসতেই বিনা দ্বিধায় ওদের খাবার খেয়ে চলেন—শামপা ও ভেড়ার মাংস। কে আবার রান্নার হাঙ্গামা করে! তার চেয়ে যা পাও তাই খেয়ে দেহটাকে সচল রাখো।

"ভগ্নীর ভালবাসা আর মায়ের মমতা দিয়ে দোরজির বোন করুণাবাবুর

নিঃসঙ্গ প্রবাসের একটি দিন ভরিয়ে রাখে। তারপরে তিনি বিদায় নেন তার কাছ থেকে। সে তাঁকে পথের খাবার বানিয়ে দেয়, পথ চলার পরামর্শ দেয়। ভগবানের কাছে করুণাবাবুর জন্য করুণা কামনা করে। তিনি ভুলে যান, তাকলাকোট তাঁর নিজের দেশ নয়—দোরজির বোন তাঁর নিজের বোন নয়। বিদায় বেলায় দুজনেই কাঁদে। তবু তাঁকে বিদায় নিতে হয়। পথ যে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। হিমালয়-পথিক সে আকুল আবাহনকে উপেক্ষা করবে কেমন করে ?

"তারপরে গুরলা লা (১৬২০০´)। লা মানে গিরিবর্ত্ম। এই গিরিবর্ত্মের ওপর থেকে করুণাবাবু প্রথম মানসখণ্ডের বিশাল ও বিস্ময়কর রূপ দর্শন করলেন। তাঁর মাথা আপনা থেকে নত হয়ে আসে, তাঁর দু চোখ জলে ভরে ওঠে। দুঃখে নয়, আনন্দে। সার্থক হল পথশ্রম। এই পরম মুহূর্তটি সকল কৈলাসযাত্রীর মত তাঁর জীবনেও অবিস্মরণীয় হয়ে রইল।

"ডাইনে মানস সরোবর, বাঁয়ে রাবণ হ্রদ। সুবিশাল তাদের আয়তন, সুনীল তাদের জলরাশি। সামনে দিগন্ত বিস্তৃত পরখার তৃণভূমি। তারপরে তুষারাচ্ছাদিত পর্বতশ্রেণী—সর্বোচ্চ শৃঙ্গ রাকাপোশী (২৫৫৫০´)। কিন্তু মধ্যমণি কৈলাস—শিবালয় কৈলাস।

"গুরলা লার পথে করুণাবাবুর সঙ্গে একজন সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ হয়। তিনিও সঙ্গীহীন। কাজেই করুণাবাবু তাঁকে সঙ্গী করে নেন।

"শ্রাবণী পূর্ণিমার রাতে তাঁরা ছিলেন মানস সরোবরের তীরে। পুণ্যতিথি, পুণ্যতীর্থ, কাজেই সন্ন্যাসীর পাল্লায় পড়ে, প্রচণ্ড শীতকে উপেক্ষা করে, পুণ্যস্নান করতে হয়েছে করুণাবাবুকে। তখন মানস সরোবরের তীরে, পরখার বিশাল তৃণভূমি জুড়ে, মেষপালকদের তাঁবু পড়েছে। তারই মাঝে তাঁবু ফেলেছিলেন [illegible] সন্ন্যাসী রান্না করতেন, করুণাবাবু ঘুরে বেড়াতেন তাঁবু থেকে তাঁবুতে। খেতেন ওদের দেওয়া চমরী গাইয়ের দুধ আর তিব্বতী মদ। দোরজি দোভাষীর কাজ করত।

"আবার শুরু হয় পথ চলা। এবারে কৈলাস পরিক্রমা। বিকেলের দিকে প্রচণ্ড হাওয়া বয়, কাজেই খুব সকালে চলা শুরু করে সুবিধামত জায়গা বেছে দুপুরের আগেই তাঁবু ফেলতে হত। কোনদিন বা পথে দেখা হত বন্দুকধারী তিব্বতী কিংবা চীনা অশ্বারোহী পাহারাদারদের সঙ্গে। পথে কোন যাত্রীদলের সঙ্গে দেখা হয় নি ওদের। অবশেষে ওরা পৌঁছলেন তারছেন—গারবিয়াং থেকে

৯৩ ও তাকলাকোট থেকে ৬২ মাইল। সেখানে দেখা হয় বম্বের বিরাট এক যাত্রীদলের সঙ্গে। ওদের দলেও একজন বাঙ্গালী ছিলেন। করুণাবাবুর কথা শুনেই তিনি তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন। ভদ্রলোক তাঁকে একা দেখে বিস্মিত হন। দুজনে বন্ধুত্ব হয়। পরে ধীরাফুক গুম্ফায় একসঙ্গে রাত কাটিয়েছেন ওরা।

"কৈলাস শিখরকে বেষ্টন করে পথ। সেই পথ ধরে ওরা পরিক্রমা শুরু করেন। পথে অতিক্রম করতে হয় ডোলমা লা—১৮৬০০ ফুট উঁচু একটি গিরিবর্ত্ম। কিন্তু তখন আর করুণাবাবু একা নন। বম্বের যাত্রীদলের সঙ্গে তিনি কৈলাস পরিক্রমা পূর্ণ করলেন। তারপরে আবার ছাড়াছাড়ি হয় ওদের সঙ্গে। পথের পরিচয় শেষ হয় পথে। বম্বের দল চলে যান মানস-সরোবরের দিকে। আর করুণাবাবু রাবণ হ্রদের তীরে।

"রাবণ হ্রদ বা রাক্ষসতালে তখন কিন্তু শুরু হয়েছে রুদ্রের তাণ্ডব। বাতাস বইছে তীব্র বেগে। বড় বড় ঢেউ এসে আঘাত করছে বেলাভূমিকে। আকাশ ছেয়ে গেছে কালো মেঘে। হ্রদ নয় যেন অশান্ত সমুদ্র। তারই মধ্যে তাঁবু ফেললেন ওরা। তাঁবুর চারিদিকে পাথর চাপা দিয়ে তিনটি মানুষ মুখ গুঁজে পড়ে রইলেন ভেতরে।

"পরদিন সকালে কিন্তু সব শান্ত। নবরূপে সেজেছে রাবণ হ্রদ। নীল আকাশের ছায়া পড়েছে তার সীমাহীন শান্ত জলে, আর সেখানে জেগে উঠেছে কয়েকটি ছোট ছোট দ্বীপ। মনেই হয় না আগের দিন বিকেলে সেখানে অমন দুর্যোগ ঘনিয়ে এসেছিল।

"দুর্যোগ চিরস্থায়ী নয়, তীর্থপথও অন্তহীন নয়। তাই পথ একদিন ফুরোল। গুরলা লার ওপর থেকে মানস খণ্ডকে শেষ প্রণাম জানিয়ে করুণাবাবু ফিরে এলেন গারবিয়াং। বিদায় নিলেন সন্ন্যাসী ও দোরজির কাছ থেকে। কিন্তু তাদের কথা তিনি আজও বিস্মৃত হন নি। বিস্মৃত হন নি কৈলাস, মানস সরোবর ও রাক্ষসতালকে। আর তার এই বিস্ময়কর একক পদযাত্রার জন্য আমরাও কোনদিন বিস্মৃত হব না করুণাবাবুকে।"

"সত্যই তাই, আচ্ছা ওর কতদিন সময় লেগেছিল?" আমি শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে অমিতাভ বলে ওঠে।

"আলমোরা থেকে যাত্রা শুরু করে আলমোরায় ফিরে আসতে বাহান্ন দিন লেগেছিল।"

"আপনাদের ?" মোহিত জিজ্ঞেস করে অমিতাভকে।

"পঞ্চাশ দিন।" অমিতাভ উত্তর দেয়।

"রণেশদাদের ?" সুজল প্রশ্ন করে।

"দু মাস।" আমি উত্তর দিই।

"বেশি লাগল কেন ?"

"ওরা যে যাবার সময় মুনসিয়ারী মিলাম-উণ্টাধূরা দিয়ে গিয়েছিলেন।" আমি বলি।

"আসার সময় ?" মোহিত জিজ্ঞেস করে।

"লিপুলেক দিয়ে ফিরে এসেছেন। রণেশদাদের পথ দীর্ঘতর ছিল।"

"এবার আপনার পরিক্রমার কথা বলুন অমিতাভদা।" প্রাণেশ আসল কথায় ফিরে আসে।

"এইমাত্র তো শুনলে। আবার সেই একই কথা কেন ?" অমিতাভ রেহাই পেতে চায়। কিন্তু ওরা নাছোড়বান্দা।

"হিমালয় এক, কিন্তু বিভিন্ন দর্শনার্থীর চোখে সে ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখা দেয়। তাই, তাদের কাহিনীতে হিমালয় নতুন ভাবে বিবৃত হয়, নবরূপে প্রকাশিত হয়। আপনি আপনার কাহিনী বলুন।"

আর কোন আপত্তির পথ পায় না অমিতাভ। আমরা চুপ করি। একবার কেশে নিয়ে অমিতাভ শুরু করতে চায়। কিন্তু ভগবান ওর সহায়। ভগবান নয় ড্রাইভার। সহসা সে বলে ওঠে, "ইধর গাড়ি আধা ঘণ্টা রোকেগী।"

"তুরন্ত উতরে যাইয়ে। মন্দির দরশন করকে চায় পী লিজীয়ে।" কনডাকটার নির্দেশ জারী করে।

খেয়াল হতে দেখি বাস দাঁড়িয়ে আছে একটি জনবহুল বাজারে। আমরা পৌঁছে গেছি সোমেশ্বর।

অমিতাভ উঠে দাঁড়ায়। হেসে বলে, "আগে সোমেশ্বরটা দর্শন করে নেওয়া যাক। কৈলাসের কথা এখন মুলতুবি থাক।"

ড্রাইভার মাত্র আধঘণ্টা সময় মঞ্জুর করেছেন। কাজেই দেরি করা ঠিক হবে না।

অমিতাভকে অনুসরণ করি। বাস থেকে নেমে আসি।

॥ তিন ॥

শিবক্ষেত্র সোমেশ্বর। কমনীয়া কুমায়ুনের একটি রমণীয় উপত্যকা। পর্বত ও সমতলের মিলনভূমি সোমেশ্বর। উপত্যকার উচ্চতা ৪৭৫২ ফুট। অবস্থান ১৯°. ৪৬′. ৪০″, উঃ ও ৭৯°. ৩৮′. ৫৫″ পূঃ দ্রাঘিমায়। আলমোরা থেকে সোমেশ্বর ২৬ মাইল।

দূরে আকাশ-ছোঁওয়া সাদা হিমালয়, কাছে চীর আর দেওদারে ভরা সবুজ পাহাড় আর সবুজ সমতল। সমতল উপত্যকার বুক চিড়ে একটি আঁকাবাঁকা রুপোলী রেখা— কুমায়ুনের প্রাণধারা প্রাণময়ী কোশী। কোশীর দুই তীরে সোনালী ক্ষেত। খুবই উর্বর এই সোমেশ্বর উপত্যকা। তাই চারিদিকের পাহাড়ের গায়ে ঘন বসতি। কোশীর তীরে তীরে আর ক্ষেতের ধারে ধারে পায়ে-চলা পথ। পথ গিয়ে পাহাডে মিশেছে। তারপরে গহন বনের ভেতরে গেছে হারিয়ে।

বাস স্ট্যাণ্ডটি বেশ জমজমাট। রাস্তাটা এখানে প্রশস্ততর। প্রশস্ত পথের দুদিকে সারি সারি দোকান। এখানে ডাক ও তারঘর, গান্ধী-আশ্রম আর নিখিল-ভারত তন্তুবায় সমিতির শিল্পকেন্দ্র রয়েছে। রয়েছে ডাকবাংলো ও হাইস্কুল। আর সোমেশ্বর মন্দির। সেই মন্দির দর্শন করতেই চলেছিআমরা।

দুটি মোটর পথ এসে মিলিত হয়েছে এখানে। একটি আমাদের পথ— আলমোরা থেকে তাকুলা, গণনাথ ও কৌশানী হয়ে গরুড়। আর একটি এখান থেকে বাসুরীক্ষেত ও মাঝখালি হয়ে দ্বারাহাট—৫০৩১ ফুট উঁচু একটি মালভূমি। দশম শতাব্দীতে কাত্যুরী রাজবংশের এক শাখা সেখানে প্রত্তন করেছিলেন এক নতুন রাজধানী। তাঁরা সেই নগরীকে পরিণত করতে চেয়েছিলেন দ্বিতীয় দ্বারকায়। তাই নাম দিয়েছিল দ্বারাহাট।

গণনাথ যাবার আরও একটি পথ আছে এখান থেকে। হাঁটা পথ, দূরত্ব মাইল ছয়েক। খুব কঠিন নয়—সামান্য চড়াই উৎরাই পাহাড়ী পথ। গণনাথে আছে একটি প্রাচীন মন্দির। মন্দিরের প্রধান বিগ্রহটি বৈজনাথ থেকে নিয়ে আসা হয়েছে। বিগ্রহ অপহরণ বা অধিকার করার কাহিনী গাড়োয়াল কুমায়ুন ও হিমাচলের খুবই সাধারণ ঘটনা মাত্র। বলশালী হলে তাঁরা পররাজ্য

আক্রমণ করে বলপূর্বক বিগ্রহ অধিকার করে নিয়ে যেতেন আর দুর্বল হলে কৌশল করে বিগ্রহ অপহরণ করতেন। তাঁদের ধারণা ছিল আরাধ্য দেবতার বিগ্রহই রাজ্যের সকল শক্তির উৎস। কাজেই বিগ্রহটি নিয়ে আসতে পারলেই তাঁরা শক্তিশালী হয়ে উঠবেন। বিগ্রহই সেকালে বিজয়ের শ্রেষ্ঠ স্মারক বলে বিবেচিত হত। কুমায়ুনের সর্বশ্রেষ্ঠ দেবালয় আলমোরার নন্দাদেবী মন্দিরের মূল বিগ্রহটিও এককালে গাড়োয়ালে ছিল। ছিল জুনিয়াগড দুর্গে। ১৬৭০ খৃষ্টাব্দে চাঁদা রাজা বাজবাহাদুর চন্দ্র জুনিয়াগড় জয় করে বিজয়ের স্মারক স্বরূপ সেখানকার বিগ্রহটিকে আলমোরায় নিয়ে এসে নন্দাদেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, গুহাসমূহ আর শিবমন্দিরের মত গণনাথের মেলাও বিখ্যাত। কার্তিক চতুর্দশী ও দোল চতুর্দশীতে এই মেলা হয়। গণনাথের উচ্চতা ৬৯৪৭ ফুট কিন্তু সেখানে রাত্রিবাসের কোন অসুবিধে নেই। বন বিভাগের ডাকবাংলো আছে। আলমোরা থেকে গণনাথ যেতে হলে ২৩ মাইল বাসে গিয়ে তারপরে ছ মাইল বনপথ পেরোতে হয়। তবে গণনাথের কথা থাক, এখন সোমেশ্বরের কথা হোক।

সোমেশ্বর সুপ্রাচীন জনপদ। সেকালে সোমেশ্বর সমৃদ্ধশালী শহর ছিল। এই উপত্যকায় বহু ভগ্নমূর্তি পাওয়া গেছে। কুমায়ুনের গীতিকাব্যে সোমেশ্বরের উল্লেখ পাওয়া যায়। কাছেই লোধ নামে একটি চা-বাগান। লোধের পথে কয়েকটি নিরেট পাথরের শিবলিঙ্গ আছে। এর একটিতে চন্দ্র ও আর একটিতে সূর্য মূর্তি খোদিত। সোমেশ্বর থেকে ১৩ মাইল দূরে সুখাতাল—স্বাদু জলের একটি সুন্দর হ্রদ।

কিন্তু সেখানে যাবার অবকাশ নেই আমাদের। আধঘণ্টার মিনিট পাঁচেক ইতিমধ্যে খরচ হয়ে গেছে। তাই তাড়াতাড়ি পায়ে চলা পথ ধরে ঝোপঝাড়ের পাশ কাটিয়ে সোমেশ্বর মন্দিরের দিকে ছুটে চলি।

সুপ্রাচীন শিবালয়। পাথরের মন্দির। এখানে ওখানে ভাঙ্গা, দেয়ালে জমে উঠেছে শেওলা। চারিদিকে দেওদার বন। একে অনায়াসে বনমন্দির বলা যেতে পারে। সংস্কারের অভাবে মন্দিরটির চেহারা দরিদ্র হলেও সোমেশ্বর মন্দির মোটেই অবহেলিত নয়। স্থানীয়রা বিশেষ করে কুমারী মেয়েরা প্রায়ই পূজো দিতে আসে। থালায় থালায় নিয়ে আসে নানা রকমের ফল ফুল ও মালা। সযত্নে সেই উপচার সোমেশ্বরকে অঞ্জলি দিয়ে তারা মনের

মানুষ কামনা করে। পায় কিনা জানি না। আর পেলেও যে তাদের মন ভরে তাই বা কে জোর করে বলতে পারে! যাহা পাই তাহা ভুল করে চাই, যাহা চাই তাহা পাই না—কথাটা তো কেবল একালের বঙ্গ-ললনাদের ক্ষেত্রেই সত্য নয়, সকল দেশের সকল কালের কুমারীদের কাছেই চরম সত্য।

কুমায়ুনী কুমারীদের দ্বারা পূজিত হলেও সোমেশ্বর ঐশ্বর্যবান নন। দূরাগত তীর্থযাত্রী না এলে দেবতা ঐশ্বর্যশালী হন না। তবে তাঁরা দেবতাকে যে ডালি দেন, তা দেবতার কোন কাজে লাগে না। দেবতা পার্থিব ঐশ্বর্যের মুখাপেক্ষী নন। ভক্তের অন্তরের ঐশ্বর্যই দেবতাকে ঐশ্বর্যশালী করে তোলে। সেই অতুল ঐশ্বর্যে ঐশ্বর্যবান সোমেশ্বর।

সশ্রদ্ধ অন্তরে সোমেশ্বরকে প্রণাম করি। শ্রদ্ধাবনত মস্তকে প্রদক্ষিণ করি মন্দিরকে। তারপরে ত্বরিত পদক্ষেপে ফিরে আমি বাস স্ট্যাণ্ডে। ড্রাইভার আমাদের দেরি দেখে সজোরে হর্ন বাজাতে শুরু করেছে।

তাড়াতাড়ি বাসে উঠে আসি। বাস এগিয়ে চলে কৌশানীর পথে।

কথাটা ভুলে বসেছিলাম আমরা। কিন্তু ভোলে নি মোহিত। মোহিত শান্ত ও ধীর। সব সময় চুপচাপ থাকে। কিন্তু সব দিকে সর্বদা সজাগ দৃষ্টি ওর। তাই বোধ হয় তারই প্রথম মনে পড়ে কথাটা। সে অমিতাভকে বলে, "এবার তা হলে আপনার কৈলাস-কাহিনী শুরু করুন।"

অমিতাভ প্রমাদ গণে। কিন্তু বৃথাই দ্বিধা। দাশু বলে ওঠে, "দেরি করে কোন লাভ নেই, কেবল অযথা সময় নষ্ট হবে। তার চেয়ে তাড়াতাড়ি শুরু করে দিন।"

"কিন্তু......" অমিতাভ কি যেন বলতে চায়।

অসিতবাবু বাধা দেন তাকে, "না না, কোন কিন্তু-টিন্তু নয়, আপনি আরম্ভ করুন।"

অগত্যা অমিতাভ আরম্ভ করে—

"আমরা গিয়েছিলাম টনকপুর ও পিথোরাগড় হয়ে। পিথোরাগড় থেকেই শুরু হয়েছিল আমাদের পদযাত্রা।

"১৯৫৭ সালের ৩রা জুন আমরা কলকাতা থেকে রওনা হয়েছিলাম। কথা ছিল হিমালয়-প্রেমিক সুসাহিত্যিক শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল আমাদের সঙ্গে গারবিয়াংয়ে মিলিত হবেন। আমরা পথের খাবার ও কুলির ব্যবস্থা করে এগিয়ে যাব। কিন্তু ঘটনাচক্রে ফ্লুর আক্রমণে পিথোরাগড়ের এক

অখ্যাত হোটেলে পাঁচ দিন শুয়ে থাকতে হয় আমাকে। প্রবোধদার সঙ্গে আমরা পিথোরাগড়েই মিলিত হয়ে ১২ই জুলাই শুরু করি পদযাত্রা। এই ভাবেই আমরা ধারচুলার পথে গারবিয়াং পার হয়ে ভারতের শেষ চেক্-পোস্ট কালাপানির দিকে এগিয়ে যাই। ভারত-সীমান্ত থেকেই আমার কাহিনী শুরু করছি।

"যতদূর মনে পড়ে তারিখটা ২৬শে জুন। কালাপানি চেক্-পোস্টের রেডিও অনেকক্ষণ থেমে গিয়েছে। শুধু দুজন পাহারাদার জেগে পাহারা দিচ্ছে দুধারে। আশেপাশে কোন তাঁবুতেই কোন শব্দ নেই—সবাই গভীর ঘুমে অচেতন। পাশে প্রবল বেগে বয়ে চলেছে কালী নদী। মাঝে মাঝে আওয়াজ আসছে গুম্ গুম্ করে।

"কয়েকটি তাঁবু নিয়ে এই শেষ চেক্-পোস্ট। কয়েকটি রাইফেল আর একটি ট্রান্সমিটার এঁদের সম্বল। প্রকৃত সীমান্ত এখান থেকে কিছু দূরে। আগামীকাল আমরা সেখানে পৌঁছে যাব। সকালে রওনা হয়েছিলাম গার-বিয়াং থেকে। তিন দিন থাকার পর আজ আবার শুরু করেছিলাম পথ চলা। কালী নদী আর টিংকার নদীর সঙ্গম পার হয়ে নেপালে ঢুকে গভীর জঙ্গলের পথ নিয়েছিলাম। বেশ কিছুদূর এসে কালী নদীর কালো জল আবার পার হতে হল। কালীর রূপ ক্রমশঃই কালো আর দুরন্ত হয়ে উঠছে। কালীকে যেন ভালবেসে ফেলেছি—এত ভাল আর কোন নদীকে লাগে নি এর আগে। ১১ মাইল পথ যেন স্বপ্নের মধ্যে পার হয়ে এসেছি। পৌঁচেছি কালাপানি—স্থানীয় কয়েকজন পুলিস হাসিমুখে আমাদের অভ্যর্থনা জানিয়েছেন। পাণ্ডব-বর্জিত দেশে মানুষের মুখ দেখলেই এঁদের আনন্দ। প্রথমেই ছোট একটি চায়ের দোকান। পরিষ্কার চায়ের কাপ—দেখে আনন্দে লাফিয়ে উঠেছিলাম। চা প্রতি কাপের দাম চার আনা হলেও আট আনা দিতে রাজী ছিলাম। ধূমায়িত কাপটি হাতে নিয়ে চারদিক দেখে নিলাম। ছোট সমতল একটি মাঠ। পাশ দিয়ে পরিষ্কার জলের একটি ধারা পাশের পাহাড় থেকে বেরিয়ে এসেছে। শুনলাম এটিই নাকি কালী নদীর একটি উৎস। একধারে এক সারিতে কয়েকটি তাঁবু। মাঝখানে খুঁটিতে একটি জাতীয় পতাকা। চেক্-পোস্ট অফিসার মিঃ নাথানী চমৎকার লোক। আমাদের কিছুক্ষণ পরে প্রবোধদা আর সটাইবাবু এসে পৌঁছলেন। নামতেই তাঁদের হাতে চায়ের কাপ দিয়ে অভ্যর্থনা করলাম আমরা। প্রবোধদা বললেন, "ব্যাপার কি হে, একেবারে

চক্‌চকে কাপপ্লেট দেখছি যে—গ্র্যাণ্ড হোটেল নাকি ?”

“মিঃ নাথানীর কাছে প্রবোধদার পরিচয় দিলাম। তিনি মহাপ্রস্থানের পথে-র হিন্দী চলচ্চিত্র দেখেছেন। এগিয়ে এসে প্রবোধদাকে স্বাগত জানালেন।

“সন্ধ্যার পর মাঠের মাঝে একটি বিরাট অগ্নিকুণ্ড জ্বালানো হল। আগুন ঘিরে ঠাণ্ডার মধ্যে অনেক আলাপ-আলোচনা চলল। মিঃ নাথানী সবাইকে চা খাওয়ালেন। মাইক সহযোগে রেডিও চলছে। লখনউ কেন্দ্রই ধরা আছে তাতে। বৃষ্টি শুরু হল, বাধ্য হয়ে তাঁবুতে ঢুকতে হল। মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে মেঘ-গর্জন।

“পরদিন ঘুম ভাঙ্গল ভোর পাঁচটায়। বৃষ্টি থেমে গিয়েছে। পরিষ্কার আকাশ। একটু বেলাতেই বেরুনো হল। নাম-ধাম লিখিয়ে চেক্‌-পোস্টের সবার কাছে বিদায় নিয়ে বেরুতে প্রায় একঘণ্টা সময় লাগল। গাইড রতন সিং কেবল তাড়া দিচ্ছে।

“কিছুদূরে পুল পেরিয়েই দুরন্ত চড়াই। মাথার উপর রোদ ঝাঁ ঝাঁ করছে। চারদিকের বরফে ঢাকা পাহাড়চূড়াগুলি রোদে ঝলমল করছে। চোখ ফেরানো যায় না। আবার তাকিয়ে থাকলেও চোখ ঝলসে যায়। ধীরে ধীরে পথ চলছি। মাত্র ৬ মাইল যেতে হবে। তাড়া নেই। কালী নদীও ক্রমশঃ উঠে আসছে আমাদের সঙ্গে। চারিদিক থেকে নেমে এসেছে হিমবাহ। একেবারে বরফের রাজ্যে এসে দাঁড়ালাম। আমাদের পথ বেঁকে গেল বাঁদিকে। কালী নদী আমাদের সঙ্গে থাকলেও বরফের নিচে হারিয়ে গিয়েছে। ওপারে একটি বিরাট উপত্যকা দিয়ে বিপুল এক হিমবাহ নেমে এসেছে। এত বড় আর এত সুন্দর হিমবাহ এই প্রথম আমার চোখে পড়ল। চারদিকেই সাদা বরফের পাহাড় মাথা উঁচু করে আছে। খালি চোখে আর তাকানো যাচ্ছে না। তাই বাধ্য হয়ে রঙীন চশমা পড়ে নিলাম। প্রবল বেগে কন্‌কনে হাওয়া বইছে। দাঁড়িয়ে থাকা অসম্ভব হয়ে উঠছে। বহুদূরে আর নিচে বাঁকের মাথায়—ছোট কতগুলো বিন্দু উঠে আসছে। প্রবোধদারা আসছেন। সঙ্গে এলাহাবাদের মিলিটারী ডাক্তার মেজর মিশ্রও আছেন মনে হল। মাঝে মাঝে প্রবল জলস্রোত পার হতে হচ্ছে। বেলা বেড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে জল বেড়ে যায়। কোনরকমে পাথর গড়িয়ে পথ করে এগিয়ে চললাম। মাঝে মাঝে নরম বরফ। চলতে বেশ কষ্ট হচ্ছে।

“সামনের উপত্যকা ডানদিকে মোড় নিয়েছে। এবার শুধু বরফের উপর

চলেছি। ডানদিকে বেঁকেই কিছুদূরে একটা কালো পাথরের উঁচু ঢিবি দেখা গেল। শুনলাম ওটাই নাকি সংচাম। পৌঁছতে বেশী সময় লাগল না। কুলিরা অনেক নিচে থাকায় অপেক্ষা করতে হল। বেলা তিনটার মধ্যেই সেদিনের মত যাত্রা শেষ। তাঁবু খাটিয়ে সবাই ঢুকে পড়লাম চায়ের আশায়। বিশ্রাম রাত দুটো পর্যন্ত। তারপর বরফ একটু শক্ত হলে আবার চলা শুরু হবে।

"রাত দশটার পর সুরু হল প্রচণ্ড বৃষ্টি। তারপর তুষারপাত। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে চলল এই তুষারপাত। তাঁবুতে জ্বালানীও শেষ। শ্রেষ্ঠ গাইড কিচ্ থাম্‌পা আমাদের সঙ্গেই আছে। প্রবোধদা আমাদের তার সঙ্গে এগিয়ে যেতে বললেন।

"অন্ধকারের মধ্যেই টর্চ আর হ্যারিকেন নিয়ে যখন বেড়িয়েছি, তখন রাত পৌনে চারটা। বরফ পড়া তখনও শেষ হয় নি। কিছুদূর গিয়েই বিপদ হল। নরম বরফে আমাদের দলের সবাই ডুবতে শুরু করে দিলেন। কুলিরা ভারী মাল নিয়ে আরও অসুবিধায় পড়ল। পথের চিহ্ন কোথাও নেই। পায়ের নিচে নদীর শব্দ শোনা যাচ্ছে। বেশি নিচের দিকে গেলেই আর খোঁজ পাওয়া যাবে না। চলার গতি ক্রমশঃই কমে আসছে। ভোরের আলো ফুটে ওঠাতে চলার একটু সুবিধা হল। অতিকষ্টে আমরা শেষ পর্যন্ত লিপুলেখ গিরিবর্ত্মের ওপরে এসে দাঁড়ালাম। একদিক খাড়া নেমে গেছে তিব্বতে। আর একদিকে নেপালের পাহাড়। চারদিকে শুধু সাদা বরফ। খাড়া দেওয়ালের মত পথ। বসে, গড়িয়ে, নামতে হচ্ছে। সাড়ে চার মাইল পথ কি ভাবে এসেছিলাম মনে নেই। লিপুর নিচে পৌঁছবার পরেই শুরু হয়েছে প্রবল তুষারঝড়। ডাঃ মিশ্র আর স্বামীজীর শারীরিক অবস্থা খুবই খারাপ। বরফ আবার শেষ হয়ে গিয়েছে। একটা ছোট নদী পার হয়ে প্রায় সমতল পথ চলে গেছে নদীর ধার ঘেঁষে।

"কতক্ষণ চলেছি জানি না—নদী পার হয়ে এক খাড়াপথ পার হয়ে তাকলা-কোট পৌঁচেছি। মণ্ডিতে এসেই মোহন সিং গারবিয়ালের ছেলের সঙ্গে দেখা করে একটা অপরিসর ছোটঘর দখল করা হল। চারিদিকে পাথরের দেয়াল আর ওপরে তাঁবু বিছানো। কয়েকজন চীনা সৈন্য দেখা গেল।

"পরদিন। সারাদিন জল্পনা-কল্পনা করে কাটাবার পর সন্ধ্যায় হরি সিং এসে হাজির হল।

"মোহন সিং এর ছেলে ঈশ্বর সিং সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন। কিছু জিনিস-পত্র ফেরত পাঠান হল। আর কিছু তাকলাকোটেই রাখার ব্যবস্থা করা হল। অতিরিক্ত বরফ পড়ার জন্য তীর্থপুরী যাওয়া সম্ভব হল না। চাইনীজ অফিসাররা আমাদের তাঁবুতে কিছুক্ষণ কাটিয়ে গেল। স্বামীজী আর ডাঃ মিশ্র অনেকটা সুস্থ হয়েছেন।

"আমরা সিমবিলিং গুম্ফা দর্শন করলাম। মণ্ডির পেছন থেকেই উঠে গিয়েছে খাড়া পিচ্ছিল পথ। গুম্ফাটি বেশ বড়। বুদ্ধদেবের মূর্তিটিও বেশ সুন্দর আর বড়। আজ বাৎসরিক ফসলের উৎসব। গুম্ফার উপর দাঁড়িয়েই আমরা দূরে গ্রামের পথে মিছিল দেখেছি। দর্শনী দিয়ে প্রদীপ জ্বালিয়ে নেমে এসে শুনলাম—কুলির বদলে খচ্চর আর গাধা আমাদের মাল নিয়ে যাবে। আগাম দেওয়া হয়ে গিয়েছে। স্বামীজীর জন্য একটি ঘোড়া পাওয়া গিয়েছে।

"তিনটি ঘোড়া আর একটি খচ্চর নিয়ে দুর্গা দুর্গা বলে বেড়িয়ে পড়লাম পরদিন সকালে। আমাদের যাত্রার শেষ পর্ব শুরু হল। মণ্ডির প্রায় সমস্ত খালি ঘর পেরিয়ে পথ বেয়ে উঠেছে শুধু বালি আর পাথুরে পাহাড়ের গা বেয়ে। কিছুদূর গিয়ে নেমেছে নিচে গুকুং গ্রাম। গ্রামটি যেন পাহাড়ের গুহার গায়ে সাজানো। বাড়িগুলি যেন পাখীর বাসা। বেশ একটু নূতনত্ব আছে। ভিতরে গুহা, বাইরে বারান্দা দরজা জানালা ইত্যাদি। নদী পার হতে হল। তারপর চীনাদের তাঁবু—অফিস ইত্যাদি। গ্রামের শেষ প্রান্তে গভর্ণর বা জংপন-এর সঙ্গে দেখা করলাম। বৃদ্ধ তিব্বতী ভদ্রলোক। দেশীয় প্রথায় শুকনো ফল আর মিষ্টি দিয়ে আপ্যায়ন করলেন। কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করার পর শুভকামনা জানিয়ে আমাদের বিদায় জানালেন। বিশেষ করে বলে দিলেন, ফিরবার পথে যেন আমরা সবাই কুশলে আছি, একথা জানিয়ে তাঁকে নিশ্চিন্ত করে যাই।

"মরুপথে মাথার উপর প্রচণ্ড রোদ নিয়ে পথ চলতে বেশ লাগছিল। বালি আর কাঁকড়ের পাহাড়। বাঁদিকে হিমালয়ের চিরতুষার শৃঙ্গগুলি রোদে চিক্-চিক্ করছে। ডানদিকে বিশাল গুরলা মান্ধাতা—তার বরফের মাথা উঁচিয়ে আছে। টোয়ো গ্রামে জারোভার সিং-এর সমাধি দেখে আবার পথ চলা শুরু হল। একঘেয়ে পথ। স্বামীজী চলেছেন ঘোড়ায়। মাইলের পর মাইল পার হয়ে দূরে একটি ছোট তাঁবু দেখতে পেলাম। শুনলাম এই রুংগুং। ডাঃ মিশ্রের তাঁবুতে পৌছতেই, বসিয়ে একেবারে চা খাইয়ে তবে ছাড়লেন।

তিনি বার বার গুরলা গিরিপথ হয়ে যাবার জন্য অনুরোধ করলেন কিন্তু তা শেষ পর্যন্ত সম্ভব হয় নি।

"খুব ভোরেই বেরিয়েছি ২রা জুলাই আমাদের সেপ্লাং ক্যাম্প থেকে। ডাঃ মিশ্র মনের দুঃখ চেপে বিদায় জানিয়ে এগিয়ে গেলেন ডানদিকে গুরলা গিরিপথের দিকে। আমরা ধরেছি রাক্ষসতালের পথ।

"সামনে যেন একেবারে মরুভূমি। মরুপ্রান্তরে সবাই চলেছি নিঃশব্দে। মাঝে মাঝে নিজেই চমকে উঠছি—যেন ঘুমিয়ে পথ চলছি। প্রবল বাতাসের বেগে এগিয়ে চলা বেশ মুশকিল হয়ে পড়েছে। ঘননীল আকাশে শরতের মেঘ ভেসে চলেছে উত্তর মুখে—কৈলাসের দিকে। সন্ধ্যার দিকে একটি প্রায় শুকিয়ে যাওয়া নদীর ধারে ক্যাম্প করা হল। একেবারে নির্জন জায়গা। আশেপাশে বহু মাইলের মধ্যে জনপ্রাণী খুঁজে পাওয়া যাবে না। শুনেছি এখানে নাকি খুব ডাকাতি হয়।

"পথ গুরলা-লার দিকে বাঁক নিয়েছে। পাহাড় আর চড়াই শুরু হয়েছে। চড়াই বাঁকের পর বাঁক নিয়েছে। মান্ধাতাও যেন ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে। আচ্ছন্নের মত চলেছি সবাই। হঠাৎ একটা বাঁক পেরিয়েই দূরে অনেক উঁচুতে তিব্বতী পতাকা দেখা গেল। ছুটতে শুরু করলাম। বেশি দেরি হল না পৌঁছাতে। দেখলাম সামনে বিশাল নীল হ্রদের একাংশ—রাক্ষসতাল। দূরে মেঘের আড়ালে কৈলাস। সমস্ত পরিশ্রম সার্থক। আজ ৩রা জুলাই, ১৯৫৭। একমুহূর্তে শরীরের সব গ্লানি দূর হয়ে গেল। পাগলের মত পাথুরে পথে ছুটে নেমে গেলাম হ্রদের পবিত্র জলস্পর্শ করে নিজেদের শ্রমমুক্ত করতে, ধন্য হতে।

"সমস্ত দলটাই নেমে এল জলের ধারে। রাক্ষসতালের জলে পিপাসা মিটিয়ে নিল সবাই। তারপর পূর্বতীর ধরে চলা শুরু হল উত্তরমুখে। পরিষ্কার স্বচ্ছ নীল জল। প্রায় ১৫।১৬ ফুট নিচ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। দূরে দুটি দ্বীপ থাকাতে আরও সুন্দর লাগছে দেখতে। জলজ উদ্ভিদের একটি চওড়া জমানো বেল্ট অজগর সাপের মত ধার দিয়ে চলে গিয়েছে। জিনিসটা নরম হওয়াতে তার উপর দিয়ে হাঁটতে বেশ মজা লাগছে। বেশ কিছুদূর যাবার পর বিশ্রাম আর চায়ের জন্য এক জায়গায় বসা হল। তখন বেলা প্রায় সাড়ে দশটা হবে। নিমকি চা মানে নুন দেওয়া চা তৈরি হতে বিশেষ দেরি হল না। চায়ের কাপ হাতে নিয়ে ছুটকার ওপর পা ছড়িয়ে বসে হ্রদের শোভা দেখছি। হঠাৎ একটা সাঁই সাঁই শব্দ শোনা গেল। জলের উপর প্রবল বেগে বাতাস বয়ে

যাচ্ছে দেখলাম। জলে ছোট ছোট ঢেউগুলি ক্রমশঃ বড় বড় ঢেউয়ে পরিণত হল। অশান্ত রাক্ষসতালকে সমুদ্র বলে মনে হচ্ছিল। এর মাঝে আর একটি জিনিস যা দেখলাম তার বর্ণনা দেওয়া কঠিন। হ্রদের জলে নানারকম রঙের খেলা। এ দৃশ্য নাকি খুব কম লোকই দেখতে পায় শুনেছি। হ্রদের উত্তর পারে আমাদের তাঁবু ফেলা হয়েছে। পথে রাজহাঁস দেখলাম হ্রদের জলে। সন্ধ্যায় রাক্ষসতালের উপর সূর্যাস্ত দেখে মনটা সত্যই ভরে গেল। প্রবল হাওয়ার জোরে তাঁবু ছিঁড়ে যেতে চাইছে। মাঝের খুঁটি ভেঙ্গে যাওয়াতে লাঠি দিয়ে কোনরকমে ভাঙ্গা খুঁটি জোড়া দেওয়া হয়েছে। রাত দুটোর পর হাওয়া থামল। চারিদিক শান্ত আর নিস্তব্ধ। মাঝে মাঝে ঘোড়াদের ঘণ্টার আওয়াজ আসছে।

"৪ঠা জুলাই। চা খেয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম উত্তরমুখে। শুরু হল প্রাণান্তকর চড়াই। খুব বেশি উঠতে হল না। এক জায়গায় এসে ডানদিকে দেখতে পেলাম বিশাল মানস সরোবরের দৃশ্য। উত্তরমুখ করে দাঁড়ালে সামনে কৈলাস, পেছনে মান্ধাতা, বাঁদিকে রাক্ষসতাল আর ডানদিকে মানস সরোবর দেখা যায়। হ্রদগুলি কত বড় তা এখান থেকে বেশ বোঝা যায়। পাহাড় পার হয়ে নামা শুরু হল। দুই পাহাড়ের মাঝে পথ নেমে গিয়েছে। এক বিরাট সমতলের শেষে কৈলাস পর্বতশ্রেণী। কাছাকাছি একটি স্বর্ণখনি আছে। গঙ্গা-ছু পার হতে হল। গঙ্গা-ছু মানস ও রাক্ষসের যোগাযোগ রক্ষা করেছে। জল বেশি নেই। বিস্বাদ জল। বরখার সমতল পেরিয়ে জলাভূমি, মরুভূমি আর কাঁটাঝোপের জঙ্গল পার হতে হল। বেলা দুটোর কাছাকাছি তারছেন থেকে তিন মাইল দূরে একটি ছোট নদী পার হতে না পেরে সেইখানেই তাঁবু ফেলতে বাধ্য হলাম। বেলা বাড়লেই জল বাড়ে। চমৎকার পরিষ্কার দিন। তাঁবুতে শুয়েই কৈলাস দেখা যাচ্ছে। স্বামীজী খুব খুশি। বলছেন, 'আমার শরীর ভাল হয়ে গিয়েছে। তোমাদের উৎসাহেই আমার কৈলাস দর্শন হল।' তিনি পুজো নিয়ে বসেছেন। সারারাত পুজো করেছেন। আমাদের ঘোড়াওয়ালা আর গাধাওয়ালা কর্মা ও ফুটে পুজো নিয়ে বসেছে। কৈলাস ওদের বড় তীর্থ। কর্মা আমাকে বড়লামা বলে ডাকে। ভারতের অনেক তীর্থ (বৌদ্ধ) ওর দর্শন হয়েছে। হিন্দী বলতে পারে একটু একটু। ফুটে তিব্বতী ছাড়া অন্য কোন ভাষা একেবারেই বোঝে না।

"পরদিন তিন মাইল বেশি ঘুরতে হল নদী পার হবার জন্য। তারছেন পৌছলাম সকাল নটায়। তারছেনে মাণ্ডি জমেনি, কয়েকটি মাত্র দোকান।

চামরীর লেজ খোঁজা হল। একটামাত্র ভাল পাওয়া গেল। একজন লোক এসে ভাঙা হিন্দীতে আলাপ শুরু করাতে শুনলাম নেপালী জানে—দার্জিলিং গিয়েছিল কয়েকদিনের জন্য। নেপালীতে কথা বলাতে মহাখুশী। জোর করে আমাদের ওর তাঁবুতে নিয়ে গেল। চা খাওয়াবেই। তিব্বতী চায়ের ব্যবস্থা দেখে পরিক্রমার নাম করে বেরিয়ে পড়লাম। কথা দিলাম পরিক্রমা শেষ করে যাবার সময় নিমন্ত্রণ রক্ষা করে যাব।

"৩২ মাইলে পরিক্রমা শেষ হবে। পৌনে চার মাইল দূরে সেরসুং পৌছতে বেশি দেরি হল না।

"ঝাণ্ডা স্পর্শ করে ডানদিকের পথ নিলাম আমরা। এক জায়গায় লা-ছু পার হলাম। কন্‌কনে ঠাণ্ডা জল। খালি পায়ে পার হতে হল। সুকুমার প্রত্যেকবারই রতন সিং-য়ের পিঠে পার হয়েছে। লা-ছুর পশ্চিম পার দিয়ে কিছুদূর যাবার পর নিয়ঁারী গুম্ফা। ছোট গুম্ফা। কৈলাস পরিক্রমাতে চারদিকে চারটি গুম্ফা আছে। দক্ষিণে তারছেন, উত্তরে ধীরাফুক্, পূবে জুথুল-ফুক্, আর পশ্চিমে এই নিয়ঁারী। তীর্থপুরী ঘুরে এলে পথ এইখানেই এসে মিশেছে। তীর্থপুরী থেকে কৈলাস মাত্র ২৮ মাইল। লিপুলেখ থেকে কৈলাসের দূরত্ব ৭২ মাইল। জোশীমঠ থেকে ২০০ মাইল (নিতি গিরিবর্ত্ম হয়ে), লাসা থেকে ৮০০ মাইল, শ্রীনগর (কাশ্মীর) থেকে লাদাক হয়ে ৬০০ মাইল আর পশুপতিনাথ (নেপাল) থেকে মুক্তিনাথ আর খোচরনাথ হয়ে ৫২৫ মাইল।

"এ যাত্রায় আমাদের আর তীর্থপুরী দেখা হল না। তীর্থপুরী তাকলাকোট থেকে জ্ঞানিমা মণ্ডি হয়ে অথবা সোজাপথে টিপ্‌রালা হয়ে ৫।৬ দিনের পথ। তীর্থপুরীর গুম্ফা বিখ্যাত। উষ্ণ প্রস্রবন আছে যাতে ক্যালসিয়াম কারবনেট আর সালফেট প্রচুর পাওয়া যায়। যাত্রীরা তাই বিভূতি বলে সংগ্রহ করেন। ভস্মাসুরের ভস্ম বলেও হিন্দুরা বিশ্বাস করেন।

"মোহন সিং গারবিয়ালের ভাঙা ঘরে বসেই আমাদের তীর্থপুরীর প্রোগ্রাম করা হয়। কিন্তু অতিরিক্ত বরফের জন্য সবাই বারণ করে যেতে। মোহন সিং গারবিয়ালের ভাঙাঘর আর একটি কারণে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এই ঘরেই প্রবোধদার কাছে আমি হিমালয়ান এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠার প্রথম প্রস্তাব করি। সুকুমার তখন বাইরে ছিল কাজে। সুকুমার ফিরে এলে প্রবোধদা বললেন,—'শম্ভু একটা ভাল প্রস্তাব দিয়েছে হে। একটা ক্লাব করা

হবে হিমালয় অনুরাগীদের জন্য। সাধু প্রস্তাব সন্দেহ নেই।'

'কিন্তু আগে তো প্রাণ নিয়ে ঘরে ফিরি, তারপর ক্লাবের কথা চিন্তা করা যাবে।' সুকুমার বলেছিল। অবশ্য পরবর্তীকালে সুকুমারই হিমালয়ান এসোসিয়েশনের আয়োজিত প্রথম পর্বতাভিযানের নেতৃত্ব করেছিল।

"চিন্তার মধ্যে ডুবে এগিয়ে চলেছি আচ্ছন্নের মত। হঠাৎ একটা হোঁচট খেয়ে বাস্তবে ফিরে এলাম। পথটা খাড়া নামতে শুরু করেছে নদীর ধারে। নদীর জল অনেকটা বেড়েছে। শুধু সাদা ফেনা দেখা যাচ্ছে। কৈলাসের অন্যরকম রূপ দেখতে পাচ্ছি সামনে। মনে হচ্ছে যেন হাত বাড়ালেই ধরা যাবে। এখান থেকে কৈলাসকে অনেকটা মন্দিরের মত দেখায়, অদ্ভুত আকার। বাঁদিকের পর্বতটির নাম 'গোম্‌বোপাং' অথবা রাবণ পর্বত। রাবণ মহাদেবের জন্য অনেককাল তপস্যা করেছিলেন এ অঞ্চলে। তিনি কৈলাস সহ মহাদেবকে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন লঙ্কায়। কিন্তু সম্ভব হয় নি শেষ পর্যন্ত। আশে-পাশের পর্বতের সঙ্গে কৈলাসের পার্থক্য বিশেষ ভাবেই চোখে পড়ে। কৈলাসের সৌন্দর্যের বর্ণনা করা কঠিন। চারদিক থেকে কৈলাসের বিভিন্ন রূপ দেখা যায়।

"মনের আনন্দে এগিয়ে চলেছি—কৈলাসের দর্শন পেয়েছি, একেবারে কাছে পৌঁছে গেছি। পথে ৪।৫টি কস্তুরী মৃগ দেখা গেল। ধীরাফুক আর বেশি দূর নেই। দুটি নদী পার হতে হবে। জলের দিকে তাকানো যাচ্ছে না। শুধু সাদা ফেনা। বরফ গলার সঙ্গে সঙ্গে জলও বেড়ে যাচ্ছে। রতনসিং সুকুমারকে পিঠে নিয়ে পার হয়ে গেল। হরিসিং রতনসিং-এর তুলনায় একটু দুর্বল। আমাকে পিঠে নেওয়া ওর পক্ষে সম্ভব নয়। দুইজনে হাত ধরে নেমে পড়লাম। প্রথম নদী পার হলাম অতিকষ্টে। ঠাণ্ডা জল আর প্রবল স্রোতে বেশ অসুবিধা হচ্ছিল। দ্বিতীয় নদীর জল আরও বেশি। হরিসিং প্রায় হাত ছেড়ে দেয় আর কি। তার ওপর জলের নিচে পাথর গড়িয়ে যাচ্ছে। একটা গর্তের মধ্যে পড়ে গেল হঠাৎ। আর তখনই একটা গড়ানো পাথর পড়ল আমার পায়ের আঙুলের ঠিক ওপরে। প্রায় যায় যায় অবস্থা। কোমরের অর্ধেক পর্যন্ত ঠাণ্ডাজলে ভিজিয়ে উঠে এলাম কোন রকমে। শীতে ঠক্‌ ঠক্‌ করে কাঁপছি। পায়ের পাতা ফেলার মত অবস্থা আর নেই। রতনসিং-য়ের ঘাড়ে ভর দিয়ে এগিয়ে চলেছি। হঠাৎ ডানদিকে দৃষ্টি পড়াতে সব ভুলে গেলাম। সামনেই বিশাল কৈলাসের নিচ থেকে চূড়া পর্যন্ত সবটাই দেখা যাচ্ছে। অপূর্ব সুন্দর।

বর্ণনা করা কঠিন। ধীরাফুক গুম্ফার দিকে ছুটতে শুরু করলাম আরও ভাল করে দেখার জন্য। ছবি তোলা শেষ করে গুম্ফার ভিতরে গিয়ে প্রদীপ জ্বালিয়ে আগুনের ধারে গিয়ে বসলাম। মনের ভেতরকার আনন্দ তখন চেপে রাখা কঠিন। ঘরের মধ্যে কয়েকজন তীর্থযাত্রীর ভিড়। কয়েকজন সাধুও আছেন। আমাদের তাঁবু নদীর ওপারে এসে গিয়েছে। আমাদের আবার নদী পেরিয়ে তাঁবুতে পৌছতে হল। নদী পার হওয়াটা চিরদিনই মনে থাকবে।

"রাতে ছিল খিচুরীর ব্যবস্থা। স্বামীজীর শরীর আবার খারাপ হয়েছে। সুকুমারও শুয়ে পড়েছে। ফুটে কর্মা রতনসিং আর হরিসিং রান্না নিয়ে ব্যস্ত। ওভারকোট চাপিয়ে টর্চ নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম অন্ধকারে। প্রায় আধ মাইল পথ চলে গেলাম যেখান থেকে কৈলাস সম্পূর্ণ দেখা যায়। একটা বড় পাথরে বসলাম। ধীরাফুক গুম্ফা থেকে ঘণ্টাধ্বনি শোনা যাচ্ছে। প্রায় দেড়ঘণ্টা একভাবে বসে থাকার পর চাঁদের আলোতে ধীরে ধীরে কৈলাস পর্বত সম্পূর্ণ দেখতে পেলাম। সে দৃশ্য আর সে অনুভূতি বলে বোঝানো সম্ভব নয়। প্রাণ মন ভরে উপভোগ করার পর দু'ঘণ্টা বাদে আবার ফিরে চললাম তাঁবুর দিকে। ঠাণ্ডায় হাত পা যেন অসাড় হয়ে গিয়েছে। জীবন সার্থক হল।

"কৈলাস সম্বন্ধে জানতে হলে স্বামী প্রণবানন্দের 'Kailas-Mansarvar' বইখানি পড়তে হবে। পশ্চিম তিব্বত-সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান অপরিসীম। অন্ধ্র প্রদেশের এই সন্ন্যাসী দিনের পর দিন, মাসের পর মাস আবিষ্কারের নেশায় হিমালয়ের দুর্গম পথে ঘুরেছেন। ছোটখাটো সাধারণ মানুষটিকে দেখলে বোঝাই যায় না যে তাঁর মধ্যে এত বড় প্রতিভা লুকিয়ে আছে। চীনা-সরকার এখন আর স্বামীজীকে তিব্বতে প্রবেশ করতে দেয় না। মানস-সরোবর আর গৌরীকুণ্ডের গভীরতা মাপার জন্য স্বামীজীই প্রথম নৌকা ভাসিয়েছিলেন। রাক্ষসতালের গভীরতা মাপা আর শেষ পর্যন্ত তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হয়ে ওঠে নি চীনাদের জন্য।

"৬ই জুলাই সকালে বেরিয়ে পড়েছিলাম ডোল্‌মা-গিরিপথের দিকে। বরফ ঢাকা নদী। কাচের মত স্বচ্ছ বরফ। খুব সাবধানে পার হতে হল। ডানদিকে কৈলাস—দেয়ালের মত খাড়া। অবশেষে এসে দাঁড়ালাম একটা পাহাড়ের গায়ে। আবার তেমনি কঠিন বরফ। আবার তেমনি পা পিছলে

যাচ্ছে। আমার লাঠির লোহার নালটা ভেঙ্গে গেল। কাজেই হামাগুড়ি দিয়ে ও বুকে হেঁটে এগোতে থাকি। ভাগ্য ভাল। একটু নরম বরফে এসে পৌছলাম। তবে এখানে ঘোড়াগুলিকে পার করা এক কঠিন সমস্যা হয়ে দেখা দিল। অনেক কষ্টে তাদের টেনে তোলা হল। বরফ ক্রমেই কোমলতর হচ্ছে। আমরা নরম তুষারে তলিয়ে যেতে থাকলাম। তুষারের তলায় লুকিয়ে থাকা পাথরের ঘষা লেগে কয়েকটি ঘোড়া ও দুটি গাধা আহত হল। সারা পথটাই সংগ্রাম করে এগোতে হল আমাদের। শেষ পর্যন্ত ক্লান্ত ও অবসন্ন অবস্থায় ১৮৪০০ ফুট উঁচু ডোল্‌মা গিরিপথের ওপরে পৌছলাম।

"গিরিবর্ত্মের নিচেই গৌরীকুণ্ড—ছোট একটি হ্রদ—তুষারাবৃত। গৌরীকুণ্ড ঠিক কৈলাসের পাদদেশে অবস্থিত। বরফ খুঁড়ে জল পাওয়া গেল। প্রাণভরে পান করলাম। ওয়াটার বটলে ভরে নিলাম পথের জন্য। তারপরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে নামতে শুরু করলাম। খাড়া উৎরাই। খুব সাবধানে নামতে হচ্ছে। নেমে এলাম একটা বরফে ঢাকা নদীর ওপরে। বসে পড়লাম সকলে। প্রখর রোদে চোখ ঝলসে যাচ্ছে। আমরা চোখ বুজে বিশ্রাম করি।

"কিছুক্ষণ পরে আবার চলতে শুরু করি। তবে বেশি দূর এগোতে পারি না। আমরা জুথুলফুক্ গুম্ফার কাছে ক্যাম্প করি।

"পরদিন। তাঁবু গুটিয়ে আবার চলা শুরু করি জুথুলপুক্ গুম্ফা দর্শন করে। এগিয়ে চলি তারছেনের দিকে। পথে পড়ল 'জংছু' নদী। নদী পার হবার পরে পরখার সমতলভূমি দেখতে পেলাম। আমরা পশ্চিমের পথ ধরলাম। কিছুক্ষণ পরে শুরু হল মরুভূমি। কেবল বালি আর বালি। শেষ পর্যন্ত ডাম্‌জুর ধারে গিয়ে একটা ছোট জলাভূমি পাওয়া গেল। সেখানেই তাঁবু ফেললাম আমরা।

"পরদিন ৮ই জুলাই। কিছুক্ষণ চলার পর আবার সেই মরুপথ। কোথাও জল নেই। প্রবল বাতাসের বিপক্ষে পথ চলেছি। অবশেষে ক্লান্ত দেহে জিউ গুম্ফাতে পৌছিলাম। একটু বিশ্রামের পরে গুম্ফা দর্শন করলাম। অসংখ্য গুম্ফা আছে এ অঞ্চলে। ৬৮ মাইল হেঁটে মানস-সরোবর পরিক্রমা করতে হয়। পরিক্রমার পথে আটটি গুম্ফা পড়ে। ৭৬ মাইল হেঁটে রাক্ষসতাল পরিক্রমা করতে হয়। যাক্‌গে, গুম্ফা দর্শনের পরে আমরা নেমে চললাম মানস সরোবরের দিকে। তাড়াতাড়ি চলেছি। আবহাওয়া খারাপ হয়ে

পড়বার আগেই স্নান সেরে নিতে হবে। মেঘের ছায়া পড়লেই উত্তাপ দশ ডিগ্রী কমে যায়।

"সরোবরের তীরে পৌঁছে সবাই স্নান করে নিলাম। জল খুবই ঠাণ্ডা। তবুও তিনটি ডুব দেবার পরই দেহের সকল অবসাদ দূর হয়ে গেল। মন ভরে উঠল এক স্বর্গীয় সুষমায়। পুণ্যস্নান শেষে পুণ্যসরোবরের তীরে উঠে এলাম সকলে। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কোথা থেকে অশান্ত পবন এলো ছুটে। ঝাঁপিয়ে পড়ল মানসের বুকে। শান্ত সরোবরে তুফান উঠল।

"মানসের তীর থেকে শুরু হল প্রত্যাবর্তন। স্বর্গ থেকে বিদায় নিয়ে মর্ত্যের পথে এগিয়ে চলি আমরা। একই পথ, একই সহযাত্রী। কিন্তু যে মন যাবার পথে আমার সঙ্গী ছিল, আজ আর সে নেই সঙ্গে। তবু আমি চলেছি ফিরে। কিছুই ভাল লাগছে না। কাউকে ভাল লাগছে না। তাই একা একা পথ চলেছি। কালও এমনি চলেছি। আজও তাই। সহযাত্রীরা পড়ে আছে পেছনে। আমি এসেছি এগিয়ে। পথ জনমানবশূন্য। আমি একা।

"একজন ঘোড়সওয়ার আসছে বিপরীত দিক থেকে। অভিবাদন করে সে অবতরণ করে আমার সামনে। আমি অবাক হই। সে বলে—তোমাকে একটা সুসংবাদ দিচ্ছি। তোমাদের সঙ্গী মিস্টার সান্যাল আসছেন পেছনে। তিনি আজ বরফুতে তাঁবু ফেলবেন। আনন্দে আত্মহারা হয়ে ছুটতে শুরু করলাম। প্রায় পাঁচ মাইল ছুটে যখন বরফু পৌঁছলাম, প্রবোধদা তখনও সেখানে আসেন নি। চা তৈরি করে তাঁদের প্রতীক্ষায় রইলাম। প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে তিনি এলেন। আমাদের দেখে তিনিও আমাদেরই মতো আনন্দিত হয়ে উঠলেন। হাসি আর গল্পের মধ্য দিয়ে একসময় সন্ধ্যাশেষে রাত হল। সবাই একসঙ্গে খেতে বসা গেল। পরোটা ও স্পেশাল আলুর দম দিয়ে তিব্বতের মাটিতে মিলনোৎসব পালন করলাম আমরা।

"১১ই জুলাই, আষাঢ়ে পূর্ণিমার পুণ্য প্রভাতে আমরা তাকলাকোট থেকে ১২ মাইল দূরে খোচরনাথের গুম্ফা দর্শন করলাম। পথের তেমন কোন নতুনত্ব নেই। তবে বেশ কষ্ট করে চারটি বড় বড় নদী পেরোতে হল। কর্ণালী নদীর তীর ঘেঁষে আমাদের পথ। নদীর ওপারে নেপাল-হিমালয়। গুকুং গ্রাম থেকে তিব্বতী জীবনধারার কিছু পরিচয় পেলাম।

"খোচরনাথ কর্ণালী নদীর তীরে একটি প্রশস্ত উপত্যকা। গ্রামের চারিদিকে চাষাবাদ আর মধ্যস্থলে গুম্ফা। মূল মন্দিরের তিনটি মূর্তি দর্শনীয়। অনেকের

ধারণা এ তিনটি রাম লক্ষ্মণ ও সীতার মূর্তি। কিন্তু সেটি সত্য নয়। পাশের ছোট বড় মন্দিরে মহাকালী, মহাকাল, মৈত্রেয়, সপ্তবুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব প্রভৃতির অনেক সুন্দর সুন্দর মূর্তি আছে। খোচরনাথ সম্পর্কে বহু গল্প প্রচলিত আছে। এমন গুম্ফা আমরা ইতিপূর্বে আর দর্শন করি নি। খোচরনাথ থেকে হাঁটাপথে নেপালের প্রসিদ্ধ তীর্থ মুক্তিনাথ হয়ে পশুপতিনাথ যাওয়া যায়।

"পরের কাহিনী কেবলই প্রত্যাবর্তনের। ১৩ই জুলাই লিপুলেখ পেরিয়ে ভারতের মাটিতে ফিরে এলাম। তখনও জানতাম না যে কালাপানিতে আমাদের জন্য বিপুল অভ্যর্থনার আয়োজন করা হয়েছে। কিন্তু সেকথা শুনে তোমাদের কোন লাভ নেই। আমার কৈলাস কাহিনী এখানেই শেষ হল।"

॥ চার ॥

'In these hills, Nature's hospitality eclipses all men can ever do. The enchanting beauty of the Himalayas, their bracing climate and soothing green that envelops you, leaves nothing to be desired. I wonder whether the scenery of these hills and the climate are to be surpassed or equalled by any of the beauty spots of the world After having been nearly three weeks in Kumaon Hills, I am more than ever amazed why our people need go to Europe in search of health.'···বলেছেন গান্ধীজী। বলেছেন কৌশানী সম্পর্কে। তিনি কৌশানীর নাম দিয়েছিলেন—সুইজারল্যাণ্ড অভ্ ইণ্ডিয়া।

সেই সীমাহীন সৌন্দর্যের আধার, অতুলনীয় স্বাস্থ্যকর শৈলাবাস, কৌশানীতে এসে থেমেছে আমাদের বাস।

ড্রাইভারের অনুমতি নিয়ে আমরা নেমে পড়ি পথে। বেশ শীত-শীত করছে। বাস স্ট্যাণ্ডের উচ্চতা ৬২০০ ফুট। আলমোরা থেকে ৩২ মাইল। দু'শ দশ মাইল বিস্তৃত হিমালয়ের যে তুষারধবল শৃঙ্গমালাকে রাণীক্ষেত থেকে দেখা যায় দিগন্তের প্রান্তে, তাকে এখান থেকে মনে হয় নাগালের মধ্যে। এই সুবিস্তৃত পর্বতশ্রেণীর পূব থেকে পশ্চিমে রয়েছে—নামপা (২২, ১৬২´),

আপি (২৩,৩৯৯´), পঞ্চচুলি (২০,৮৫০´; ২২,৬৫০´; ২০,১৩০´; ২০,৭৮০´ ও ২১,১২০´), নউলফু (২১, ৪৪৬´), রালাম গিরিবর্ত্ম (১৮,০৪০´), নন্দাকোট (২২,৫১০´), পিণ্ডারী হিমবাহ (১২-১৩০০০´), ট্রেল্স গিরিবর্ত্ম (১৭,৭০০´), নন্দাদেবী পূর্ব (২৪,৩৯১´), নন্দাদেবী (২৫,৬৪৫´), ত্রিশূল (২৩,৪০৬´; ২২,৪৯০´; ২২,৩৬০´), নন্দাঘুন্টি (২০,৭০০´), হাতি পর্বত (২২,৩৭০´), ঘোড়ী পর্বত (২২,০১০´), কামেট (২৫,৪৪৭´), নীলকণ্ঠ (২১,৬৫০´), চৌখাম্বা (২৩,৪২০´), কর্চাকুণ্ড (২১,৬৯৫´), কেদারনাথ (২২,৭৭০´) ও পোরবন্দী (২১,৭৬০´)।

পশ্চিমদিক থেকে একটি প্রশস্ত পথ এসে মিশেছে বাসপথে। দুটি পথের সংযোগস্থলে বাস স্ট্যাণ্ড। রাস্তার ধারে কয়েকটি দোকান। বাজার বলতে যা বোঝায় তা নেই কৌশানীতে। তবে গ্রামবাসীরা তরি-তরকারী, দুধ ডিম ও মাছ নিয়ে সকাল-বিকেল বসে এখানে।

এই দেখুন,শিবের গীত গাইতে গিয়ে ধান ভান্‌তে শুরু করলাম। কৌশানীর কাহিনী বলতে গিয়ে বাজারের কথা। কিন্তু কি করব? জগতে বাস করতে হলে বাজার অপরিহার্য। আর আজকের মানুষের মনে বাজারের চেয়ে বড় ভাবনা নেই। বাজারে যে আগুন লেগেছে।

লাগুক্ গে। যারা নেভাবার, তারাই নেভাবে। যদি নেভাতে না পারে, সে আগুনে সবার সঙ্গে আমিও জলে-পুড়ে মরব। তার আগে কৌশানীকে দেখে নিই প্রাণভরে। স্বর্গকে না দেখতে পারলে যে মরেও মনে শান্তি পাব না। মৃত্যুর পরে স্বর্গে ঠাঁই হবে, সে কথা কে জোর করে বলতে পারে?

কৌশানী মোটেই প্রাচীন জনপদ নয়। বিখ্যাত উত্তরাখণ্ড বিশারদ এডউইন টি. এ্যাট্‌কিন্‌সন যখন কুমায়ুন পরিক্রমা করেন (১৮৮২-৮৪ খৃঃ) তখনও কৌশানীতে কোন জনপদ গড়ে ওঠে নি কারণ তিনি কৌশানীর কোন উল্লেখ করেন নি। জেনারেল চার্লস জি.ক্রস ১৯০৭ সালে কৌশানী এসেছিলেন। তখন কিন্তু কৌশানীতে জনপদ গড়ে উঠেছে। ক্রস তাঁর "Twenty years in the Himalayas" গ্রন্থে লিখেছেন—'Most delightfully were we entertained on our way, and myself more than once by Mr. Norman Troup and Captain Troup at their estate at Kausanie. Mr. Troup probably knows more of Garhwal shikar Valleys

than any other sportsman of present time.'

একই সঙ্গে এসেছিলেন এ. এল. মাম্। তিনিও তাঁর 'Five months in the Himalayas' বইয়ে ট্রুপ ভ্রাতৃদ্বয়ের আতিথেয়তার উল্লেখ করেছেন।

কাজেই মনে হয় নর্মান ট্রুপই প্রথম এখানে এসে বসতি স্থাপন করেন। তাঁকে কেন্দ্র করেই এই জনপদ গড়ে উঠেছিল। কৌশানী বিংশ শতাব্দীর জনপদ। তবে জনপদ হিসেবে কৌশানী আজও ক্ষুদ্র। কাছাকাছি কয়েকটি চা-বাগান আছে। তবু কৌশানী রূপান্তরিত হয় নি জনবহুল শহরে। ভালই হয়েছে। নইলে হয়তো হাজার হাজার স্বাস্থ্যান্বেষী ও দর্শনার্থী প্রতি বছর পাড়ি জমাতেন না এখানে। প্রকৃতি প্রেমিকদের আদর্শক্ষেত্র কৌশানী। এখান থেকে দূর দুর্গম হিমালয়ের গিরি-কান্তার ও গহন গভীর গিরি-সঙ্কটের রূপ অপূর্ব। এখানকার বন, এখানকার ঝরণা, এখানকার মেঘ আর আকাশ অতুলনীয়।

তিনটি ডাকবাংলো আছে কৌশানীতে—অন্তরীম জিলা পরিষদের ডাক-বাংলো, নির্মাণ বিভাগের ইন্‌সপেকশান হাউস এবং স্টেট-বাংলো। প্রথমটিতে বাস করবার জন্য কোন পূর্বানুমতির প্রয়োজন হয় না। যিনি আগে আসবেন, তিনিই আশ্রয় পাবেন। অপর দুটির জন্য আলমোরার নির্মাণ বিভাগের একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের কাছ থেকে অনুমতি নিতে হয়।

নৈনিতাল ছাড়া কুমায়ুনের সমস্ত শৈলাবাসই অবহেলিত। তাই বিনসর ও কৌশানীতে আজও বৈদ্যুতিক আলো এসে পৌছয়নি। তবু সৌন্দর্যপিপাসু ও স্বাস্থ্যান্বেষীরা দলে দলে কৌশানীতে আসেন। আগন্তুকদের তুলনায় এ তিনটি ডাকবাংলো নিতান্তই নগণ্য। ফলে গ্রীষ্মকালে কৌশানীতে স্থানাভাব দেখা দেয়। অবিলম্বে এখানে একটি টুরিস্ট রেস্ট-হাউস নির্মিত হওয়া প্রয়োজন।

জনসমাগমের বিচারে জিলা-পরিষদের ডাকবাংলোটি প্রথম। বাস স্ট্যাণ্ড থেকে পশ্চিমের পথটিতে কয়েক পা এসেই ডানদিকে ডাকবাংলোর সিঁড়ি। বেশ খাড়া সিঁড়ি। আমরা সিঁড়ি ভেঙ্গে ডাকবাংলোয় উঠে আসি। এখানকার উচ্চতা ৭০০০ ফুট। বহু মনীষীর পদধূলিধন্য এই ডাকবাংলো। বহু লেখক তাঁদের রচনায় এই আবাসের উল্লেখ করেছেন। কাজেই আজ এখানে আমি প্রথম পদার্পণ করলেও এই কোমল শ্যামল দূর্বা ছাওয়া, নানা রঙের ফুলে ভরা রমণীয় আবাসটি আমার বহুকালের চেনা। চীর আর দেওদারে ঘেরা শান্ত সুন্দর কৌশানীও তাই আমার অপরিচিত নয়।

এখানকার অপার সৌন্দর্য আর অসীম শান্তি একদা আকর্ষণ করেছিল গান্ধীজীকে। তিনি তিন সপ্তাহ বাস করেছিলেন এখানে। গিরি-কান্তারের ধ্যানগম্ভীর রূপ তাঁকে 'অনাসক্তি যোগ' রচনার প্রেরণা যুগিয়েছিল।

আর তাই বোধ করি গান্ধী-শিষ্যা শ্রীমতী সরলা বেন এখানে এসে আর ফিরে যেতে পারেন নি। আমেরিকার মেয়ে মিস ক্যাথরিণ মেরী হেইলিমেন গান্ধী-দর্শনে আকৃষ্টা হয়ে এসেছিলেন এদেশে। গান্ধীজীর সান্নিধ্যে এসে নবজন্ম লাভ করলেন। গুরুদেব শিষ্যার নতুন নাম দিলেন সরলা—ভারতভগিনী সরলা বেন। কৌশানীর প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রভাবিতা হয়ে তিনি এখানে প্রতিষ্ঠা করেছেন লক্ষ্মী আশ্রম। আজও সে আশ্রম আধুনিক জীবনের ক্লেদমুক্ত কৌশানীর শিশু ও মেয়েদের মুক্তিতীর্থ। আশ্রমটি এখান থেকে একটু দূরে। তাই আজ আর দর্শন করার সৌভাগ্য হবে না আমাদের।

দুখানি করে ঘরের চারটি স্যুট নিয়ে জিলা পরিষদের এই ডাকবাংলো। রান্নাঘরগুলি সব একসঙ্গে, একটু দূরে। তবে প্রত্যেক স্যুটের জন্য একটি করে আলাদা রান্নাঘর আছে। নিজেরা রান্না না করতে পারলেও এখানে অসুবিধে নেই কোন। চৌকিদার রান্না করে দেয়। কৌশানীতে কোন খাবার হোটেল নেই। তবে থাকা-খাওয়ার একটি হোটেল আছে। আর বাস স্ট্যাণ্ডে আছে কয়েকটি চায়ের দোকান। গরম গরম পকোড়া পাওয়া যায়।

ইন্‌সপেকশান বাংলোটি জিলা পরিষদের ডাকবাংলোর কাছেই অবস্থিত। দুটি স্যুট আছে। সেটিও খুব সাজানো-গোছানো এবং সুন্দর। সেখানেও ফুলবাগান আছে।

তবে ফুল দেখতে হলে যেতে হবে স্টেট-বাংলোতে। নিচের রাস্তা দিয়ে কিছুদূর পশ্চিমে গেলে পাহাড়ের ওপরে একটি উপত্যকার ধারে অবস্থিত। ঐ উপত্যকায় চা-বাগান করতে চেয়েছিলেন নর্মান ট্রুপ। তাই নির্মাণ করেছিলেন একটি ভিলা। তাঁর চা-বাগানের পরিকল্পনা বাস্তবে পরিণত হয় নি। কিন্তু লংস্টাফ, রুস, মাম ও স্মাইথ প্রভৃতি সেকালের সমস্ত পর্বতারোহীরা হিমালয়ের পথে বাস করে গেছেন এই ভিলাতে। ট্রুপ আজ আর নেই। কিন্তু আছে তাঁর ভিলাটি। সেই ভিলাই এখন স্টেট-বাংলো—কৌশানীর ভি. আই. পি. নিবাস। যেমন গড়ন, তেমনি অবস্থান। বাগানটিও দেখবার মতো—ফুলে ফুলে বোঝাই হয়ে থাকে। তাছাড়া আবাসটিকে মনোরম করে তুলবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন কর্তৃপক্ষ, সফলও হয়েছেন।

তিনটি দু-ঘরের স্যুট নিয়ে স্টেট-বাংলো। ঘরের মেঝেতে গালিচা পাতা, লাগোয়া বাথরুম। প্রশস্ত বারান্দা আর বিশাল ডাইনিং হল। ভাড়া খুবই সামান্য—স্যুট প্রতি দৈনিক দু টাকা। তবে কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া কেউ থাকতে পারে না সেখানে, আর এই অনুমতি সংগ্রহের ব্যাপারটা মোটেই সহজসাধ্য নয়।

কাজেই সে ভি. আই. পি নিবাসের কথা ভেবে কি হবে, তার চেয়ে সর্বসাধারণের আশ্রয় এই জিলা পরিষদের ডাকবাংলোর কথাই ভাবা যাক। হিমালয়ের দিকে তাকিয়ে সারাদিন দাঁড়িয়ে থাকা যায় এখানে। সকাল দুপুর সন্ধ্যা ও রাতে, শরৎ গ্রীষ্ম শীত ও বসন্তে—সর্বদাই সৌন্দর্য-পিপাসুর তৃষ্ণা মেটে। সদাই অপরূপা প্রকৃতির রূপ পরিবর্তনের পালা দেখা যায়, শোনা যায় পাখিদের কাকলি আর বনের মর্মর। এখানকার শীতল সমীর গ্রীষ্মবিদগ্ধ সমতলের জীবনকে দেয় ভুলিয়ে, দেহে ও মনে শান্তির প্রলেপ দেয় বুলিয়ে।

কৌশানীর শীত কিন্তু মোটেই উপেক্ষা করবার মত নয়। অথচ কৌশানীকে দেখতে হলে শীতকে উপেক্ষা না করে উপায় নেই। উষার আগমনে শয্যা ত্যাগ করতে হবে এখানে। মাটির বুকে দিনের আলো আসার আগে, যখন কেবল ভোরের আকাশ ছেয়ে যায় সোনালী রোদে, তখন এই ডাকবাংলোর বারান্দায় বসে দেখতে হয় তুষারমৌলি হিমালয়কে। সে যে তখন হোলীর পোশাক পড়ে দাঁড়ায় সেখানে। তখন তাকে দেখতে না পারলে কৌশানী-দর্শন অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

আমাদেরও তাই রয়ে গেলো। কারণ সেই বিচিত্র বর্ণের বহুরূপী হিমালয়কে এখান থেকে দর্শন করার সুযোগ নেই আমাদের। এখুনি নেমে যেতে হবে নিচে। নইলে ড্রাইভার আমাদের ফেলে রেখেই বাস নিয়ে চলে যাবে গরুড়। ছুটতে ছুটতে নেমে আসি নিচে। ড্রাইভার হর্ণ বাজিয়ে চলেছে। আমাদের দেখে ড্রাইভার হর্ণের গর্জন বন্ধ করে। কিন্তু কণ্ডাকটারের গর্জন আরম্ভ হয়। আমরা তার ধমককে নীরবে হজম করে সুবোধ বালকের মত বাসে উঠে নিজ নিজ আসনে বসে পড়ি।

ড্রাইভার গাড়িতে স্টার্ট দেয়। সহসা মোহিত এগিয়ে যায় তার কাছে। করুণ কণ্ঠে বলে, "ড্রাইভার সাব, এতগুলো চায়ের দোকান, অনেকক্ষণ চা খাই নি। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। যদি মিনিট দুয়েক······"

"নহী হোগা, টেম্ খতম। গাড়ি ছোড়।" ড্রাইভার কিছু বলার আগেই

নির্দয় কণ্ডাকটার গর্জে ওঠে।

মোহিত নতমস্তকে নিজের জায়গায় এসে বসে। কিন্তু ড্রাইভার সহসা ইঞ্জিন বন্ধ করে দেয়। কণ্ডাকটার ও আমাদের বিস্মিত করে সে মোহিতকে বলে, "যাইয়ে জলদি চায় পী লিজীয়ে।"

হৈ হৈ করে বাস থেকে নেমে আসি আমরা। কণ্ডাকটার মুখখানি গোমড়া করে বসে থাকে তার জায়গায়।

চা ও পকোরা খেয়ে আবার বাসে এসে উঠি। মোহিত হাতের ঠোঙাটা কণ্ডাকটারকে দিয়ে বলে, "তুমি আর ড্রাইভার ভাগ করে খেয়ে নাও।"

অসিতবাবু তার চিবুক ধরে আদর করেন, "একটু হাস তো খোকা। একটু হ্যাঁ, অল্প একটু।"

কণ্ডাকটার হেসে ফেলে। তাকে হাসতে দেখে হাসতে হাসতে ড্রাইভার গাড়ি ছেড়ে দেয়। আমরা এগিয়ে চলি গরুড়ের দিকে।

কাঠগুদাম থেকে আলমোরা ও কৌশানী হয়ে গরুড ও বাগেশ্বর পর্যন্ত দুটি দৈনিক বাস সার্ভিস আছে। তা ছাড়া আলমোরা ও রাণীক্ষেত থেকেও দৈনিক কয়েকখানি করে বাস কৌশানী হয়ে গরুড গোয়ালদাম অথবা বাগেশ্বর যাতায়াত করে। কাজেই কৌশানী আসা যাওয়ার অসুবিধে নেই কোন।

কৌশানী থেকে গরুড় ১০ মাইল। পথে পরে ভনপাদিয়ার, লোবাং, ভোজগণ, ভেতা (৪২০৪´) ও দর্শনী গ্রাম।

উৎরাই অথবা সমতল পথে বাস চলেছে ছুটে। চড়াই পথ আর পড়ছে না চোখে। আমরা চলেছি নেমে। যাচ্ছি বিখ্যাত বৈজনাথ উপত্যকায়। আজ গরুড়েই আমরা রাত্রিবাস করব। কাল সকালে বৈজনাথ দর্শন করে চলে যাব গোয়ালদাম—বাসপথের প্রান্তসীমা। সেখান থেকে শুরু হবে পদযাত্রা—দুর্গম গিরি-কান্তারের শুভযাত্রা।

॥ পাঁচ ॥

যতদূর দৃষ্টি চলে, সবুজ মাঠ আর সোনালী ক্ষেত। তারই মাঝে শুয়ে আছে কালো একটি পথ। পথের পাশে ক্ষেত। ক্ষেতের ধার দিয়ে ছুটে চলেছে সদাচঞ্চলা একটি সংকীর্ণা স্রোতস্বিনী—গোমতী। পথটি বাঁক ফিরেছে।

একটু বাদে গোমতীর ওপরে একটি পুল। তারপরে ওপারে পৌঁছে খানিকটা সোজা এগিয়ে পথ গেছে হারিয়ে। কিন্তু বেশ বোঝা যাচ্ছে, সেখানেও পথের পাশে পাশে সবুজ মাঠ কিংবা সোনালী ক্ষেত আছে।

দুর্গম হিমালয়ের অভ্যন্তরে এমন সীমাহীন সমতল বড় একটা দেখা যায় না। আমরা প্রত্যেকেই সাধ্যমত হিমালয়ের পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছি। আকাশচুম্বী তুষারাবৃত শৃঙ্গমালা থেকে তরাই অঞ্চল পর্যন্ত হিমালয়ের বহু বিচিত্র রূপ দর্শন করেছি। অনেক উপত্যকা দেখেছি, কিন্তু গিরি-কান্তারের অন্তরে এমন সীমাহীন সমতল খুব কমই দেখেছি। বাস্তবিকই বিচিত্র সুন্দর এই উপত্যকা। বিস্ময়কর এই সুবিরাট উপত্যকা।

কিছুক্ষণ আগে আমরা গরুড় এসেছি। সুজল, দাশু ও প্রাণেশের সঙ্গে একটু পায়চারি করছি পথে। কথায় কথায় ওদের বলছি, "এই উপত্যকার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন সেকালের কাত্যুরী রাজারা। তাঁরা এখানে গড়ে তুলেছিলেন একটি সমৃদ্ধ জনপদ—বৈজনাথ। তখন এ উপত্যকার নাম ছিল বৈজনাথ বা কাত্যুরী উপত্যকা।

"কাত্যুরী রাজবংশের ইতিহাস জানতে হলে আমাদের কুমায়ুনের প্রাচীন ইতিহাসকে স্মরণ করতে হবে। স্মরণ করতে হবে খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দের ইতিহাস। আর্যরা তখন আর্যাবর্তে অনার্য বিতাড়নে ব্যস্ত। হিমালয়ের দিকে নজর দেবার অবসর নেই তাদের। এই সময় আর্যদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় লুব্ধ হয়ে মধ্য এশিয়ার কাশগড় (খসগিরি) ও খোতান থেকে আর্যদের প্রতিবেশী খস বা সকরা ভিন্নপথে কুমায়ুনে প্রবেশ করলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁরা আদি অধিবাসী কিরাতদের পরাজিত করে কুমায়ুনে কায়েম হয়ে বসলেন। কিন্তু কিরাতদের সঙ্গে তাঁদের শত্রুতা দীর্ঘস্থায়ী হল না। উভয় জাতির মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক স্থাপিত হল। তাঁরা মিলে মিশে বাস করতে থাকলেন।

"বহু শতাব্দী পরে আর্যাবর্ত সম্পূর্ণরূপে আর্যদের করতলগত হল। আর্যদের নজর পড়ল হিমালয়ের দিকে। মহাভারতের যুগে তাঁরা পাঞ্চাল (রোহিল-খণ্ড) থেকে কুমায়ুনে প্রবেশ করলেন। খসরা কিন্তু কোন বাধা দিলেন না। বরং সানন্দে তাঁদের বরণ করলেন। বিনাযুদ্ধে আর্যরা কুমায়ুন অধিকার করে নিলেন। কিন্তু তাঁরাও খসদের বিতাড়িত করলেন না। এক সঙ্গে বসবাস করতে থাকলেন। উভয়ের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক স্থাপিত হতে থাকল। কিছুকাল পরে আর দু জাতির পৃথক সত্তা অবশিষ্ট রইল না। উভয়ে মিলে

মিশে এক হয়ে গেলেন। সৃষ্ট হল এক নতুন জাতি। এই জাতির বর্তমান নাম কুমায়ুনী।

"দুর্ধর্ষ কুমায়ুনীরা কিছুকাল পরে গাড়োয়ালের কিয়দাংশ অধিকার করে নিলেন। প্রতিষ্ঠা করলেন সুবিশাল স্বাধীন ব্রহ্মপুর রাজ্য। দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ৬৬০ মাইল বিস্তৃত ছিল ব্রহ্মপুর। কৈলাস মানস-সরোবর ও রাবণ হ্রদ এই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

"৬৪৯ খৃষ্টাব্দে তিব্বতের রাজা মোং-চন-গামফো ব্রহ্মপুর আক্রমণ করে রাজ্যের উত্তরাংশ অধিকার করে নেন। সেই থেকে দু'শ বছর ধরে তিব্বতীরা কুমায়ুনে রাজত্ব করেছেন। ৮৪৮ খৃষ্টাব্দে মগধরাজ দেবপাল ও কনৌজরাজ প্রথম ভোজ কুমায়ুন আক্রমণ করে তিব্বতীদের তাড়িয়ে দিলেন। কিন্তু তাঁরা লিপুলেখ গিরিবর্ত্মের ওপারে নিজেদের অধিকার বিস্তার করলেন না। ফলে শিবালয় কৈলাস তিব্বতেই রয়ে গেল।

"দেবপাল ও প্রথম ভোজের সম্মিলিত আক্রমণে কুমায়ুন তিব্বতী শাসনমুক্ত হলেও কুমায়ুন কনৌজের অধিকারে এল। তবে প্রথম ভোজ একজন কুমায়ুনী প্রতিনিধির হাতেই কুমায়ুনের শাসনভার অর্পণ করলেন। এই প্রতিনিধির নাম বসন্তন দেব। তাঁর স্ত্রীর নাম সজ্জনরা দেবী। বসন্তন দেব ৮৫০ খৃষ্টাব্দে উত্তরাখণ্ডের শাসক নিযুক্ত হন। তিনিই কাত্যুরী রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। তখন কার্তিকেয়পুর (জোশীমঠ) রাজ্যের রাজধানী ছিল। তবে বৈজনাথ রাজ্যের পশ্চিমাংশের আঞ্চলিক শাসনকেন্দ্র ছিল। সেখানকার শাসনকর্তাকে বলা হত উপরিক। কনৌজ রাজের প্রতিনিধি হলেও বসন্তন দেব স্বাধীন নরপতির মতই ছিলেন। তাই স্থানীয় জনসাধারণ তাঁকে রাজা বলেই অভিহিত করতেন। তবে তিনি এবং তাঁর পরবর্তী সাতজন রাজা কনৌজরাজকে মান্য করে চলেছেন।

"বসন্তন দেব বিশ বছর রাজ্যশাসন করেছেন। তাঁর মৃত্যুর পরে ৮৭০ খৃষ্টাব্দে পৌত্র খরপর দেব পিতামহের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার সম্পর্কে ইতিহাস এখনও নীরব। খরপর সম্ভবতঃ সতেরো বছর কুমায়ুন শাসন করেছেন। ৮৮৭ খৃষ্টাব্দে খরপরের পুত্র অধিধ্বজ দেব পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল লোদধা দেবী। তিনি আট বছর রাজ্যশাসন করেছেন। পুত্র ত্রিভুবনরাজ দেব মাত্র কয়েকমাস রাজ্যশাসন করেন। কিন্তু তিনিই সম্ভবতঃ রাজধানী জোশীমঠ (কার্তিকেয়পুর) থেকে বৈজনাথে স্থানা-

স্থগিত করেন। তবে তাঁর পরবর্তী কয়েকজন রাজা কার্তিকেয়পুরকেই প্রধান কর্মস্থল করে রাজত্ব চালান। স্থায়ীভাবে বৈজনাথে রাজধানী আসে সুভিক্ষরাজের রাজত্বকালে। কিন্তু সে কথা পরে হবে। যে কারণেই হোক ঐ একই বছরে (৮৯৫ খৃঃ) শাসনকার্য গ্রহণ করেন ত্রিভুবনরাজের পুত্র নিংবর্ত দেব। তিনি বিশ বছর রাজ্যশাসন করেছেন। তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল নাশু দেবী ও পুত্রের নাম বানাশু। বানাশু শাসনকার্য গ্রহণ করেন ৯১৫ খৃষ্টাব্দে। তিনি পনেরো বছর রাজ্যশাসন করেছেন। বানাশু দেবের পরে রাজ্যের শাসক হন তাঁর পুত্র ইষ্টগণ দেব (৯৩০ খৃঃ)। তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল বেগ দেবী। তিনিও পনেরো বছর রাজ্যশাসন করেছেন। পুত্র ললিতসুর দেব ৯৪৫ খৃষ্টাব্দে কুমায়ুনের শাসনদণ্ড গ্রহণ করেন। শুরু হয় স্বাধীন কাত্যুরী রাজবংশের ইতিহাস। কুমায়ুনের স্বর্ণযুগের সূচনা হল।

"পাণ্ডুকেশ্বরের যোগবদ্রী ও ধ্যানবদ্রী মন্দিরে প্রাপ্ত চারখানি তাম্রলিপি ও বাগেশ্বরে প্রাপ্ত একখানি শিলালিপি থেকেই কাত্যুরী রাজবংশের প্রাচীন ইতিহাস অর্থাৎ তৎকালীন গাড়োয়াল ও কুমায়ুনের ইতিহাস রচিত হয়েছে। পাণ্ডুকেশ্বরের চারখানি তাম্রলিপির একখানি হারিয়ে গেছে। বাকী তিনখানি সযত্নে রক্ষিত আছে জোশীমঠে—বদ্রীনাথ মন্দির সমিতির কার্যালয়ে। বাগেশ্বরের শিলালিপিখানিও বর্তমানে নিখোঁজ। তবে এ্যাটকিন্‌সন্‌ যখন বাগেশ্বরে আসেন তখন এই শিলালিপিটি ছিল। এ্যাটকিন্‌সন্‌ সেটির একখানি নকল করে নিয়েছিলেন। এখন নকলই আসলের ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

"এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে পরিব্রাজক এ্যাটকিন্‌সনের কথা। ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক, ভূতাত্ত্বিক এ্যাটকিন্‌সন। পাশ্চাত্য আমাদের থেকে নিয়েছে অনেক, আবার দিয়েছেও দু হাত ভরে। জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের অবদানের কথা আমাদের চিরকাল শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হবে। পর্বতারোহণও পাশ্চাত্যের অবদান। ইউরোপীয়রা হিমালয়কে নবরূপে প্রকাশ করেছে। পশ্চিমী পর্যটকরাই হিমালয়ের প্রকৃত স্বরূপ তুলে ধরেছেন আমাদের সামনে। এজন্য তাঁরা হাসিমুখে মৃত্যু পর্যন্ত বরণ করেছেন। সমাজ ও সংসার ফেলে দুঃসহ দুঃখ সহ্য করে হিমালয়ের পথে পথে ঘুরে বেরিয়েছেন; শুধু শৃঙ্গারোহণেই সন্তুষ্ট থাকেন নি, দুর্গম হিমালয়ের জরিপ করে মানচিত্র প্রনয়ণ করেছেন। হিমালয়ের মানুষদের সঙ্গে মিশে তাঁদের সমাজ ও জীবনকে জেনেছেন। প্রাচীন মন্দির ও নগরী থেকে হিমালয়ের ইতিহাস আবিষ্কার

করেছেন। হিমালয়ের ভূগোল ও ভূতত্ত্বকে নিরূপণ করেছেন।

"যাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সাধনার বলে আজ আমরা হিমালয়কে জানতে পেরেছি, এ্যাটকিন্‌সনের স্থান তাঁদের প্রথম সারিতে। তিনি ১৮৮২ সাল থেকে ১৮৮৪ সাল পর্যন্ত দু বছরের অধিককাল গাড়োয়াল ও কুমায়ুন সহ সমস্ত উত্তর প্রদেশ পর্যটন করেছেন। তিনি বহু মন্দির দর্শন করেছেন। অসংখ্য শিলালিপি, তাম্রলিপি ও প্রতিমূর্তি নিয়ে গবেষণা করে খসজাতির এবং কাত্যুরি ও চন্দ্রবংশের ইতিহাস রচনা করেছেন। গ্রাম্যগাঁথার মাধ্যমে সেকালের সামাজিক রীতিনীতি ও ধর্মের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন। তাঁর সেই আহরিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার কথা তিনি 'The Himalayan Districts of the North Western Provinces of India (1882—1884) নামক গ্রন্থে তিন খণ্ডে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। এই গ্রন্থ আজও অমূল্য সম্পদ বলে বিবেচিত। হিমালয়পথিক ভারতবন্ধু এ্যাটকিন্‌সন্‌কে আমি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

"এবারে এসো আবার ললিতস্মরের কথায় ফিরে আসি। কল্পনা করি সেই রাজকীয় নাটকের। যে নাটক সেদিন অভিনীত হয়েছিল কনৌজরাজ প্রথম মহীপালের রাজসভায়।

একদিন অপরাহ্ণে অমাত্যগণ পরিবৃত হয়ে মহারাজ মহীপাল রাজকার্যে ব্যস্ত রয়েছেন। এমন সময় দ্বার-রক্ষক এসে মহারাজকে কুর্নিশ করল। বিনীত কণ্ঠে বলল—কার্তিকেয়পুর থেকে একজন দূত এসেছে। সে মহারাজের দর্শনপ্রার্থী।

বহুকাল কার্তিকেয়পুরের কোন সংবাদ পান না মহীপাল। তিনি খুশী হলেন। আগন্তুককে নিয়ে আসতে বললেন। অনতিকাল পরে দূত এসে অভিবাদন করে মহীপালকে। তাঁর হাতে একখানি পত্র দিয়ে বলে—আমি কার্তিকেয়পুরের অধিপতি মহারাজাধিরাজ ললিতস্মর দেবের রাজদূত।

—রাজদূত, মহারাজাধিরাজ! চীৎকার করে ওঠেন মহীপাল। বল, সম্রাট মহীপালের দাসানুদাস সর্দার ললিতস্মরের পত্রবাহক।

—না, মহারাজ আমি ঠিকই বলেছি। আর সেই কথাই লেখা আছে ঐ লিপিতে।

—মন্ত্রী?

—সম্রাট!

পত্রখানি তাঁর হাতে দিয়ে মহীপাল বলেন—পাঠ করুন।

পত্র পড়ে মন্ত্রী বলেন—কার্তিকেয়পুরের প্রাক্তন শাসক ইষ্টগণ ইহলোক ত্যাগ করেছে। তার পুত্র ললিতস্থর পিতার আসনে বসেছে। সে আপনার বশ্যতা স্বীকার করতে অসম্মত। নিজেকে স্বাধীন নরপতি রূপে ঘোষণা করে সে আপনার সখ্যতা কামনা করেছে।

—সখ্যতা! সেনাপতি? গর্জে উঠলেন মহীপাল।

—মহারাজ!

—অবিলম্বে সসৈন্যে যাত্রা করুন। কার্তিকেয়পুর অবরোধ করে সেই অর্বাচীনকে অবাধ্যতার উপযুক্ত শাস্তি দিন।

সেনাপতি সঙ্গে সঙ্গে সম্রাটের আদেশের কোন উত্তর দেন না। তিনি আগন্তুকের দিকে তাকান।

উত্তেজিত মহীপাল নিজের ভুল বুঝতে পারেন। অপেক্ষাকৃত শান্ত কিন্তু গম্ভীর স্বরে ললিতস্থরের পত্রবাহককে বলেন—তুমি এবারে আসতে পার!

—আমার পত্রের উত্তর? দূত প্রশ্ন করে।

—পত্রলেখককে বলো, যুদ্ধক্ষেত্রেই সে তার পত্রের উত্তর পাবে।"

"তার পরে?" আমাকে থামতে দেখে সুজন বলে ওঠে।

আমি চুপ করে থাকি।

"থামলেন কেন? বলুন না, তার পরে?" প্রাণেশ বোধ করি বিরক্ত হয় আমার আচরণে।

"তার পরে…" আমি হাসতে থাকি।

"হাসছেন কেন?" দাশু জিজ্ঞেস করে।

"হাসছি তোমাদের আচরণে।"

"কেন? আমরা আবার কি করলাম।"

"তোমাদের দেখে মনে হচ্ছে এতক্ষণ সত্যি সত্যি কোন প্রেক্ষাগারের সামনের সারিতে বসে ঐতিহাসিক নাটক দেখছিলে। দৃশ্যটি শেষ হবার আগেই পর্দা পড়ে গেছে। তাই তোমরা বিরক্ত হয়েছ।"

"সত্যি। তবে সে কথা থাক্‌গে। এবারে বলুন তার পরে কি হল?" দাশু তার কথায় ফিরে আসে।

"কিন্তু আমরা যে পায়চারি করতে করতে গরুড় বাস স্ট্যাণ্ড থেকে বহুদূর এসে পড়েছি, তা বোধ হয় খেয়াল কর নি।"

"তাই তো। বাজারের আলো পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না।" প্রাণেশ বিচলিত হয়।

"অসিতদা নিশ্চয়ই খোঁজাখুঁজি শুরু করে দিয়েছেন।" "একটু ঘুরে আসছি বলে এতদূর চলে আসা ঠিক হয় নি।" সুজল সবিশেষ ভীত।

"তা হলে চলুন ফেরা যাক। সেই সঙ্গে বলতে থাকুন তারপরে কি হল?" দাশু ভুলবার নয়।

অতএব আমি আবার শুরু করি, "বৃদ্ধ মহীপাল ললিতসুরের সে পত্রের উত্তর দিতে পারেন নি। একে তো কনৌজ তখন দুর্বল হয়ে পড়েছে। তার ওপরে কুমায়ুনের মত দুর্গমস্থানে সৈন্য পরিচালনা করা অত্যন্ত কষ্টকর। কাজেই বৃদ্ধ মহীপাল নীরবেই ললিতসুরের অবাধ্যতা মেনে নিয়েছিলেন। তবে তিনি আর বেশিদিন বেঁচে ছিলেন না। মনে হয় কার্তিকেয়পুরের স্বাধীনতা ঘোষণা তাঁর মৃত্যুকালকে নিকটতর করেছিল।

"মহীপালের মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্র দ্বিতীয় মহেন্দ্রপাল কনৌজের সিংহাসনে বসেন। তিনি মাত্র তিন বছর রাজত্ব করতে পেরেছেন। দুর্বল রাজা সে তিন বছর নিজের রাজ্য রক্ষা করতেই ব্যস্ত ছিলেন। তাঁর কাছে কার্তিকেয়পুর আক্রমণ করা কল্পনাতীত ছিল।"

"ভারী মজা তো। বিনা যুদ্ধেই ললিতসুর কাত্যুরী রাজ্যকে কনৌজের শাসনমুক্ত করলেন।" দাশু মন্তব্য করে।

"হ্যাঁ, তিনি যেমন শক্তিশালী, তেমনি কুশলী নরপতি ছিলেন। তাঁর রাণীর নাম লয়াদেবী। তিনিও পনেরো বছর রাজত্ব করেছেন। পাণ্ডুকেশ্বরে প্রাপ্ত চারখানি তাম্রলিপির দুখানি ললিতসুরের আমলের। এই দুখানিই কাত্যুরী রাজবংশের প্রাচীনতম লিপি। এ থেকে কাত্যুরী রাজাদের বাহুবল, তাঁদের রাজ্যের আয়তন ও তৎকালীন সমাজব্যবস্থার অনেক কথা জানা যায়।"

"কী রকম?" আমাকে থামতে শুনে সুজল প্রশ্ন করে।

"প্রথম তাম্রলিপিখানি থেকে জানা যায় যে, ললিতসুরের হস্তী অশ্ব ও উষ্ট্রারোহী সেনাবাহিনী ছিল। তাঁর রাজ্যে বনরক্ষক ও গরু-মহিষ অধিকারীগণ ছিল। বণিক শ্রেষ্ঠী ও প্রজাগণ জাতি ও ধর্মনির্বিশেষে তাঁর রাজসভায় যোগদান করতেন। খস, কিরাত, গৌড়, হুন, কলিঙ্গ, মেদ, চণ্ডাল, দ্রাবিড় ও অন্ধ্রদেশীয় প্রজাগণ তার রাজ্যে বাস করতেন। রাজসভায় মাঝে মাঝে নৃত্য-

গীত ও বাদ্যের আসর বসত।

"ললিতস্থর অতিশয় ধার্মিক ও দানশীল ছিলেন। তখন অলকানন্দার উত্তরতীরের দুটি 'বিষয়ের' (পরগণার) নাম ছিল তঙ্গনপুর ও অন্তরঙ্গ। এই দুটি বিষয়ের কিয়দাংশ তিনি বদ্রীনাথের ব্রাহ্মণদের দান করেছিলেন।

"দ্বিতীয় তাম্রলিপিটিতে দুটি স্থানের উল্লেখ পাওয়া যায়—বুদ্ধাচল ও কাকাস্থল। এ্যাটকিন্‌সনের মতে কাকাস্থল ও কেদারখণ্ডে উল্লেখিত কাকাচল বর্তমান দেবপ্রয়াগের পূর্ব নাম। তার মানে দেবপ্রয়াগ থেকে বদ্রীনাথ পর্যন্ত গাড়োয়ালের বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড সেকালে কাত্যুরী রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরবর্তী কালে এই আয়তন আরও বিস্তৃত হয়েছিল। হিমাচলে শতদ্রুর তীরে নিরতের সূর্য-মন্দিরে পাদুকা পরিহিত একটি সূর্যমূর্তি আছে। এ ধরনের মূর্তি কেবল কাত্যুরী আমলেই নির্মিত হয়েছে। কাজেই মনে হয় বর্তমান হিমাচলের কিয়দাংশও কোন সময়ে কাত্যুরী সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল।

"ললিতস্থরের তাম্রলিপিতে একটি বৃষমূর্তি অঙ্কিত আছে। কুষাণরাজ বাসুদেবের মুদ্রায় এই ধরনের বৃষমূর্তি পাওয়া গেছে।"

"বাগেশ্বরের শিলালিপিটি কার আমলের?" প্রাণেশ প্রশ্ন করে।

আমরা গরুড় বাজারে পৌঁছে গেছি। আমাদের বাস দেখা যাচ্ছে। অনেক দেরি হয়ে গেছে। ওরা নিশ্চয়ই আমাদের ওপর খুবই অসন্তুষ্ট হয়েছেন। ওরা মালপত্র পাহারা দিচ্ছেন আর আমরা ঘুরতে বেরিয়েছি। কাজটা ঠিক হয় নি। তবু প্রাণেশের প্রশ্নের উত্তর দিই, "সময়ের বিচারে ললিতস্থরের তাম্রলিপির পরেই সেই শিলালিপি। এটি তাঁর পুত্র ভূদেব কর্তৃক নির্মিত। ভূদেব ৯৬০ খৃষ্টাব্দে রাজা হন। তিনি বিশ বছর রাজত্ব করেছেন। ভূদেবের শিলালিপি থেকে জানা যায় যে তিনি সিংহাসন আরোহণের চতুর্থ বর্ষে অনেক দান করেছেন।

"পাণ্ডুকেশ্বরের তৃতীয় তাম্রলিপিটি কাত্যুরী বংশের ত্রয়োদশ রাজা পদ্মট দেবের। তিনি ১০৩০ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর রাণীর নাম ছিল ঈশাল দেবী। পদ্মট পনেরো বছর রাজত্ব করেছেন। এই তাম্রলিপি থেকে জানা যায় যে মহারাজ পদ্মট দেব অনেক গ্রামদান করেছিলেন। যথারীতি এর মধ্যেও বংশতালিকা দেওয়া আছে। এই তালিকা থেকে আমরা ভূদেবের পরবর্তী কাত্যুরী রাজা-রাণীদের নাম জানতে পারি।"

"যেমন"? দাশু প্রশ্ন করে।

"ভূদেবের পরে ৯৮০ খৃষ্টাব্দে রাজা হন তাঁর পুত্র সলোনাদিত্য দেব। তিনিও বিশ বছর রাজত্ব করেছেন। তাঁর রাণীর নাম ছিল সিংহবলী দেবী। তাঁর পুত্র ইচ্ছট দেব সিংহাসনে বসেন ১০০০ খৃষ্টাব্দে। তিনি পনেরো বছর রাজত্ব করেছেন। তাঁর রাণীর নাম সিন্ধুবলী। ১০১৫ খৃষ্টাব্দে পুত্র দেশট দেব রাজা হন। তাঁর মহিষীর নাম পদমল্ল দেবী।"

"তিনিও তাহলে পনেরো বছর রাজত্ব করেছেন?" দাশু হঠাৎ বলে ওঠে।

"হ্যাঁ, শুধু তাই নয়, তাঁর পুত্র পদ্মট দেব এবং পৌত্র সুভিক্ষরাজ দেবও পনেরো বছর রাজত্ব করেছেন।"

"কারণ কি? আপনি চোদ্দ জন রাজার কথা বললেন, তাদের আটজনই ঠিক পনেরো বছর করে রাজত্ব করেছেন এবং কেউ বিশ বছরের বেশি রাজত্ব করেন নি। পনেরো থেকে বিশ বছর রাজত্ব করার পরে তারা প্রত্যেকে ইহলোক ত্যাগ করেছেন কথাটা অবিশ্বাস্য। কাজেই মনে হয় তাঁরা রাজত্ব-কালের একটা সময়সীমা ঠিক করে নিয়েছিলেন। সময় পূর্ণ হবার পরে স্বেচ্ছায় রাজকার্য থেকে অবসর নিয়েছেন।"

"তুমি ঠিকই বলেছ দাশু" আমি তাকে সমর্থন করি, "স্বেচ্ছায় তাঁরা রাজ্যভার পুত্রদের হাতে দিয়ে ধর্মে মন দিয়েছেন, হয়তো বা বাণপ্রস্থে গমন করেছেন। এ থেকে আমরা সেকালের শাসন ব্যবস্থার একটি সুন্দর চিত্র পাই। রাজকার্যের সঙ্গে কর্মদক্ষতার একটা অচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে। আর এই সম্পর্কটিকে কাত্যুরী রাজারা যেমন অস্বীকার করেন নি, আমাদেরও তেমনি স্বীকার করে নেওয়া উচিত।"

"কিন্তু এটাই কি উচিত হচ্ছে? আমাদের এখানে বসিয়ে রেখে নিজেরা টহল মারতে বেরিয়েছেন!" অসিতবাবুর ক্রুদ্ধ প্রশ্ন কানে আসে। আমরা বাস স্ট্যাণ্ডে এসে গেছি। বাসের সামনে দাঁড়িয়ে আছে মোহিত। দেবকীদা ও অমিতাভকে তো দেখছি না। না, বাসের ভেতরেও নেই। কিন্তু সে কথা জিজ্ঞেস করতে পারার আগেই অসিতবাবু সুজলের দিকে তাকিয়ে আবার বলেন, "ঘুরে বেড়ালেই চলবে, না কাজকর্ম কিছু করতে হবে?"

সুবোধ বালকটির মত সুজল উত্তর দেয়, "কাজ করতে হবে বৈকি, কাজকর্ম না করলে চলবে কেমন করে? বল না, কি করতে হবে?"

"কি করতে হবে? পাহাড়ে আর কখনও আসিস নি, কিছুই জানিস না।

সব কাজ রইল পড়ে আর জিজ্ঞেস করছিস, কি করতে হবে ?"

"কোন্‌টা আগে করব ?" সুজল প্রশ্নের ধরন পালটায়।

আশানুরূপ ফল ফলে। অসিতবাবুর কণ্ঠস্বর শান্ত হয়। বলেন, "আগে খাবারের এক নম্বর কিট্‌টা আর বিছানা দুটো গাড়ির ছাদ থেকে নামা।"

দাশু আর প্রাণেশ সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে ছাদে ওঠে। সুজল ও মোহিত এগিয়ে যায় বাসের ধারে নিচ থেকে মালপত্র ধরার জন্য।

অসিতবাবু বলেন, "একজন দোকানদারের সঙ্গে বন্দোবস্ত করেছি, সে তার দাওয়া ও দোকানঘরের খানিকটা ছেড়ে দিয়েছে আমাদের। দাওয়াতে উনোন আছে, সেখানেই রান্না হবে। দোকানী জ্বালানি ও জল রেখে দিয়েছে।"

কথাটি সুজলের কানে যায়। সে চেঁচিয়ে ওঠে, "হুর্‌রে! এই না হলে লীডার ? আমরা কিনা ওদিকে ভেবে ভেবে সারা, কোথায় থাকব, কি খাবো ? আর তুমি এদিকে সব ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেছো। যাক্‌, নিশ্চিন্তি হওয়া গেল, বাসে বসে আর রাতটা কাটাতে হবে না।"

"আলবাত হবে। তোকে বাসেই থাকতে হবে।"

সুজল শব্দহীন। মোহিত মৃদু হেসে ওপর থেকে দাশুর ঝুলিয়ে দেওয়া কিট্‌টা হাতে ধরে। সুজল নিঃশব্দে প্রাণেশের হাত থেকে বিছানাটা হাতে নেয়। দ্বিতীয় বিছানাটা নামিয়ে দিয়ে দাশু আর প্রাণেশ ছাদ থেকে নেমে আসে। ধরাধরি করে কিট্‌ ও বিছানা নিয়ে আসি দোকানে। মোহিত দাঁড়িয়ে থাকে বাসের কাছে। মালপত্র পাহারা দেয়।

দোকানঘরটা বেশ ভাল। দেখে লোভ হয় সুজলের। সে আস্তে আস্তে বলে, "এখানে তো আমরা সবাই থাকতে পারি অসিতদা।"

"না, পারি না। এটুকু জায়গাতে সবার হবে কেমন করে ? তাছাড়া বাসের মালপত্র পাহারা দিতে হবে না ?"

"কণ্ডাকটার বাসে থাকবে না ?"

"থাকবে।"

"তা হলে আর আমাদের বাসে থাকার কি দরকার ?"

"তা তো বটেই। কণ্ডাকটারের আর কাজ নেই। সে রাত জেগে আমাদের মালপত্র পাহারা দেবে !"

"কে কে তাহলে বাসে থাকবে ?"

"প্রাণেশ দাশু আর তুই।"

"ভালই হবে। বেশ হৈ-হৈ করে রাতটা কাটিয়ে দেওয়া যাবে, কি বলিস দাশু ?" নিরুপায় সুজল মন্দের ভালতে আনন্দিত হয়ে উঠতে চায়।

কিন্তু পারে না। অসিতবাবু দুম্ করে বলে বসেন, "তোদের সঙ্গে আমিও থাকব।"

"তুমি থাকবে ?" সুজল আঁতকে উঠে।

"হ্যাঁ, নইলে তোদের যা ঘুম। সব নিয়ে চলে গেলেও টের পাবি না। চাই কি তোকেও নিয়ে যেতে পারে। তা হলে যে আমাদের একজন মেম্বার কমে যাবে।"

সুজল আর কিছু বলে না। দাশু ও প্রাণেশ নিঃশব্দে কিট্ খুলেছে। আমিও কি বলব বুঝতে পারি না। তবু জিজ্ঞেস করি, দেবকীদা আর অমিতাভ কোথায় ?"

"ওঁরা গেছেন স্বামীজীর কাছে।"

"স্বামীজী !" বুঝতে পারি না।

"স্বামী প্রণবানন্দ।" অসিতবাবু উত্তর দেন।

"তিনি এখানে……"

"হ্যাঁ, দোকানী খবর দিল, আজই গোয়ালদাম থেকে এখানে এসেছেন। কি জরুরী কাজে তাঁকে হঠাৎ আলমোরা চলে যেতে হচ্ছে।"

হিমালয়-প্রেমিক প্রণবানন্দ এই পদযাত্রায় আমাদের প্রধান উপদেষ্টা। তার স্থায়ী নিবাস আলমোরা। তবে এপ্রিল থেকে নভেম্বর পর্যন্ত তিনি সাধারণত হিমালয়ের পথে পথেই থাকেন। আমরা আলমোরাতে শুনে এসেছি, তিনি আমাদের জন্য গোয়ালদামে অপেক্ষা করবেন। কাজেই এখানে তিনি অপ্রত্যাশিত। আমরা ভাগ্যবান, একদিন আগেই তাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

॥ ছয় ॥

ইতিমধ্যে দাশু ও প্রাণেশ প্রয়োজনীয় মালপত্র নামিয়ে ফেলেছে। কণ্ডাকটার চা খেতে গিয়েছিল, সে বাসে ফিরে এসেছে বলে মোহিতও চলে এসেছে এখানে। দাশু উনোন ধরাতে লেগে গেল। সুজল ও প্রাণেশ পয়সা নিয়ে বাজারে চলে যায়। দাশুকে সব বুঝিয়ে দিয়ে আমি আর অসিতবাবু ফিরে আসি বাসে।

দাশু তথা দাশরথি সরকার অসিতবাবুর প্রতিবেশী ও পদযাত্রায় তাঁর প্রধান সহকারী। ধৈর্যশীল কর্মঠ ও বুদ্ধিমান। ছোটখাটো মানুষটি কলকাতায় একটা মার্চেন্ট অফিসে, চাকুরি করে। কিন্তু সেটা নিতান্তই জীবন-ধারণের প্রয়োজনে। অফিসের কাজের পরে সে সব সময়েই কিছু না কিছু একটা করে। তবে এ করাটা অনেকটা 'ঘরের ভাত খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো'র মত। যেমন ইতিপূর্বে এক রহস্য পত্রিকা প্রকাশ করে বেশ কয়েক হাজার টাকা জলে দিয়েছে। তারপরে মাসকয়েক অমানুষিক পরিশ্রম করে উত্তর-পূর্ব ভারতের পার্বত্য জাতি সম্মেলন এবং পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গ সাহিত্য সেমিনার করেছে। মোট কথা একটা কিছু না কিছু ওর লেগেই আছে।

দাশু হিমালয়ে অনেক ঘুরেছে। ১৯৬৪ সালের ট্রেল্‌স গিরিবর্ত্ম অভিযানেও সে অসিতবাবুর প্রধান সহকারী ছিল। দলের সদস্য রণেশ চট্টোপাধ্যায় হঠাৎ কাপকোটে অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁকে নিয়ে অসিতবাবুকে ফিরে যেতে হয় কলকাতায়। দাশু তখন ম্যানেজারের কঠিন দায়িত্ব পালন করেছিল।

মোহিতের পুরো নাম মোহিতলাল দত্ত। তার চেহারাটি দাশুর ঠিক বিপরীত—বলিষ্ঠ দেহ। শুধু স্বাস্থ্যবান নয়, সুপুরুষ। অতিশয় ধীর ও স্থির, শান্ত ও কর্মঠ। নীরব কর্মী। মুখ বুজে কাজ করা ওরা সব চেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য। কখনই কোন অবস্থাতে মোহিত মাথা গরম করে না। কলকাতার একটা বড় কারখানায় কাজ করে। সেও হিমালয়ে অনেক ঘুরেছে। হিমালয়ের পথে পদচারণা করতে হলে যে সব গুণ থাকা দরকার, তার প্রায় সবগুলোই আছে মোহিতের।

সুজল বা সুজলকুমার মুখোপাধ্যায় একজন পর্বতারোহী। সে দার্জিলিং থেকে বেসিক ও এ্যাডভান্স ট্রেনিং নিয়েছে। ১৯৬৫ সালের ত্রীরশূলী (অধিকাংশের মতে ত্রিশুলী) অভিযানের সদস্য ছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারী। সুন্দর চেহারা এবং চটপটে। যথেষ্ট কর্মঠ কিন্তু সুযোগ পেলেই ঘুরে বেড়ায়, আর তাতেই অসিতবাবু ওর ওপর রেগে যান। তবে তাঁকে এক নিমেষে ঠাণ্ডা করার কায়দাটাও সুজলের বেশ ভাল জানা আছে। কাজেই কোন বিপত্তি ঘটে না।

প্রাণেশ চক্রবর্তী আমাদের দলের কনিষ্ঠতম সদস্য ও শ্রেষ্ঠ পর্বতারোহী। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কর্মচারী। সেও দার্জিলিং থেকে বেসিক ও এ্যাডভান্স ট্রেনিং নিয়েছে।প্রাণেশ ১৯৬২ সালের নীলগিরি পর্বত (২১২৬৪´) ও ১৯৬৫

সালের ত্রিশূলী অভিযানে অংশ নিয়েছে। ১৯৬৬ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর সে দুর্গম মানা শৃঙ্গে (২৩৮৬০´) ভারতের জাতীয় পতাকা প্রোথিত করেছে।

কিন্তু যত বড় পর্বতারোহীই হোক আমাদের নেতা অসিত বসুর কাছে ছাড়াছাড়ি নেই। সবাইকে পুরো কাজটি করতে হবে। তিনি আমার সমবয়সী। কিন্তু চেহারা, বিশেষ করে মাথার টাকটি দেখলে, তা বোঝার উপায় নেই। ঘোর সংসারী—তিন পুত্রের জনক। কলকাতার একটি মার্চেন্ট অফিসে চাকরি করেন। কিন্তু এ বয়সেও তাঁর উৎসাহে কিছুমাত্র ভাঁটা পড়ে নি! তিনিও দার্জিলিং থেকে মাউন্টেনিয়ারিং ট্রেনিং নিয়ে এসেছেন। আজ পর্যন্ত তিনি কোন পর্বতাভিযানে অংশ নেন নি কিন্তু বাস ট্রিপ থেকে এই রূপকুণ্ড পর্যন্ত বহু যাত্রার আয়োজন করেছেন। তাঁর মত উৎসাহী সংগঠক ও সুযোগ্য নেতা সচরাচর চোখে পড়ে না।

কথাটা বলতেই রাজী হয়ে যান অসিতবাবু। আমরা বাস থেকে নেমে আসি। পাশের চায়ের দোকানে ঢুকি। দুজনে দু গ্লাস চা নিয়ে দাশুদের জন্য চা পাঠিয়ে দিই। চা খেতে খেতে অসিতবাবু আগামীকালের কর্মসূচী আলোচনা করেন—কাল খুব সকালে আমরা পায়ে হেঁটে বেরিয়ে পড়ব বৈজনাথ দর্শন করতে। দশটার মধ্যে দর্শন শেষ করে আমাদের যেতে হবে বৈজনাথ বাজারে। ড্রাইভারের সঙ্গে ব্যবস্থা হয়েছে, সে আমাদের তুলে নেবে সেখান থেকে। এগারোটার সময় আমরা পৌঁছে যাব গোয়ালদাম।

সেকালে নাম ছিল বৈজনাথ উপত্যকা, তারপরে নাম হয় কাত্যুরী উপত্যকা, এখন গরুড় উপত্যকা। সেকালে গরুড় ছিল বৈজনাথ মহানগরীর উপকণ্ঠ। এখন গরুড় সারা উপত্যকার কেন্দ্রভূমি। বৈজনাথ এখন কেবল ঐতিহাসিকদের গবেষণাক্ষেত্র।

মানসখণ্ডে হর-পার্বতীর বিবাহবাসরকে বলা হয়েছে বৈজনাথ। দ্রোণ কৌশিক সত্যব্রত গর্গ মার্কণ্ডেয় এবং সুতপব্রহ্মা নাকি তপস্যা করেছিলেন এখানে।

গরুড় আলমোরা জেলার একটি বিখ্যাত বাস স্ট্যাণ্ড। এখান থেকে বাস যায় আলমোরা রাণীক্ষেত কাঠগুদাম, গোয়ালদাম বাগেশ্বর, কাপকোট ও নন্দপ্রয়াগ। চারিপাশের উপত্যকা সমূহের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত এই উপত্যকা। এখান থেকে সোমেশ্বর সাড়ে বারো মাইল, বাগেশ্বর বারো মাইল ও নন্দপ্রয়াগের নিকটবর্তী জোলাবাগার সাড়ে বারো মাইল। নাতিশীতোষ্ণ

আবহাওয়া, উচ্চতা মোটে ৩৫৪৫ ফুট। ২৯°. ৫৪.´ ২৪´´ উত্তর ও ৭৯°. ৩৭´ পূর্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত।

এখান থেকে দ্বারাহাটও খুবই কাছে। উপত্যকার দক্ষিণ দিকে অবস্থিত দুনাগিরি (২৩,১৮৪´ ফুট উঁচু দুনাগিরি পর্বত নয়) বা মহাভারতের দ্রোণগিরি নামক ছোট পাহাড়টির পরপারেই দ্বারাহাট।

উপত্যকার বুক চিরে বয়ে যাচ্ছে গোমতী ও তার কয়েকটি শাখানদী। বাগেশ্বর থেকে সরযূ এসে এখানে মিলিত হয়েছে গোমতীর সঙ্গে। উপত্যকাকে করে তুলেছে সুজলা ও সুফলা। জনপদ গড়ে উঠবার প্রভূত উপকরণ রয়েছে এখানে। রাজধানী নির্বাচনের আদর্শ স্থান বৈজনাথ উপত্যকা।

তাই ত্রিভুবনরাজ (৮৯৫ খৃঃ) কার্তিকেয়পুর থেকে রাজধানী নিয়ে আসেন এখানে। সেই থেকে কাত্যুরী রাজত্বের শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ নবম শতাব্দীর শেষ থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর শুরু পর্যন্ত বৈজনাথ কাত্যুরী রাজত্বের রাজধানী ছিল। যদিও স্থায়ীভাবে এখানে রাজধানী আসে একাদশ শতাব্দীতে—সুভিক্ষরাজের আমলে।

সুভিক্ষরাজের পরে বৈজনাথের সিংহাসনে বসেন ইন্দ্রপাল দেব। তাঁর সিংহাসন আরোহণের সাল জানা যায় নি। তবে তাঁর মৃত্যুর পরে, ১০৯৭ খৃষ্টাব্দে পুত্র লক্ষ্মণপাল দেব রাজা হন। তিনি বৈজনাথের বিখ্যাত লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরটি নির্মাণ করান। এই মন্দিরের মূল বিগ্রহটিই গণনাথে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তাঁর আমলের একখানি শিলালিপি পাওয়া গেছে। তাতে বৈজনাথকে বলা হয়েছে বৈজনাথ-কার্তিকেয়পুর। তিনি বহুকাল রাজত্ব করেছেন।

লক্ষ্মণপাল দেবের পরে ১১৫২ খৃষ্টাব্দে রাজা হন উদয়পাল দেব। তাঁর পরে বৈজনাথের সিংহাসনে বসেন বসন্তপাল দেব ও বলীনকুলপাল দেব। তাঁদের সিংহাসন আরোহণের সাল জানা যায় নি।

১২০৮ খৃষ্টাব্দে বিজয়পাল দেব বৈজনাথের রাজা হন। তিনি একটি মন্দির নির্মাণ করান।

পরবর্তী কাত্যুরী রাজাদের ইতিহাস আজও খুব সুস্পষ্ট নয়। তবে তাঁরা সপ্তদশ শতাব্দীর আরম্ভকাল পর্যন্ত বৈজনাথে রাজত্ব করেছেন এবং প্রত্যেকেই মন্দির ও অট্টালিকা নির্মাণ করে বৈজনাথকে মহানগরীতে পরিণত করেন। এই বংশের শেষ রাজা সুখল দেব। তিনি ১৫৯৭ খৃষ্টাব্দে বৈজনাথের সিংহাসনে বসেন।

ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে কাত্যুরী রাজবংশে গৃহবিবাদ শুরু হয়। ফলে কাত্যুরী রাজারা ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়তে থাকেন। আর চন্দ্রবংশীয় (আলমোরা) রাজারা ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে উঠতে থাকেন। স্বাভাবিক-ভাবেই ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে চাঁদরাজারা বার বার বৈজনাথ আক্রমণ করেছেন। কিন্তু তাতে মহানগরীর কোন ক্ষতি হয় নি। এটি কেবল বৈজনাথ বা কুমায়ুনে সত্য নয়, ইতিহাসের চরম সত্য যে, মুসলমান ছাড়া অন্য কোন আক্রমণকারী কখনই সভ্যতা সমাজ ও সংস্কৃতির ওপর আঘাত হানে নি। শিবাজী কোন মসজিদ অপবিত্র করেন নি, রণজিৎ সিং কোন পুরনারীকে হরণ করেন নি, ইংরেজরা তাজমহল ভেঙ্গে ফেলেন নি।

কুমায়ুনেও তাই হয়েছে। চাঁদরাজাদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলেও বৈজনাথ নিস্তার পায় নি রোহিলাদের কাছে। ১৭৪৩-৪৪ খৃষ্টাব্দে রোহিলারা দ্বারাহাট আক্রমণ করে। দ্বারাহাট ধ্বংস করে তারা আসে বৈজনাথ। মন্দিরময় মহানগরী মহাশ্মশানে পরিণত হয়।

"সাবরা কোথা থেকে আসছেন?" আকস্মিক প্রশ্নে চমকে উঠি। আমার চিন্তায় ছেদ পড়ে। দেখি আমাদের পাশেই বসে আছে একজন স্থানীয় যুবক। চা খাচ্ছে। সেই প্রশ্ন করেছে আমাদের।

"কলকাতা থেকে।" অসিতবাবু উত্তর দেন।

"কোথায় যাচ্ছেন?" লোকটি আবার জিজ্ঞেস করে।

"রূপকুণ্ডে।"

সঙ্গে সঙ্গে কপালে হাত ছোঁয়ায় ছেলেটি—রূপকুণ্ডের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানায়। তারপরে পাশে বসে থাকা মেয়েটিকে বলে, "দেখলি, গতবারে তুই আমাকে যাত্রায় যেতে দিলি না, আর এই সাবরা কতদূর থেকে এসেছেন এখানে। যাচ্ছেন রূপকুণ্ডে।"

মেয়েটি চুপচাপ চা খেয়ে চলে। বোধ হয় লজ্জা পেয়েছে।

ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করি, "তোমরা কোথায় যাচ্ছ?"

"আমরা গাঁয়ে ফিরছি।"

"কোথায় তোমাদের গ্রাম?"

"কাছেই। তেলীহাট। সেখানে মন্দির আছে, রাজবাড়ি আছে। কাল সকালে আসবেন দেখতে। সবাই আসে।"

"আচ্ছা আসব।"

"আমি সব দেখিয়ে দেব।"

"খুব ভাল হবে।" আমি খুশি হই। "কিন্তু তোমরা কোথায় গিয়েছিলে?"

একটি ঢোক গেলে ছেলেটি। মেয়েটির মুখের দিকে তাকায় সে। মেয়েটি মুচকি হাসে। মুখখানি ঘুরিয়ে নিয়ে চায়ে চুমুক দেয়। ছেলেটি লজ্জিত কণ্ঠে বলে, "ডাক্তারখানায়।"

এতে এত লজ্জা পাবার কি আছে? আমি ওর আচরণে অবাক হই। বলি, "কার অসুখ?"

ছেলেটি ইশারায় মেয়েটিকে দেখিয়ে দেয়।

মেয়েটির দিকে তাকাই। না, ওকে দেখে তো মোটেই অসুস্থা মনে হচ্ছে না। স্বাস্থ্যবতী সুন্দরী তরুণী। জিজ্ঞেস করি, "কি অসুখ?"

ঢোক গেলে সে। তারপরে কোনমতে বলে, "অসুখ, মানে……ঠিক অসুখ নয়। আমরা পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রে গিয়েছিলাম।"

এবারে আমার লজ্জা পাবার পালা। কাজেই কিছুক্ষণ কোন কথা বলতে পারি না। অসিতবাবুও চুপ করে আছেন। কিন্তু আমাদের অবস্থাটি বিবেচনা করেই বোধ হয় ছেলেটি বলে, "না গিয়ে কি করব বলুন। সাড়ে চার বছর হল বিয়ে হয়েছে আমাদের। এরই মধ্যে দুটি ছেলে-মেয়ে। ছেলের বয়স দু বছর, মেয়ের ছ মাস। আমরা চার ভাই। বাবার যা জমি ছিল তার এক চতুর্থাংশ আমার ভাগে পড়েছে। যা ফসল হয়, তাতে এখনই সংসার চলতে চায় না। আরও ছেলে-পুলে হলে কি বিপদ বলুন তো। আর, ওরাই বা বড় হলে সংসার চালাবে কেমন করে! তাই গিয়েছিলাম পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রে।"

"ভালই করেছিলে।" অসিতবাবু মন্তব্য করেন।

ওরা উঠে দাঁড়ায়। ছেলেটি নমস্কার করে আমাদের। মেয়েটিও হাত জোড় করে বলে, "কাল সকালে আসবেন আমাদের গাঁয়ে। আমরা খুব খুশি হব।"

"আসব বৈকি, নিশ্চয়ই আসব। খোঁজ করব তোমাদের। তোমার নাম?"

"রতনলাল সিং" বলে মেয়েটির সঙ্গে ছেলেটি এগিয়ে চলে গাঁয়ের পথে।

আমরা তাকিয়ে থাকি ওদের দিকে। ধন্যবাদ দিই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে।

নিরক্ষর জনসাধারণকে দেশের জটিলতম সমস্যা সম্পর্কে কেমন সুন্দর সজাগ করে তুলেছেন। তবে আর কয়েক বছর আগের থেকে এই প্রচেষ্টাটা চালালে হয়ত বিশ্ব আজ আর ভারতকে দুর্ভিক্ষের দেশ বলতে পারত না। কিন্তু যা করা হয় নি, তার জন্য আপসোস করে কি লাভ? তার চেয়ে এখন কতটা কার্যকরী করা যায় সেদিকেই দৃষ্টি দেওয়া উচিত হবে। 'বেটার লেট দ্যান নেভার।'

আমরাও বেরিয়ে আসি দোকান থেকে। ইতিমধ্যে দিনের আলো গেছে ফুরিয়ে। আঁধার নেমে এসেছে গরুড়ের পথে ও প্রান্তে। তাহলেও আঁধার ঘনাতে পারে নি এখানে। দোকান দোকানে হ্যারিকেন ও ডে-লাইটের আলো। তারা আঁধারকে তাড়িয়ে দিয়েছে দূরে—বাজারের বাইরে ঐ জন-বসতির ধারে।

দোকানে দোকানে কেনা-বেচা চলেছে। চলেছে পান ও ভোজন। কাজেই শহরের অতি পরিচিত রূপটিকে আমরা পেয়েছি এখানে। কিন্তু রাতের এমন আলোঝলমল রূপদর্শন আজই শেষ। কাল থেকে বেশ কিছুদিন আমাদের আর এমন রাতের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে না। কিন্তু সেজন্য কোন ব্যথা-বোধ করছি না। নাগরিক জীবন-যন্ত্রণার হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া তো আমাদের হিমালয় যাত্রার অন্যতম উদ্দেশ্য। এই পরিবেশ থেকে সাময়িক মুক্তি নিয়ে দৈনন্দিন জীবনের জটিলতার উর্ধ্বে উঠে আমরা সুন্দরকে দর্শন করতে চাই—আমরা শান্তি চাই। তাই তো মানুষের সমাজ থেকে বহুদূরে হিমালয়ের দুর্গম গিরি-কান্তারে আমাদের এই পদযাত্রা।

বাসে উঁকি দিয়ে দেখি কণ্ডাকটার বিড়ি খাচ্ছে। সে আশ্বাস দেয় আমাদের, "মালপত্র সব ঠিক থাকবে। আপনারা অনায়াসে ঘুরে আসতে পারেন।"

আমরা দোকানে আসি। না, ছেলেগুলো খুবই কাজের বলতে হবে। রান্না প্রায় শেষ করে এনেছে। অসিতবাবু বলেই ফেলেন কথাটা, "সে কিরে, এরই মধ্যে তোদের রান্না হয়ে গেল?"

"এরই মধ্যে কি বলছেন, কটা বাজে খেয়াল আছে?"

"কটা?" হাতঘড়ি দেখেন অসিতবাবু। তারপরেই বলে ওঠেন, "সে কি নটা বাজে? দেবকীদারা যে এখনও এলেন না।"

তাই তো আমাদেরও খেয়াল হয়। অচেনা জায়গা। না, চিন্তায় পড়া গেল দেখছি। "একটু এগিয়ে দেখলে কেমন হয়?"

"তাই দেখতে হবে।" অসিতবাবু সমর্থন করেন আমাকে।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সুজল দাশু প্রাণেশ ও মোহিত জিজ্ঞেস করে অসিতবাবুকে, "যেতে হবে নাকি?"

অসিতবাবু মাথা নেড়ে নিষেধ করেন। বলেন, "না। তোরা এখানেই থাক। আমি আর মহারাজ ওদের দেখছি।"

দোকানদারকে জিজ্ঞেস করতেই সে হাত-পা নেড়ে নিজের ভাষায় যথা-সাধ্য বোঝাতে চেষ্টা করে আমাদের। আমরা তাঁর নির্দেশনামা ঠিকমত অনুধাবন করতে পারি না। শুধু বুঝতে পারি, বড় রাস্তা দিয়ে প্রায় মাইল খানেক চলার পরে ডানদিকে একটি পাকা বাড়িতে স্বামীজী আছেন। কোন অসুবিধে হবে না, জিজ্ঞেস করলে সবাই বলে দেবে।

একটি টর্চ নিয়ে আমরা অজানা যাত্রায় বেরিয়ে পড়ি। উচ্চতা যাই হোক, চারিদিকে পর্বতশ্রেণী। কাজেই একটু শীত-শীত করছে। আমরা জোরে জোরে পথ চলতে শুরু করি। পথ প্রায় জনমানবশূন্য। এমন পথে অনেক দিন চলাফেরা করি না। কাজেই একটা উত্তেজনার আমেজে মনটা ভরে উঠতে চাইছে। ভালই লাগছে। অসিতবাবু গুনগুন করে গান গাইছেন—রবীন্দ্রসঙ্গীত। মাঝে মাঝে কাছে ও দূরে শেয়াল ডেকে উঠছে। তখন অসিতবাবুর গান বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ কোথা থেকে একঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া ছুটে এসে আমাদের গায়ের ওপর আছাড় খেয়ে পড়ে। একটা রোমাঞ্চকর আস্বাদে বিহ্বল হয়ে উঠি।

কিন্তু আমাদের এই আঁধারে অভিযান বুঝি বেশিক্ষণ চালানো গেল না। দূরে পথের বাঁকে একটা আলো দেখা যাচ্ছে। এক, দুই, তিন—হ্যাঁ, তিনজন মানুষ এদিকে আসছে। ওরাই হবে। স্বামীজী নিশ্চয়ই কাউকে আলো দিয়ে ওদের পৌঁছে দিতে বলেছেন। তবু আমরা এগিয়ে চলি। আমরা নিকটতর হচ্ছি। ক্রমেই কাছে—আরও কাছে।

না, এ তো দেবকীদা ও অমিতাভ নয়। এরা কারা? একজনের হাতে আলো, আর একজন তৃতীয় ব্যক্তিকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। সে লোকটি টলতে টলতে চলছে। ওরা আমাদের পাশ কাটিয়ে চলে যায়। এবার বুঝতে পারি ব্যাপারটা। ঘরের কথা ভুলে দেশী আড্ডায় বেহুঁশ হয়ে ছিল। আপন-জনেরা তাই তাকে ঘরে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। হিমালয়ের মানুষ মদকে হিমালয়ের মতই ভালবাসে। হিমালয়ের এমন অনেক উপত্যকা আছে

যেখানকার অধিবাসীরা জলের বদলে মদ খায়। এর জন্য যেমন দায়ী প্রাকৃতিক অবস্থা, তেমনি দায়ী এদের সামাজিক ব্যবস্থা। প্রথমটিকে অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু দ্বিতীয়টির সংস্কার প্রয়োজন। কয়েকটি সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান অবশ্য এজন্য বহুদিন থেকেই আন্দোলন শুরু করেছেন। কতটা সফল হয়েছেন বলতে পারব না।

ওরা কাছে থাকতে ওদের অভাব বুঝি নি, কিন্তু চলে যাবার পরে মনটা খারাপ হয়ে গেল। হোক্ গে মাতাল, মানুষ তো। জনহীন পথে মানুষ পেলে কার না আনন্দ হয়? সেজন আপনজন না হলেও কিছু যায় আসে না।

সাড়ে নটা বাজে। এখনও ওদের সঙ্গে দেখা হল না। তা হলে কি ওরা অন্য পথে ফিরে গেছে? কিন্তু দোকানী যে বলেছে আর কোন পথ নেই। তবে এখনও দেখা হচ্ছে না কেন? হয় নি, হবে। আচ্ছা, আমরা কি ব্যস্ত হয়ে পড়েছি?

পথের ধারে কয়েকখানি বাড়ি-ঘর। হ্যাঁ, একখানি বাড়ির সঙ্গে দোকানীর বর্ণনা মিলে যাচ্ছে। ভুল হয় নি। বারান্দায় একটা হ্যারিকেন জ্বলছে। কয়েকজন লোক বসে আছেন। দেবকীদা ও অমিতাভকেও দেখতে পাচ্ছি। স্বামীজী? ঐ তো ওপাশে বসে রয়েছেন। শ্মশ্রুগুম্ফধারী সৌম্যদর্শন সন্ন্যাসী, সর্বত্যাগী সাধক, হিমালয়-প্রেমিক প্রণবানন্দ।

আমরা বারান্দায় উঠে এলাম। প্রণাম করলাম প্রণবানন্দকে—ভারত আত্মার মহান প্রতীককে। তিনি আমাদের বসতে বললেন। আমরা তাঁর কাছে বসলাম।

সন্ন্যাসী বলতে আমরা যাদের বুঝি প্রণবানন্দ ঠিক তাদের মত নন। তিনি শিক্ষা শেষ করে সরকারী চাকুরি নিয়েছিলেন। তারপরে দেশের ডাকে চাকরি ছাড়েন। কিছুদিন পরে হিমালয়ের ডাকে রাজনীতি ছাড়েন। স্বামীজী সেই থেকে হিমালয় পরিক্রমা করে চলেছেন। হিমালয়ের মধ্যেই তিনি তাঁর ঈশ্বরকে খুঁজে পেয়েছেন। সে হিমালয় শুধু ধ্যানের নয়, জ্ঞানের। সত্যাশ্রয়ী সন্ন্যাসী বিগত চল্লিশ বছর ধরে হিমালয়ের দুর্গমতম অঞ্চলসমূহ পরিক্রমা করে গিরিরাজের প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটন করে চলেছেন। তাঁর বৈজ্ঞানিক তথ্যপূর্ণ গ্রন্থরাজি বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারে অমূল্য সম্পদ।

আমাদের পরিচয় পেয়ে খুশি হলেন তিনি। তাঁর সঙ্গে পরিচিত হয়ে ধন্য হলাম আমরা। এ তো কেবল পরিচয় নয়, মহামানব দর্শন। সত্তর বছর বয়স।

কাজেই বৃদ্ধ। কিন্তু এখনও তিনি যা পরিশ্রম করে থাকেন, তা আমাদের পক্ষে কষ্টকর। তাঁর উজ্জ্বল চোখ দুটির দিকে তাকালে আপনা থেকে মাথা নত হয়ে আসে, তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত মুখখানির মধ্যে মধুর মনের প্রকাশ দেখতে পেলাম। কোমল কণ্ঠস্বরে স্নেহের পরশ অনুভব করলাম।

স্বামীজী বললেন—কাল সকালে তিনি বাস স্ট্যাণ্ডে আমাদের সঙ্গে দেখা করবেন। তারপরে আমাদের নিয়ে যাবেন বৈজনাথ। তাঁকে বিশেষ কাজে আলমোরা চলে যেতে হচ্ছে বলে তিনি দুঃখ করলেন। নইলে তিনি আমাদের সঙ্গে রূপকুণ্ডে যেতেন। স্বামীজী জিজ্ঞেস করলেন বীরেন সরকারের কথা। জিজ্ঞেস করলেন তার বইয়ের কথা।

বললাম—বইখানা চলছে। বীরেন ভালই আছে। বিয়ে করেছে।

"তাই নাকি?" হাসতে হাসতে স্বামীজী বলেন, "এবার তা হলে পাহাড়ের নেশাটা একটু কেটেছে।"

"না, বিয়ের পরেই দার্জিলিং থেকে মাউণ্টেনিয়ারিং ট্রেনিং নিয়ে এসেছে। আজকাল তো একস্‌পিডিশানে যাচ্ছে।"

"ভাল। ভারী খুশী হচ্ছি তোমাদের হিমালয়প্রীতি দেখে।"

আমরাও খুশী হলাম আমাদের প্রতি স্বামীজীর প্রগাঢ় ভালবাসা দেখে। ধন্যবাদ দিই বীরেনকে—আজকের পর্বতারোহী বীরেনকে নয়, ১৯৬০ সালের অনভিজ্ঞ হিমালয়-পাগল তরুণকে। প্রণবানন্দের প্রবন্ধ পাঠ করে সে সাব্যস্ত করেছিল, রূপকুণ্ডে যাবে। যেতে হবে বলে একদিন বন্ধু রথীনের সঙ্গে বেরিয়ে পড়েছিল পথে। না ছিল অর্থ, না ছিল প্রস্তুতি, না ছিল অভিজ্ঞতা। ছিল কেবল গভীর আত্মবিশ্বাস আর অদম্য কৌতূহল। তবু তারা গিয়েছিল রহস্যময় রূপকুণ্ডে। শুধু যায় নি, পরে সেই দুর্গম পথের অনবদ্য কাহিনী সে শুনিয়েছে বাংলা দেশের অগণিত পাঠক-পাঠিকাকে। সেই কাহিনী বাঙ্গালীকে রূপকুণ্ডের সঙ্গে পরিচিত করিয়েছে। অসংখ্য বাঙ্গালীকে নিয়ে গেছে সেই মরণ-হ্রদের তীরে, আমাদের নিয়ে চলেছে ঐ অপরূপ রহস্যালোকে।

॥ সাত ॥

অসিতবাবুর বন্দোবস্ত শেষ পর্যন্ত কার্যকরী হয় নি। কাল রাত একটায় আমাদের ডিনার শেষ হয়েছিল। তিনি সিনিয়রদের জন্য ঠিক করেছিলেন দোকানঘর, আর জুনিয়রদের জন্য মোটরবাস। কিন্তু অবশেষে দেখা গেল সিনিয়ররা দোকানের চেয়ে বাসকে বেশি পছন্দ করছে। তাই নেতাকে নতুন ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। আর সেই ব্যবস্থাপনার সময়ে স্বজল নিজের ব্যবস্থাটি পাকা করে নিয়েছিল। প্রাণেশ ও দাশুকে নিয়ে চলে গিয়েছিল দোকানে। আজ সকালে স্বামীজী আসার পরে আমি গিয়ে ওদের ঘুম ভাঙ্গিয়েছি। ওদের দেখে নিজেদের জন্য দুঃখ করেছি। কারণ আমরা বাসে একদম ঘুমোতে পারি নি। বলতে গেলে সারারাত জেগে কাটিয়েছি। আর ওরা কিনা নাক ডাকিয়ে রাত কাবার করেছে। অথচ স্বজল স্বীকার করল না সে কথা। বিস্মিত ভাবে বলল, "ঘুমিয়েছি, কি বলছেন! একদম ঘুমোতে পারি নি, যা ছারপোকা।"

মালপত্র বেঁধে বাসে চাপিয়ে দিলাম। তারপরে চা খেয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম পথে—বৈজনাথের পথে। সকাল আটটা বাজে। আমাদের হাতে মোটে ঘণ্টা দুয়েক সময়। স্বামীজী অবশ্য বললেন—এরই মধ্যে মোটামুটি সব দেখিয়ে দিতে পারবেন।

বৈজনাথ বহুবিস্তৃত উপত্যকা। হিমালয় এখান থেকে বহুদূরে। তবু হিমালয়কে বড়ই সুন্দর দেখাচ্ছে। উত্তরে তুষারাচ্ছাদিত ধবল হিমালয় আর দক্ষিণে বৃক্ষাচ্ছাদিত শ্যামল হিমালয়। উত্তরে ত্রিশুল ও নন্দাঘুন্টি—আমরা যাচ্ছি ওখানে। আর দক্ষিণে কৌশানী—আমরা এসেছি ওখান থেকে। সাদা আর সবুজ দুয়ের মাঝে সোনালী সমতল—বৈজনাথ।

বৈজনাথের অপর নাম বৈদ্যনাথ। এ অঞ্চল আলমোরা জেলার দানপুর পরগণার অন্তর্ভুক্ত। পুরাকালে নাকি দানবরা বাস করতেন এখানে। তাই এ পরগণার নাম দানপুর। কয়েকজন দানবের নামে এখনও কয়েকটি গ্রাম আছে এ পরগণায়।

আগেই বলেছি বর্তমানে বৈজনাথ উপত্যকার কেন্দ্রভূমি গরুড়। বাস স্ট্যাণ্ড থেকে স্কুল পর্যন্ত সবই গরুড়ে। কিন্তু ডাকবাংলোটি বৈজনাথে। কর্তৃপক্ষ

ডাকবাংলো নির্মাণের সময় অবস্থানটিকে বিশেষ মূল্য দিয়ে থাকেন। বৈজনাথ বাংলোর অবস্থান বড়ই সুন্দর। তবে মৎস্যাশী মানুষদের সে ডাকবাংলোয় বাস করায় কিছু অসুবিধে আছে। কারণ বৈজনাথে মাছ-ধরা নিষেধ। যদিও ওপরে কিংবা নিচে গিয়ে মাছ ধরায় বাধা নেই কোন। মাছ না পেলেও প্রাণ-ভরে লাউ খেতে পারবেন পর্যটকরা। বৈজনাথে খুব লাউ হয়।

এখন কেবল গোমতী তীরের, সেখানে মূল মন্দির ও মিউজিয়াম, কিয়দাংশকেই সরকারী ভাবে বৈজনাথ বলা হয়ে থাকে। আর সমস্ত উপত্যকাটিকেই বলা হয় গরুড। গরুড় বাজার থেকে বর্তমান বৈজনাথ প্রায় দু মাইল। বৈজনাথেও একটি ছোট বাজার আছে। সেখানে বাস থামে।

সেকালে গোমতীর দু তীরেই শহর ছিল। এখন এক তীরে গরুড় আর এক তীরে সোনালী ক্ষেত। মাঝে মাঝে ভগ্ন মন্দির ও গ্রাম। এরই একটি গ্রামের নাম তেলীহাট। সম্ভবতঃ এই তেলীহাট গ্রামেই কাত্যুরী রাজাদের প্রাসাদ ছিল। রাজাদের চৌপড় খেলার মাঠ আর রাণীদের মন্দিরও সেখানে ছিল। খেলার মাঠকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না, কিন্তু কয়েকটি মন্দিরের ভগ্নাবশেষ অবশিষ্ট আছে। আমরা সেই ভগ্নমন্দির দর্শন করতেই পথে বেরিয়েছি।

দূরে একটি ছোট পাহাড় দেখে দেবকীদা স্বামীজীকে জিজ্ঞেস করেন, "ওটা কি?"

"রণচুলকোট দুর্গ।" স্বামীজী বলেন, "সেকালে ওখানেই কাত্যুরী রাজাদের সেনানিবাস ছিল। ঐ দুর্গের ভেতরে একটি কালী মন্দির আছে। স্থানীয়দের কাছে সেটি পরমপবিত্র পীঠস্থান। তারা নিয়মিত পুজো দেয় ঐ মন্দিরে। অনেকের ধারণা ঐ দুর্গের অভ্যন্তরে মাটির নিচে কাত্যুরী রাজাদের বহু কীর্তি আছে লুকিয়ে। খনন করলে নীরব ইতিহাসের অনেক মূল্যবান অধ্যায় আবিষ্কৃত হতে পারে।"

একবার ভাবি স্বামীজীকে জিজ্ঞেস করি—কেন খনন করা হয় নি! তারপরেই মনে হয়—কি হবে জিজ্ঞেস করে? হয় ঐতিহাসিকদের, না হয় কর্তৃপক্ষের অবহেলা। আসল কারণ আমাদের দেশে এখনও এ্যাটকিন্‌সন্ জন্মগ্রহণ করেন নি। এখনও আমরা অন্যান্য স্বাধীন দেশের মত স্বদেশের ইতিহাসকে শ্রদ্ধা করতে শিখি নি। তাই কাত্যুরী রাজত্বের ইতিহাস এখনও নীরব। কুমায়ুন আজও কথা কইতে পারছে না।

গরুড় বাজার ছাড়িয়ে এগিয়ে চললাম। লোকালয় শেষ হয়ে গেল। পথটি বাঁয়ে বাঁক নিল। গোমতী দেখা গেল। ছোট একটি টিলার গা ঘেঁষে ঘুরে গেছে আমাদের পথ। গরুড় গঙ্গার ছোট পুল পেরিয়ে টিটি-টপ্পর গ্রামের মধ্য দিয়ে চলেছি বৈজনাথের দিকে। গোমতী ক্রমেই কাছে আসছে। সেও বাঁক নিয়েছে। বাঁকের মুখে মন্দির ও মিউজিয়াম। আমরা পুল পেরিয়ে রাস্তা থেকে নেমে এলাম নিচে। গোমতীর তীর দিয়ে চললাম এগিয়ে। বাঁকের মুখে গোমতী প্রশস্ততরা। তবু সে শীর্ণকায়া। কিন্তু খরস্রোতা নয়। গোমতী পাহাড়ী নদী, কিন্তু গোমতী শান্ত। পাহাড়ী নদী সাধারণতঃ এমন শান্ত হয় না। গোমতী শান্ত। কারণ গিরি-কান্তারের অন্তরে অবস্থিত হলেও বৈজনাথ সমতল।

অনেকে বলেন বকবেশী ধর্মরাজ এখানেই যুধিষ্ঠিরকে পরীক্ষা করেছিলেন। তখন কিন্তু এখানে কোন উপত্যকা ছিল না। ছিল সুবিশাল সরোবর। সরোবর শুকিয়ে সমতল হয়েছে কী ?

আমরা মন্দির দর্শনে বেরিয়েছি। কাজেই সমতল নয়, মন্দিরের কথায় ফিরে আসা যাক। বৈজনাথের ভগ্ন মন্দিরসমূহ আদিবদ্রী ও জোশীমঠের মন্দিরসমূহের সমসাময়িক। অর্থাৎ এখানকার অধিকাংশ মন্দিরই গুপ্তযুগের শেষ ভাগে (ত্রয়োদশ শতাব্দী) নির্মিত। তবে তার আগের যুগেরও কয়েকটি মন্দির এখানে আছে। সেগুলো সম্ভবতঃ প্রতিহার যুগে (নবম শতাব্দী) নির্মিত। যে যুগেই নির্মিত হোক, ১৩০২ খৃষ্টাব্দে এখানকার মূল মন্দিরটি অক্ষত ছিল। কারণ ঐ বছর গঙ্গোলীর রাজা হামিরদেব মূল মন্দিরশীর্ষে একটি স্বর্ণ কলস প্রতিষ্ঠা করেন।

অনেকে অনুমান করেন যে তিব্বতী শাসনকালে স্বাভাবিকভাবেই বৈজনাথ উপত্যকা বৌদ্ধ প্রভাবিত হয়েছিল। কাত্যুরী আমলে এখানকার জনসাধারণ সে প্রভাবমুক্ত হন। কারণ কাত্যুরী রাজারা শঙ্করাচার্যের ভক্ত ছিলেন। তাঁরা বৌদ্ধদের হিন্দুধর্মে ফিরিয়ে আনেন। তাই এখানকার মন্দিরস্থাপত্যে দক্ষিণ ভারতের প্রভাব সুস্পষ্ট।

চারিদিক দেখতে দেখতে দল বেঁধে এগিয়ে চলেছি আমরা। স্বামীজী বলছেন বৈজনাথের কথা—এখানকার সব মন্দিরই ভগ্ন। তবু তারা ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ সাক্ষী। ভগ্নপ্রায় মন্দিরসমূহের মধ্যে বৈজনাথ মন্দির, কেদারনাথ মন্দির ও বামনী দেবল বিশেষ বিখ্যাত। অনেকে বলেন, বৈজনাথ মন্দির কোন কাত্যুরী

রাণী এবং বামনী দেবল জনৈক বিধবা ব্রাহ্মণী নির্মাণ করেছেন। বামনী দেবল শিব মন্দির। তবে আরও কয়েকটি দর্শনীয় মন্দির ও মূর্তি আছে এখানে। স্থাপত্যশিল্পের বিচারে বৈজনাথ মন্দিরের বাইরে পড়ে থাকা পূর্ণাকৃতি পার্বতীর মূর্তিটি সর্বশ্রেষ্ঠা।

তেলীহাটেও সমসাময়িক যুগের কয়েকটি দর্শনীয় মন্দির ও মূর্তি আছে—লক্ষ্মীনারায়ণ ও সত্যনারায়ণের মন্দির এবং রাক্ষস দেবল। সত্যনারায়ণের মূর্তিটি বড়ই সুন্দর। রণচুল-কোট তেলীহাট থেকে প্রায় দেড় মাইল। সেখান থেকে আধমাইল দূরে নাগনাথ মন্দির।

দেবকীদার প্রশ্নের উত্তরে স্বামীজী বললেন,—কাত্যুরী উপত্যকা আলমোরা জেলার দ্বিতীয় রমণীয় উপত্যকা। এই উপত্যকা হিমালয় পথিকদের কাশ্মীরের লোলাব উপত্যকার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বাগেশ্বরের মত এখানেও খুব ভাল ধান হয়।

ছোট বড গুটি বারো মন্দির। সবই পাথরের। সবই ভগ্ন। তবে ছটি মন্দিরের অবস্থা একটু ভাল। গড়ন উড়িষ্যার রেখ-দেউলের মত। মূল মন্দিরের উপরিভাগ আক্রমণকারীরা ধ্বংস করে ফেলেছিল। এখন টিনের চাল করে দেওয়া হয়েছে। সেই বিখ্যাত পূর্ণাবয়বা পার্বতীর মূর্তিটি মূল মন্দিরের বাইরে পড়ে আছে—বৃষ্টিতে ভিজছে, রোদে শুকোচ্ছে। কেন একে ভেতরে নিয়ে যাওয়া হয় নি, জানি না। তবে বৈজনাথ মন্দিরের দরজা যদি পার্বতীর কাছে রুদ্ধ হয়ে থাকে, তাহলে পার্বতীকে তো অন্তত মিউজিয়ামেও একটু জায়গা দেওয়া যেতে পারে।

মন্দির মোটেই সুসংরক্ষিত নয়। এখানে ওখানে কাটা গাছ ও ঝোপঝাড জন্মেছে। আমরা তারই পাশ দিয়ে এসে মন্দিরে প্রবেশ করি। কাত্যুরী আমলে শৈব মতাবলম্বী লকুলীশ সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ মূল মন্দিরের পৌরহিত্য করতেন। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে নেপালীরা কুমায়ুন অধিকার করে হরিদ্বার থেকে শঙ্কর গিরিকে ডেকে এনে এখানকার প্রধান পুরোহিত পদে অধিষ্ঠিত করেন। বর্তমান প্রধান পুরোহিত শ্যাম গিরি এখানকার পঞ্চম মোহান্ত।

আমরা মন্দিরে এসে ঘণ্টা বাজাই, বিগ্রহকে প্রণাম করি, ছবি নিই। মোহান্তর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তিনি আমাদের প্রসাদ দেন। তারপরে আমরা ছোট মন্দিরসমূহ দর্শন করে চলে আসি মিউজিয়ামে।

২৯টি মূর্তি ও কয়েকটি শিলা সংরক্ষিত আছে। ছোট বড় নানা ধরনের পাথরের মূর্তি। অধিকাংশই পাদুকা পরিহিত সূর্য মূর্তি। এটি কাত্যুরী যুগের একটি বিশিষ্ট নিদর্শন। তবে সূর্য মূর্তি ছাড়াও অন্যান্য বহু দেব-দেবীর মূর্তি রয়েছে। তাঁদের মধ্যে গণেশ, কুবের, কার্তিক, কাকভূষণ্ডী, মহিষমর্দিনী, ভগবতী, হর-গৌরী, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, চামুণ্ডা, গরুড়, ইন্দ্রাণী ও হরিহর মূর্তিসমূহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এর কিছু মূর্তি প্রণবানন্দের ব্যক্তিগত সংগ্রহ। তিনি সেগুলির বৈশিষ্ট্য বুঝিয়ে দেন আমাদের। তারপরে আমরা চলি তেলীহাটের দিকে।

তেলীহাটের মন্দিরের গড়নও একই রকম। তবে বড় মন্দির দুটি আকৃতিতে বৃহত্তর। মূর্তিগুলি খুবই সুন্দর। কিন্তু বড়ই অনাদৃত। ভাঙ্গা মন্দির আরও ভেঙ্গে যাচ্ছে। মূর্তিগুলি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে। এভাবে চলতে থাকলে আর কিছুদিনের মধ্যেই আমরা কাত্যুরী যুগকে হারিয়ে ফেলতে পারব। যদিও এটি কেবল বৈজনাথের বৈশিষ্ট্য নয়। এমন দৃশ্য দেখা যাবে ভারতের যে কোন প্রাচীন নগরে। এখানকার বহু গৃহের দেওয়ালে, এমনকি ১৯২৪ সালে নির্মিত গোমতীর পুলে, দেখলাম সেকালের কারুকার্যময় পাথর ব্যবহার করা হয়েছে। গৃহস্বামী ও কর্তৃপক্ষদের জানা নেই যে ঐ পাথরখানি কেবল পাথর নয়, সে বিস্মৃত ইতিহাসের একটি অধ্যায়, সে অতীত স্থাপত্যের সাক্ষী, সে ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির ধারক।

সাক্ষাৎ হল রতনলাল ও তার স্ত্রীর সঙ্গে। তারা আমাদের নিয়ে যেতে চাইল বাড়িতে। সময় নেই বলে অনেক কষ্টে তাদের হাত থেকে ছাড়া পেলাম। বড় ভাল লাগল তাদের। ভালবাসা ঐশ্বর্যের অপেক্ষা রাখে না। ভদ্রতা শিক্ষার মুখাপেক্ষী নয়।

ঠিক দশটার সময় আমরা বৈজনাথ বাজারে এলাম। একে বাজার বলতে অনেকেরই আপত্তি হবে। গুটিকয়েক ছোট ছোট দোকানের সমষ্টি। দেখে দুঃখ হয়। কালের করাল গ্রাসে সেদিনকার মহানগরী আজ গণ্ডগ্রামে রূপান্তরিত। অথচ বৈজনাথের প্রকৃতি আজও তেমনি উদার। আজও সে দুহাতে ঐশ্বর্য বিতরণ করছে এই উপত্যকাকে। কেবল মানুষ ভুলে গেছে বৈজনাথকে। আর তাই সে আজ অবহেলিত। তাই তার এমন দুরবস্থা। তাই সে এত দরিদ্র। তবে এই বিস্মৃতি যুগের ধর্ম। সে যুগ যুগে যুগে মানব সভ্যতাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে।

কিন্তু সভ্যতা ও সংস্কৃতির কথা ভাবার আর অবসর নেই। আমাদের বাস এসে গেছে গরুড় থেকে। বাস আসতেই আমাদের নজর পড়ে প্রাণেশের দিকে। মানাশৃঙ্গ বিজয়ী প্রাণেশ। আমাদের দলের কনিষ্ঠতম সদস্য। আমরা এগিয়ে এসে একে একে ওর সঙ্গে আলিঙ্গন করি। একসঙ্গে এসেছিলাম কুমায়ুন পরিক্রমায়, কিন্তু আজ ওর কাছ থেকে আমাদের বিদায় নিতে হচ্ছে। মেজরের অনুরোধ রক্ষা করতে গিয়ে প্রাণেশ রূপকুণ্ড যেতে পারছে না। সে আজ এখানেই থাকবে। কাল মেজর আসবেন রানীক্ষেত থেকে। প্রাণেশ তাঁকে নিয়ে মুনসিয়ারী যাবে। ফিরে এসে ওরা আমাদের জন্য অপেক্ষা করবে কাপকোটে। আমরা রূপকুণ্ড থেকে ফিরে কাপকোট যাব। দেখা হবে ওদের সঙ্গে। সবাই একসঙ্গে পিণ্ডারী হিমবাহ দর্শন করব।

প্রাণেশের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা স্বামীজীকে প্রণাম করি। তিনি আমাদের অভয় দেন—কোন চিন্তা করো না। বহাল তবিয়তে ঘুরে আসবে রূপকুণ্ড থেকে। নন্দাদেবী তোমাদের সহায় থাকবেন। কোন অসুবিধে হবে না। আমি আজ সকালের বাসে চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছি শাদী-লালকে। বীর সিং ও রামচাঁদ এতক্ষণে খবর পেয়ে গেছে। তারা বাস স্ট্যাণ্ডে তোমাদের সঙ্গে দেখা করে যাত্রার সব ব্যবস্থা করে নেবে।

নতমস্তকে তাঁর আশীর্বাদ গ্রহণ করে সকৃতজ্ঞ অন্তরে একে একে উঠে আসি বাসে। প্রাণেশ সজল চোখে হাত নাড়ে। স্বামীজীও হাত উঁচু করে আবার আশীর্বাদ করেন। তাঁর আশীর্বাদই আমাদের দুর্গম যাত্রাপথের প্রধান পাথেয়।

ড্রাইভার বাস ছাড়ে। আমাদের বাস এগিয়ে চলে। পেছনে পড়ে থাকে বিগতকালের এক মহানগরী আর একালের এক মহামানব। উভয়েই হিমালয় পথিকদের পরম বিস্ময়।

কাল কৌশানীর পরে আর চড়াই চোখে পড়ে নি, আজ আবার উৎরাই চোখে পড়ছে না। চড়াই আর চড়াই, ক্রমাগত চড়াই। আমরা উপরে উঠছি। প্রথম দিকে মাইল খানেক পথ অবশ্য মোটামুটি সমতল ছিল। আমরা উপত্যকার মধ্য দিয়ে দুটি রাস্তার সংযোগস্থলে পৌঁছেছি। আবার এসেছি নদীর ধারে। একটি পথ চলে গেছে পুল পেরিয়ে ওপারে। আর একটি নদীর এপার দিয়ে। একটি আমাদের বর্তমান পথ আর একটি ভবিষ্যতের। একটি গোয়ালদাম আর একটি বাগেশ্বরের। আমরা রূপকুণ্ড থেকে ফিরে বাগেশ্বর যাব। বাগেশ্বর থেকে কাপকোট। দেখা হবে প্রাণেশের সঙ্গে।

কিন্তু ভবিষ্যতের কথা এখন থাক। এখন বর্তমানের কথায় আসা যাক। সেই মোড় পেরোবার পর থেকেই শুরু হয়েছে চড়াই। আমরা চড়াই ভেঙ্গে ওপরে উঠছি। বলমলি ও ভগবতী কোট গ্রাম ছাড়িয়ে এলাম থান ডাঙ্গোলী (৪০৩৮´) গ্রামে। গ্রামটি সুন্দর। একটি ডাকবাংলো আছে। শুরু হল খাড়া চড়াই। একে একে পেরিয়ে এলাম পাজেনা, গোয়ার, উচক্ষেত, পারেনা, বন্‌জ্‌পানি, মঙ্গলতা, জাবরী, পারকোটি, কিমোলী, পাথরখানি ও জোলচৌড়া গ্রাম। পৌছলাম ৬৩৪৪ ফুট উঁচু বিনায়ক গিরিবর্ত্মে। দেখতে পেলাম গোয়ালদাম—দুর্গম গিরি-কান্তারের প্রবেশ তোরণ।

॥ ৮ ॥

ঘণ্টা খানেক পরে। একটি ছোট পাহাড়কে প্রায় প্রদক্ষিণ করে বাস এসে থামল। এই গোয়ালদাম।

গোয়ালদাম উপত্যকা নয়, পাহাড়ের পাদদেশ নয়, উপরিভাগ। চারদিকে পথ মাঝখানে পর্বতশীর্ষ। ধবল নয়, শ্যামল হিমালয়। পথের পাশে অজস্র বনফুল আর ফার্ন। পথের ধারে পাহাড়ের গায়ে কয়েকটি দোকান, কিছু বাড়ি আর বাস স্ট্যাণ্ড। বাসপথ থেকে মোটর পথ উঠে গেছে শীর্ষে। সেখানে নির্মাণ বিভাগের চমৎকার ডাকবাংলো—দূর থেকে দেখেছি। এবারে কাছে যাব। আমরা সেখানেই উঠব। এখানে বন বিভাগের বিশ্রাম ভবনও রয়েছে।

গোয়ালদাম কাঠগুদাম থেকে ১৪০ মাইল, আলমোরা থেকে ৫৮ মাইল। গোয়ালদাম কেবল রূপকুণ্ড যাত্রীদের বাসপথের প্রান্তসীমা নয়, একটি সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর শৈলাবাস। বহু স্বাস্থ্যান্বেষী ও হিমালয়-প্রেমিক এখানে এসে কয়েকদিন কাটিয়ে যান—মধুচন্দ্রিমা যাপনের আদর্শ স্থান গোয়ালদাম।

গোয়ালদাম এসেছি রূপকুণ্ডে যাব বলে। রূপকুণ্ড কুমায়ুনে। কাজেই কুমায়ুনের কাহিনীতে রূপকুণ্ডের কথা বলছি। কিন্তু গোয়ালদাম কুমায়ুনে নয়, গাড়োয়ালে। গোয়ালদাম থেকেই গাড়োয়াল শুরু। ভ্রমণে, বিশেষ করে হিমালয় ভ্রমণে, শাসনতান্ত্রিক বিভাগের চাইতে ভৌগোলিক বিভাগটার মূল্য অনেক বেশি। এই ভৌগোলিক বিভাগ যেমন অধিবাসীদের চরিত্র গঠন করে, তেমনি

তাদের সমাজ ও সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করে। গোয়ালদামের সঙ্গে তাই কুমায়ুন ও কুমায়ুনীদের সম্পর্ক অতি নিকট। গোয়ালদাম গাড়োয়ালে হলেও কুমায়ুন দিয়েই তার যাতায়াতের প্রধান পথ। সেই পথেই আমরা এসেছি এখানে। তবে নন্দপ্রয়াগ থেকে ঘাট ও থরালী হয়ে একটি পথ এসেছে এখানে। খুব কঠিন পথ নয়, দিন দুয়েক সময় লাগে। গোয়ালদামের আর একটি পথ হিমালয় অভিযাত্রীদের জন্য। রূপকুণ্ডের পথে ওয়ান পর্যন্ত নিয়ে রামণী ও কুয়ারি গিরিবর্ত্ম (১২,১৪০´) হয়ে জোশীমঠ। অপূর্ব সুন্দর এই পথ। বিরহী গঙ্গার উৎস রমণীয় গোণাতাল দর্শন করে যাওয়া যায় জোশীমঠ। কুয়ারি গিরিবর্ত্মের ওপর থেকে নন্দাঘুন্টির দৃশ্য অবর্ণনীয়।

গোয়ালদাম বাসপথের প্রান্তসীমা। কাজেই বাস স্ট্যাণ্ডটি বেশ জমজমাট। এখানেই বাজার, এখানেই হোটেল, এখানেই শহর। বাস স্ট্যাণ্ডই গোয়ালদামের হৃদপিণ্ড।

আমরা বাস থেকে নামতেই একজন যুবক এসে আমাদের সেলাম জানায়। আমরা প্রতি-নমস্কার করি। লোকটি জিজ্ঞেস করে, "আপনারা কলকাতা থেকে আসছেন?"

"হ্যাঁ।" অসিতবাবু এগিয়ে যান তার দিকে।

"আপনারা রূপকুণ্ডে যাবেন?"

"হ্যাঁ। তুমি?"

"বীর সিং।" সে উত্তর দেয়।

আমরা ওর দিকে তাকাই। বয়স বছর পঁয়ত্রিশ। আমাদেরই মতো লম্বা। ফর্সা—সুন্দর চেহারা। ধীর স্থির ও বেশ বুদ্ধিমান বলে মনে হল। পরনে দেশী পোশাক—সরু পায়জামা ও গলাবন্ধ কোট। পায়ে হাণ্টার সু। মাথায় পাহাড়ী টুপি। গাড়োয়াল হিমালয়ের বহু দুর্গম পথ তার নখদর্পণে। গঙ্গোত্রী ও চতুরঙ্গী হিমবাহ এবং কালিন্দী খাল (১৯,৫১০´) হয়ে গোমুখী থেকে বদ্রীনাথ পথের সে একজন অভিজ্ঞ পথপ্রদর্শক। তবে রূপকুণ্ডের পথও তার একেবারে অপরিচিত নয়। সে ইতিপূর্বে বারকয়েক গেছে এ-পথে। কিন্তু পথপ্রদর্শক হিসেবে আমরা তাকে সঙ্গে নিচ্ছি না। সে আমাদের সঙ্গে যাবে সাহায্যকারী হিসেবে। এ যাত্রায় পথপ্রদর্শক হিসেবে আমাদের সঙ্গে যাচ্ছে রামচাঁদ। রামচাঁদ এ পথের অভিজ্ঞতম পথপ্রদর্শক। প্রণবানন্দের বিশেষ পরিচিত। কিন্তু তারও যে কথা ছিল বাস স্ট্যাণ্ডে আমাদের সঙ্গে দেখা করবে।

তাকে তো দেখছি না। কথাটা জিজ্ঞেস করি বীর সিংকে। সে বলে, "রামচাঁদ এখানে নেই। তবে আজ সকালে স্বামীজীর চিঠি পাবার পর শাদীলালজী লোক পাঠিয়ে দিয়েছেন তার কাছে। সে এসে যাবে, আর যদি না আসতে পারে, আমি নিয়ে যাব আপনাদের।"

রামচাঁদকে আমরা জিনিসপত্র কিনে রাখতে বলেছিলাম, তারই কুলি ঠিক করার কথা ছিল। কুলি সংগ্রহ হিমালয় পথের সব চেয়ে কঠিন সমস্যা। চিন্তিত না হয়ে পারি না। তবে সে চিন্তায় সমস্যার সমাধান হবে না। কাজেই কি ভাবে সমাধান হতে পারে তাই ভাবা যাক। বীর সিংকে বলি, "কুলির কি ব্যবস্থা করবে?"

"কুলি নয়, ঘোড়াওয়ালার সঙ্গে কথাবার্তা বলে রেখেছি। আপনারা এসে গেছেন। এবারে তাকে খবর দিতে হবে।"

"হ্যাঁ, কাল সকালেই যাতে রওনা হওয়া যায়, সেইভাবে বন্দোবস্ত কর।"

"তাই হবে। আপনারা এবারে ডাকবাংলোর দিকে এগোন। মালপত্র দেখিয়ে দিন আমাকে। আমি নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করছি।"

অসিতবাবু সব বুঝিয়ে দেন ওকে। আমরা চড়াই পথ ধরে ওপরে উঠতে থাকি। পাহাড় কেটে মোটরপথ নিয়ে যাওয়া হয়েছে ওপরে। নিজেদের গাড়িতে এলে একেবারে ডাকবাংলো পর্যন্ত পৌছনো যায়।

গোয়ালদাম থেকেই 'ইনার লাইন' শুরু। তবে এই সীমারেখা কুমায়ুনের জন্য নয়—গাড়োয়ালের জন্য। কুয়ারি গিরিবর্ত্মের দিকে যেতে হলে 'ইনার লাইন' পারমিট নিতে হয়। কিন্তু রূপকুণ্ডের জন্য পারমিটের প্রয়োজন নেই। বাস স্ট্যাণ্ডেই বিরাট বিজ্ঞাপন রয়েছে—

Notice

1) Travellers are informed that entry into Joshimath Tahsil of District Chamoli, except for the motor road and bridle road to Sri Badrinath is prohibited from 1. 6. 62. Persons, except Government officers on duty and their families and person ordinarily residing in that area, shall have to obtain a permit from first class Magistrate

posted in Chamoli District if they desire to visit any place in Joshimath Tahsil other than the exempted area.

2) All persons who are not Indian nationals are informed that they are not permitted to enter into any part of Chamoli District without obtaining a special permit from the District Magistrate Chamoli. Application for such permit must be made to the District Magistrate Chamoli at least ten days before it is proposed to undertake the journey. Persons contravening the above shall be liable to prosecution.

By order
District Magistrate
Chamoli

চড়াই শেষে সমতলভূমি। শিখরটিকে সমতল করে ফেলা হয়েছে। এখন সেখানে সবুজ আঙ্গিণা, রঙ্গীন কানন আর মনোরম বিশ্রাম নিকেতন। চারখানি বড় বড় ঘর আর দুটি বাথরুম। সামনে ও পেছনে প্রশস্ত বারান্দা। একটু দূরে রান্নাঘর ও চৌকিদারের বাসগৃহ। ডাকবাংলোর পেছনে দেওদার বন ও বনবিভাগের রজন গুদাম। রজন গোয়ালদামের প্রধান রপ্তানি।

বেশ বড় ডাকবাংলো। চমৎকার পরিবেশ আর অপূর্বসুন্দর অবস্থান। চারিদিক খোলা। বহুদূর পর্যন্ত দেখা যায়। দেখা যায় নন্দকান্ত নন্দাঘুন্টি, ত্রিভুবণরক্ষী ত্রিশুল আর আনন্দময়ী নন্দাদেবীকে। বাঁয়ে নন্দাঘুন্টি, ডাইনে নন্দাদেবী। দুয়ের মাঝে ত্রিশুল। ত্রিশুল থেকে শুরু হয়েছে ভারতীয় পর্বতাভিযান। বাংলার পর্বতাভিযান আরম্ভ হয়েছে নন্দাঘুন্টি থেকে। আর নন্দাদেবী, গাড়োয়াল কুমায়ুনের পরমারাধ্যা। নন্দাদেবী ভারতের উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গ।

চোখ ফেরাতে পারি না। বার বার ওদের দেখি। রাণীক্ষেত থেকে ওদের দেখেছি। দেখেছি বিনসর ও কৌশানী থেকে। কিন্তু এ দেখার সঙ্গে সে দেখার তুলনা হয় না। এ তো শুধু দেখা নয়, পরমপ্রিয়কে পাওয়া। মনে হচ্ছে আমরা ওদের পেয়ে গেছি নাগালের মধ্যে। বিশেষ করে ত্রিশুল। আমরা যেন বসে আছি তার পায়ের কাছে। অথচ জানি সে এখনও দূরে,

বহুদূরে। ওর পদপ্রান্তে পৌছে প্রণতি জানাবার জন্যই তো আমাদের এই পদযাত্রা, যে যাত্রা আরম্ভ হয় নি এখনও।

মোহিত আমার কাছ থেকে দূরবীনটা নিয়ে কি যেন দেখছে। বোধ হয় দেখতে চাইছে সেই রহস্যময় হ্রদকে—আমাদের গন্তব্যস্থলকে। দেখুক্ গে। আমি কেবল তাকিয়ে থাকি ত্রিশুলের দিকে। সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের আয়ুধ ত্রিশুল—তিনটি শিখরের পর্বতমালা। কে যেন একখানি জলন্ত রুপোর পাত দিয়ে মুড়ে দিয়েছে তাকে। উজ্জ্বল সূর্যালোকে সে প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ইচ্ছে হচ্ছে এখুনি ছুটে যাই কাছে। দুহাতে জড়িয়ে ধরি ওকে। যুগযুগান্ত ধরে এমনি করেই সে আকর্ষণ করেছে মর্ত্যের মানুষকে। আত্মবিস্মৃত মানুষ ছুটে গেছে কাছে। কেউ ফিরে এসেছে ঘরে, কেউ আসে নি। যারা আসতে পারে নি, তাদেরই কয়েকজনের মরদেহ রূপকুণ্ডকে মরণহ্রদে করেছে রূপান্তরিত। কিন্তু মরণজয়ী মানুষ তাতে হার মানে নি। তারা আজও হিমালয়ের আহ্বানে সাড়া দিয়ে চলেছে। তাই আমরা এসেছি এখানে, চলেছি ঐ রূপময় রূপকুণ্ডের তীরে।

গোয়ালদাম আর তার এই ডাকবাংলোর গল্প শুনেছি অনেক। আজ বুঝতে পারছি, তাদের সে সব কথা গল্প হলেও সত্যি। সত্যই সুন্দর এই ডাক-বাংলো আর তার পরিবেশ।

চুপ করে কেবল চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখি। চকচকে রোদ। উচ্চতা সাড়ে ছ হাজার ফুট হলেও আমাদের মোটেই শীত করছে না। মোহিত এতক্ষণ নীরব ছিল। এবারে কথা বলল, "নোংরা জামাকাপড়গুলো কেচে নিলে কেমন হয়?"

ভালই হয়। সবারই পছন্দ হয় প্রস্তাবটা। সাব্যস্ত হয় জলযোগ সেরে কাচাকাচি শুরু করতে হবে। দাশু রুকস্যাক থেকে খাবার বের করে ফেলে। সুজল সাহায্য করে তাকে। অমিতাভ ও অসিতবাবু ক্যামেরা বের করে ত্রিশুলের ছবি তোলেন। ইতিমধ্যে মালপত্র এসে যায়। বীর সিং আসে কুলিদের সঙ্গে। জিজ্ঞেস করে, "আপনারা কি রান্না করবেন, না দোকানে গিয়ে খেয়ে আসবেন?"

"দোকানে খাবার পাওয়া যায় নাকি?" অসিতবাবু বলেন।

"জী সাব। কিন্তু এখন তো স্পেশাল কিছু পাবেন না।"

"অর্ডিনারী কি পাওয়া যাবে?"

"আজ খিচুড়ী আর ভাজি করেছে।"

"গরম হবে ?"

"জরুর সাব। এখানে খাবার সব সময় গরম হয়।"

"তা হলে মন্দ কি, কি বলেন ?" অসিতবাবু দেবকীদার দিকে তাকান। দেবকীদা দলের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ।

"হ্যাঁ, অর্ডার দিয়ে দাও।" দেবকীদা অনুমতি দেন।

অসিতবাবু বীর সিংকে বলে, "তুমি একটা খবর পাঠাও। আমরা আজ দোকানেই খাব।"

বীর সিং একজন কুলিকে নির্দেশ দেয়। সে সংবাদ দিতে চলে যায় নিচে। বীর সিং বলে, "মালপত্রগুলো খুলে একটু রোদে দিয়ে নিলে ভাল হয়। এমন রোদ আর পাবেন না পথে। তা ছাড়া তাঁবু ও স্লিপিং ব্যাগগুলো একবার দেখেশুনে নেওয়া দরকার।"

ঠিকই বলেছে বীর সিং। আমরা মালপত্র সব খুলে ফেলি একে একে। মোহিত নোংরা জামাকাপড সব আলাদা করে নেয়। তারপর সুজলকে বলে, "চল আমরা গিয়ে শুরু করি।"

"চল" বলে সুজল এগিয়ে যায় মোহিতের সঙ্গে।

অসিতবাবু সুজলকে লক্ষ্য করে বলে ওঠেন, "তাড়াতাড়ি করিস। তোদের পরে আমরা যাব। সকাল সকাল খেয়ে নিতে হবে।"

"কেন ?"

"তোর সবতাতেই কেন ? খেয়ে নিয়ে কাজে বসতে হবে না ?" অসিতবাবু বলেন।

"কি কাজ ? মালপত্র তো রোদে দিয়েই দিচ্ছ।"

"রোদে দিলেই হল, ঘোড়া অথবা কুলির উপযোগী করে রি-প্যাকিং করতে হবে না ?" অসিতবাবুর কণ্ঠে বিরক্তি।

"খেয়ে উঠেই প্যাকিং ?" সুজল নারাজ।

"না করলে চলবে কেমন করে ? কাল সকালে রওনা হতে চাই। সময় কোথায় ?"

"তার মানে, তুমি আজ আর আমাদের বিশ্রাম করতে দেবে না, এই তো !"

"কেবল আজ নয় রে, আগামী একুশ দিনে দেব না। হিমালয়ে এসে বিশ্রাম ? ওরে হিমালয়ের পথ যে আরামের নয়, তা কি আজও বলতে হবে তোকে ?"

আর কথা না বাড়িয়ে সুজল চলে যায় মোহিতের সঙ্গে। কিছুক্ষণের মধ্যেই কাজ শেষ হয় আমাদের। বীর সিং চলে যায় নিচে। বলে, "ঘোড়াওয়ালাকে নিয়ে সন্ধ্যার সময় আবার আসব।"

আমরা তেলের শিশি নিয়ে রোদে বসি। ভাল করে স্নান করে নিতে হবে। হিমালয় পথের প্রধান নিয়ম শরীরটাকে সচল রাখা। বাঙ্গালীমাত্রই তেল-জলে মানুষ। কাজেই সুযোগ পেলেই স্নান করে নাও।

খাওয়ার পাট চুকিয়ে ডাকবাংলোয় ফিরতে দুটো বেজে গেল। সুজল মোহিত আর দাশুকে নিয়ে অসিতবাবু বসলেন মালপত্র রি-প্যাকিং করতে।

অমিতাভ ও দেবকীদার সঙ্গে আমি বেরিয়ে পড়ি পথে। ডাকবাংলো থেকে নেমে আসি নিচে। বাস স্ট্যাণ্ডের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলি তিনজনে। আমি মনে মনে ভেবে চলি দেবকীদার কথা। পুরো নাম দেবকীনন্দন দে। বয়সে আমাদের থেকে অনেক বড়। সে হিসেবে তাঁর সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্বের বন্ধন একটু বিস্ময়কর। তবে চেহারা দেখে দেবকীদার বয়স বোঝা কষ্টকর। কালো ছিপছিপে মানুষটি উৎসাহী ও কর্মঠ। একটা বড় সওদাগরী অফিসে চাকরি করেন। জীবনে অনেক ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করতে হয়েছে। ফলে সংসারী হবার সুযোগ পান নি। কিন্তু ভাইদের সংসারে তিনিই সর্বময় কর্তা। কর্তব্যপরায়ণ দেবকীদার জীবনে দুটি মাত্র বিলাসিতা—ধূমপান ও হিমালয় ভ্রমণ।

অমিতাভ তথা অমিতাভ দাশগুপ্ত বয়সে আমাদের সমবয়সী হলেও তার হিমালয় পথের অভিজ্ঞতা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি। সে খুব অল্প বয়সেই হিমালয়ের প্রেমে পড়েছে। কৈলাসসহ হিমালয়ের প্রায় তাবৎ তীর্থ পরিক্রমা পূর্ণ করেছে যৌবনের প্রারম্ভে। দীর্ঘ দেহ, স্বাস্থ্যবান। ব্যবহারিক জীবনে ব্যাঙ্ক-কর্মচারী, পারিবারিক জীবনে সংসারী। তার বাড়ির নাম 'অলকানন্দা', ছেলের নাম 'মানস'। হোমিপ্যাথি ও ফটোগ্রাফিতে সমান পারদর্শী। দুটোই শিখেছে হিমালয়ের প্রয়োজনে।

উৎরাই পথটুকু পেরিয়ে আমরা বাস স্ট্যাণ্ডে এলাম। পথের একপাশে ডাকবাংলো আর একপাশে একটু উঁচুতে কয়েকটি দোকান। সব চেয়ে পুরোনো ও সব চেয়ে বড় দোকানটি শার্দুলালজীর। গোয়ালদামের অতিশয় সম্মানিত ও প্রভাবশালী ব্যক্তি শার্দুলালজী। অথচ মানুষটি যেমনি বিনয়ী, তেমনি ভদ্র। আমাদের দেখতে পেয়েই নমস্কার করেন। প্রতি-নমস্কার করে বলি,

"লালাজী আমাদের যে কিছু চাল ডাল আটা আলু আর এক টিন কেরোসিন তেল চাই।"

সহাস্যে বলেন, "পেয়ে যাবেন। সন্ধ্যার আগেই পাঠিয়ে দেব ডাক-বাংলোয়। কতটা করে পাঠাব, বলে যান।"

অসিতবাবুর দেওয়া ফর্দখানা তাঁর হাতে দিয়ে বলি, "কিন্তু লালাজী রামচাঁদের জন্য বড়ই চিন্তায় আছি। কাল সকালে আমরা রওনা হতে চাই, সে যে এখনও এল না।"

"চিন্তা করবেন না সাব, স্বামীজী মহারাজের চিঠি পেয়েই আমি খবর পাঠিয়েছি তাকে, সে এসে যাবে। আর যদি একান্তই না আসে, বীর সিং আপনাদের নিয়ে যাবে। কোন অসুবিধে হবে না।"

তাঁর আশ্বাসে আশ্বস্ত হয়ে আমরা এগিয়ে চলি বনবিশ্রাম ভবনের দিকে। দশ মিনিটের মধ্যেই আমরা বিশ্রাম ভবনের সামনে এলাম। সুপ্রাচীন ও সুবিশাল একটি একতলা অট্টালিকা। দেড় থেকে দু ফুট চওড়া দেওয়াল। বড় বড় কামরা আর বারান্দা। দেখলেই বোঝা যায় ইতিহাসের নীরব সাক্ষী। সে নীরবতার অবসানের জন্য কেউ কোন চেষ্টা করেছেন কিনা জানি না। শুধু জানি, এটি একদা নীলকর ন্যাশ সাহেবের কুঠি ছিল। তিনিই নির্মাণ করেছিলেন এই ভবন। নীলকরের নিবাস আজ বিশ্রাম ভবনে পরিণত।

বর্তমান বাসিন্দাদের মধ্যে একটি বাঙ্গালী পরিবার রয়েছেন। ভদ্রলোকের নাম শ্রীনির্মলচন্দ্র মৈত্র। প্রথম জীবনে অধ্যাপনা ও পরবর্তী জীবনে সরকারী চাকরি করেছেন। কিন্তু সারা জীবনই হিমালয়ের পথে পথে ঘুরেছেন। ইদানীং চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন। কিন্তু অবসর নেন নি হিমালয়ের কাছ থেকে। পরিচিত মহলে পণ্ডিত বলে খ্যাতি আছে তাঁর। তিনি আজই বিকেলে এসেছেন এখানে। এসেছেন কুয়ারি হয়ে গোণাতাল যাবেন বলে। দিন দুই বিশ্রাম নেবেন এখানে। সেই সঙ্গে যতটা সম্ভব দেখে নেবেন চারিদিক। আমাদের পরিচয় পেয়ে খুশি হলেন। বিশ্রাম ভবন দেখিয়ে নিয়ে এলেন নিজেদের ঘরে। বসালেন সযত্নে। তারপরে গল্প জুড়ে দিলেন—নন্দপ্রয়াগের দিকে বাসপথ প্রসারিত হচ্ছে। এখন তিন মাইল দূরের তলোয়ারী পর্যন্ত বাস যায়। তলোয়ারীর মাইল খানেক আগে অর্থাৎ এখান থেকে মাইল দুয়েক দূরে একটি হ্রদ আছে। সেখানে সরকারী প্রচেষ্টায় মাছের চাষ হচ্ছে। ছোট জাতের মাছ ছেড়ে দেওয়া হয় পিণ্ডার নদীতে। আর বড় জাতের মাছ

রেখে দেওয়া হয় হ্রদে। গোয়ালদামের মত তলোয়ারীতেও বন বিভাগের একটি রজন গুদাম আছে। এখান থেকে প্রায় প্রতিদিন বন বিভাগের ট্রাক যায় সেখানে। কাজেই বাস না পেলে সেই ট্রাকে করেও যাওয়া যায় তলোয়ারী। তবে ফেরার সময় হেঁটে ফিরতে হয়। রজন বোঝাই ট্রাকে যাত্রীর জায়গা হয় না।

তলোয়ারী থেকে সাড়ে তিন মাইল এগিয়ে বিধানগড়ি। সকালে রওনা হলে বিধানগড়ি দর্শন করে সন্ধ্যের আগেই গোয়ালদাম ফিরে আসা যায়। গড়ি শব্দটি সম্ভবত গড় থেকে সৃষ্ট। কারণ বিধানগড়ি পাহাড়ের উপরে নির্মিত একটি ভগ্নদুর্গ। তবে সেখানে মোটামুটি অক্ষত একটি মন্দিরও আছে। ভগবতী মন্দির। সামনে ধর্মশালা। সেখানে কোন লোকালয় নেই। কেবল পূজারী ও কয়েকজন পাণ্ডা বাস করেন। পূজারী নাগপুরের অধিবাসী। কোথায় বিদর্ভ আর কোথায় গাড়োয়াল। কিন্তু বিদর্ভের ব্রাহ্মণ দেবীপূজার জন্য গাড়োয়ালে এসেছেন।

মৈত্রমশায়ের এখানেই আলাপ হল একজন স্থানীয় প্রবীণ ভদ্রলোকের সঙ্গে। তিনি আমাদের সঙ্গে গোয়ালদামের গল্প জুড়ে দিলেন। বললেন এক ঐতিহাসিক কাহিনী। সে প্রায় শ'দুয়েক বছর আগের কথা। গাড়োয়াল ও কুমায়ুন তখন নেপালীদের অধীন। এখানেও একজন নেপালী শাসক বাস করত। বড়ই অত্যাচারী ও নিষ্ঠুর ছিল সে। তার অত্যাচারে অধিবাসীদের জীবন ও সম্পত্তি সর্বদাই বিপন্ন ছিল। সুযোগ পেলেই সে লুটপাট করত। লুটপাটের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য প্রজাদের নিয়মিত ভেট দিতে হত তাকে—টাকা থেকে দুধ পর্যন্ত সবই পাঠাতে হত সর্দারকে। একদিন এক গৃহস্থের গরুর সব দুধ বাছুরে খেয়ে ফেলল। গৃহস্থ পড়ল বিপদে। সর্দারকে দুধ পাঠাতে হবে। না পাঠালে নিশ্চিত মৃত্যু। অথচ ঘরে দুধ কিংবা পয়সা কোনটাই নেই। উপায়ান্তর না দেখে গৃহস্থ তার স্ত্রীর স্তনদুগ্ধ ভেট দিল নেপালী শাসককে। সে দুধ খেয়ে সর্দার তো ভারী খুশি। এমন মিষ্টি দুধ তাকে আর কেউ কখনও পাঠায় নি। তাই পরদিন সেই গৃহস্থ গরুর দুধ নিয়ে এলে, সে সানন্দে তখুনি সেই দুধে চুমুক দিল। আর তাতেই বাধল গোল। সে গেল খেপে—আজকের দুধ কালকের মত মিঠে নয় কেন? কাল যে গরুর দুধ দিয়েছিলে, আমি সেই গরুর দুধ চাই।

আবার বিপদে পড়ল গৃহস্থ। অবশেষে বাধ্য হয়ে সে কথাটা বলল নেপালী

সর্দারকে। শুনে সে কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে রইল। তারপরে সৈন্যদের আদেশ করল—রাজ্যের সব স্তন্যপায়ী শিশুকে হত্যা করে তাদের জননীদের স্তনদুগ্ধ নিয়ে এসো আমার জন্য। প্রতিদিন আমি স্তনদুগ্ধ চাই।

নিষ্ঠুর শাসকের সৈন্যরা তৎক্ষণাৎ সে আদেশ পালন করতে থাকল। তারা আছাড় দিয়ে শিশুদের হত্যা করতে শুরু করল। জননীরা কাঁদতে কাঁদতে নিজেদের স্তনদুগ্ধ ভেট দিল শিশুহত্যাকারীদের। সন্তানহারা জননীদের আকুল ক্রন্দনে গোয়ালদামের আকাশ বাতাস উতলা হল। কিন্তু স্তন্যপায়ী সর্দার তাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হল না।

তরুণরা মেনে নিল এই অন্যায়, যুবকরা মুখ বুজে সহ্য করল এই অমানুষিক অত্যাচার। কিন্তু নীরব থাকতে পারলেন না চারজন বৃদ্ধ। তাঁদের দুজন অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে একটা পালকিতে আরোহণ করলেন। অপর দুজন পালকি বয়ে নিয়ে চললেন। বন্ধ পালকি চলল সর্দারের কুঠির দিকে।

ধীরে ধীরে চলেছে পালকি। পথচারীদের প্রশ্নের উত্তরে বৃদ্ধ বেয়ারারা বলছেন—এক ধনী গৃহস্থ সপরিবারে তীর্থযাত্রায় যাচ্ছেন। একে তো তীর্থ-যাত্রীরা যথাসাধ্য অর্থ সঙ্গে নিয়ে যায়, তার ওপর ধনী। চলেছে বন্ধ পালকিতে। কথাটা শুনে স্বাভাবিক ভাবেই সর্দার আকৃষ্ট হয়। লুব্ধ শাসক ভাবে, না জানি কত টাকাপয়সা নিয়ে যাচ্ছে পালকিতে করে। সৈন্যদের সঙ্গে সে এসে পালকির পথরোধ করে। নিজ হাতে পালকির দরজা খোলে। সঙ্গে সঙ্গে ভেতরের বৃদ্ধরা বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়েন তার ওপরে। নিজেরা মৃত্যুবরণ করার আগেই তাঁরা হত্যা করেন অত্যাচারী শাসককে। অত্যাচারমুক্ত হল গোয়ালদাম। চারজন বৃদ্ধের জীবনের বিনিময়ে মায়েদের মুখে হাসি ফুটল। মুক্তি পেল গোয়ালদামের মানুষ।

গল্প-শেষে বিদায় নিই বিশ্রাম ভবন থেকে। বেরিয়ে আসি পথে। যেমন পথ, তেমনি প্রাকৃতিক পরিবেশ আর আবহাওয়া। দেবকীদা বলেন, "এমন সুন্দর জায়গায় না এসে মানুষ কেন সিমলা-দার্জিলিং যায় বুঝতে পারি না।"

"সত্যি!" অমিতাভ সমর্থন করে তাঁকে।

আমরা এগিয়ে চলি ফরেস্ট নার্সারীর দিকে। গোয়ালদামে একটি পর্বতা-রোহণ শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করার কথা চলেছে কয়েক বছর ধরে। প্রস্তাবটি কার্যকরী হলে সবার নজর পড়বে এই রমণীয় শৈলাবাসের দিকে।

ঘণ্টাখানেক গোয়ালদামের চড়াই-উৎরাই পথে টহল মেরে ফিরে চলি

ডাকবাংলোয়। মন ফিরতে চায়-না। এমন সুন্দর পথ আর পরিবেশ। তবু নিঃশব্দে এগিয়ে চলি। সহসা অমিতাভ কথা বলে, "একটু বসা যাক এখানে।" সে পথের পাশে একখানি পাথর দেখিয়ে দেয়।

তিনজনে এসে বসি পাথরখানার ওপরে। কিছুক্ষণ চুপচাপ কেটে যায়। তারপরে দেবকীদা বলেন, "কত সুন্দর এই হিমালয়, অথচ তাকে নিয়ে কতটুকু লেখা হল বাংলা সাহিত্যে! এ সম্পর্কে তোমার ধারণা কি?"

প্রশ্নটাকে একটু খাপছাড়া বলে মনে হয়। বলি, "এখানে এসময় হঠাৎ এ প্রশ্ন করলেন?"

"না, অনেকদিন থেকেই তোমাকে কথাটা জিজ্ঞেস করব ভেবে রেখেছি, আজ হঠাৎ মনে পড়ল।"

"হিমালয় ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি, সমাজ ও শিল্পের ধারক। সে ভারতীয় সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ সামগ্রী। তিন হাজার বছর আগে হিমালয় সগৌরবে ভারতীয় সাহিত্যে তার স্থান সুনির্দিষ্ট করে নিয়েছে। বিশ্বসাহিত্যেও হিমালয় অবহেলিত নয়—ইংরেজী, ফরাসী, ইতালীয় ও জার্মান সাহিত্যের কয়েকখানি বিখ্যাত গ্রন্থ রচিত হয়েছে হিমালয়কে নিয়ে। স্বাভাবিক ভাবেই বাঙ্গালী সাহিত্যিকরা হিমালয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। তবে হিমালয়ের পথে বাঙালী যাত্রীরা যেমন এগিয়ে চলেছেন, তাঁরা তেমন এগোতে পারছেন না। আজও হিমালয় সম্পর্কে কোন খোঁজখবর পেতে হলে আমাদের সম্পূর্ণরূপে বিদেশী সাহিত্যের ওপর নির্ভর করতে হয়। কিন্তু সেজন্য নিরাশ হবার কিছু নেই। বাঙ্গালী সাহিত্যিকদের যখন নজর পড়েছে হিমালয়ের দিকে, তখন অদূর ভবিষ্যতে হিমালয়কে নিয়ে নিশ্চয়ই ভাল ভাল বই লেখা হবে আমাদের সাহিত্যে।"

"আচ্ছা আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম হিমালয় ভ্রমণকাহিনী কি?" অমিতাভ জিজ্ঞেস করে।

একটু ভেবে নিয়ে বলতে শুরু করি, "আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম হিমালয় ভ্রমণকাহিনী কী, তা নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। তবে সম্ভবতঃ রাজেন্দ্রমোহন বসুর 'কাশ্মীর কুসুম' বাংলায় প্রকাশিত প্রথম ভ্রমণকাহিনী। ১৮৭৫ সালে এই বইটি প্রকাশিত হয়। গ্রন্থকার ১৮৬৯ সালে কাশ্মীরভ্রমণে গিয়েছিলেন। এর পরেই প্রকাশিত হয় রায়বাহাদুর জলধর সেনের 'হিমালয়'। এই অপূর্ব গ্রন্থখানির প্রকৃত রচয়িতা কে, তা নিয়ে এখনও অনেকে সন্দেহ পোষণ

করেন। কিন্তু সে বিতর্ক এখানে অবান্তর। ১৯০০ সালে এই বইটি প্রকাশিত হয়েছে। লেখক ১৮৯০ সালে বদ্রীনাথ দর্শনে গিয়েছিলেন।

"কাশ্মীর কুসুম প্রথম প্রকাশিত হিমালয় ভ্রমণকাহিনী হলেও প্রাচীনতম ভ্রমণবিবরণ নয়। পরে প্রকাশিত হলেও প্রথম ভ্রমণকাহিনী রচিত হয় শতাধিক বছর আগে। লেখক যদুনাথ সর্বাধিকারী ১৮৫৩ সাল থেকে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত এই চার বছর, গরুর গাড়ি, ঘোড়া ও ডাণ্ডী চেপে এবং পায়ে হেঁটে কেদার-বদ্রীসহ সারা উত্তর ভারত ভ্রমণ করেন। পরিক্রমাকালে তিনি নিয়মিত রোজ-নামচা লিখতেন। তাঁর বংশধরগণ ১৯১৫ সালে 'তীর্থ-ভ্রমণ' নাম দিয়ে সেই রোজ-নামচাখানি প্রকাশ করেন। সাত শতাধিক পৃষ্ঠার এই গ্রন্থখানি আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম ভ্রমণবিবরণ।

"তারপর থেকে বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবেই বাংলা সাহিত্যে হিমালয়ের পরিধি প্রসারিত হয়েছে। এখন হিমালয় নিয়ে প্রায় শ'খানেক বাংলা বই আছে এবং এর প্রায় অর্ধেক কেদার-বদ্রীকে কেন্দ্র করে। দুটিমাত্র তীর্থক্ষেত্র বা দর্শনীয় স্থানকে অবলম্বন করে পৃথিবীর খুব কম সাহিত্যেই এত অধিক সংখ্যক পুস্তক প্রণীত হয়েছে।

"হিমালয়ের অন্যান্য অঞ্চল, যথা গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রী, বসুধারা, নন্দনকানন, হেমকুণ্ড, রূপকুণ্ড, কাশ্মীর, কুমায়ুন, কৈলাস, পাঞ্জাব ও হিমাচল প্রদেশ, এমন কি নেপাল সিকিম ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ প্রভৃতি স্থান নিয়েও বহু বাংলা ভ্রমণকাহিনী রচিত হয়েছে। অধিকাংশই গড়ে উঠেছে তীর্থ-পরিক্রমা কিংবা হিমালয়ের অপরূপ রূপ-লাবণ্য দর্শনের বর্ণনাকে কেন্দ্র করে। কয়েকখানি গ্রন্থে অবশ্য হিমালয়ের অংশবিশেষের ইতিহাস ভূগোল রাজনীতি ও অর্থনীতি নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু তা প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই নগণ্য।

"হিমালয়ের ঐশ্বর্য আহরণ, তার অধিবাসীদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও ভারতকে সুরক্ষিত করার প্রয়োজনে আজ হিমালয়ের সঙ্গে আমাদের সুপরিচিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। এই পরিচয় কেবল তীর্থ-পরিক্রমার মধ্যে থেকেই হবে না, এই পরিচয়ের জন্য নব নব অভিযান ও গবেষণার আয়োজন করতে হবে হিমালয়ের প্রতিটি গিরিশৃঙ্গে, প্রতিটি গিরিবর্ত্মে, প্রতিটি গ্রাবরেখায়। দেবতাত্মা হিমালয়ের অনন্ত রহস্যকে আবিষ্কার করতে হবে। সেই আবিষ্কারের কথা ও কাহিনীকে সাহিত্যের মাধ্যমে পৌঁছে দিতে হবে সকলের কাছে।"

॥ নয় ॥

দিনের আলো নিভে যাবার সঙ্গে সঙ্গে কোথা থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে হিমেল হাওয়া এলো ছুটে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা দিনের উত্তাপটুকু তাড়িয়ে দিল। বারান্দায় বসে থাকা কষ্টকর হয়ে উঠল। আমরা ঘরে এসে বিছানার ওপরে বসলাম। স্লিপিং ব্যাগটা পায়ের ওপর টেনে নিলাম। মোহিত গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল।

একটু আগে শাদীলালজী জিনিস পাঠিয়ে দিয়েছেন। তাঁকে আমরা উপেনবাবুর কথা বলেছি। কথা ছিল, উপেনবাবু আজ বিকেলে এখানে আসবেন। কিন্তু তিনি আসেননি। কোন কারণে এসে পৌঁছতে পারলেন না। তাই শাদীলালজীকে বলে রাখলাম তাঁর কথা। তিনি এলে শাদীলালজী তাঁর যাবার ব্যবস্থা করে দেবেন। আমরা ওয়ানে তার জন্য অপেক্ষা করব।

উপেনবাবু তথা বটানিক্যাল সার্ভে অব্ ইণ্ডিয়ার ডক্টর উপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য আমাদের দলের উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী। পথের গাছ-পালা ও বুগিয়াল বা তৃণভূমির সমীক্ষা করবার জন্য তিনি সরকারী ভাবে আমাদের সঙ্গে যাচ্ছেন। ইতিপূর্বে আর কখনও রূপকুণ্ড পথের উদ্ভিদ-সমীক্ষা হয়নি। উপেনবাবু আমার পূর্বপরিচিত। তিনি ১৯৫৫ সালে আমাদের নীলগিরি পর্বত অভিযানের উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী ছিলেন। সেবার তিনি লোকপাল-হেমকুণ্ড ও নন্দনকাননের উদ্ভিদ-সমীক্ষা করেছেন।

একটু আগে চৌকিদার এসেছিল। সে আমাদের চা খাইয়ে গেছে। তারপরে এসেছে বীর সিং। সে ঘোড়াওয়ালাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল। ঘোড়াওয়ালা জাতিতে ভোট। ভোট ভারত-তিব্বত সীমান্তের মিশ্রজাতি। ওরা ইতিপূর্বে দু-দেশেরই নাগরিক ছিল। চীনারা তিব্বত দখল করার পর থেকে ওরা স্থায়ীভাবে ভারতে বাস করছে। এখানেও বাস স্ট্যাণ্ডের নিচে একটি বেশ বড় ভোটবস্তী আছে। আমাদের ঘোড়াওয়ালাটি স্বাস্থ্যবান। তার গায়ের রং ঈষৎ তামাটে। তবে পোশাক পাঞ্জাবীদের মত। ভোটিয়ারা চুল রাখে আর নিয়মিত বেণী বাঁধে। বেণীটি অবশ্য পাগড়ীর তলায় ঢাকা থাকে।

চারটি ঘোড়া ঠিক হয়েছে। সস্ত্রীক ঘোড়াওয়ালা যাবে আমাদের সঙ্গে। প্রতি ঘোড়া দু মণ মাল বইবে। দৈনিক ভাড়া আট টাকা।

সবই হয়ে গেছে। সবাই এসেছে। কিন্তু যাকে গোয়ালদাম আসার পর থেকে প্রতিক্ষণে আশা করছি, সে আসেনি এখন পর্যন্ত। আসেনি আমাদের পথপ্রদর্শক রামচাঁদ। শাদীলালজী ও বীর সিং যাই বলুক, তাকে সঙ্গে না নিয়ে এই দুর্গম পথে আমাদের রওনা হওয়া উচিত নয়। তাই মনে হচ্ছে সব হয়েও কিছুই যেন হয়নি।

রাতের সঙ্গে শীত বাড়ছে। আমরা একটু একটু করে স্লিপিং ব্যাগের ভেতরে ঢুকছি। একসময় দেখি আমাদের সারা শরীরটাই স্লিপিং ব্যাগের ভেতরে। আমরা সবাই শয্যাশায়ী। শুধু তাই নয়, দু-একজনের নাক ডাকতে শুরু করে দিয়েছে।

হঠাৎ নেতা বলে ওঠেন, "নটা বাজে। এবারে চলুন, খেয়ে আসা যাক।"

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি, অসিতবাবু ঠিকই বলেছেন। অতএব অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্লিপিং ব্যাগের মায়া পরিত্যাগ করে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে হয়। অমিতাভ মোহিত দাশু ও দেবকীদা বিনা বাক্য ব্যয়ে তৈরি হয়ে নেন। কিন্তু অসিতবাবু মুশকিলে পড়েন সুজলকে নিয়ে। উঠি উঠি করেও সে বিছানা ছাড়ছে না। অসিতবাবু তাকে বাক্যবাণ নিক্ষেপ করে চলেন। কিন্তু কোন ফল হয় না। অবশেষে দেবকীদার চেষ্টায় সুজল গাত্রোত্থান করে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে সঙ্গে চলে আমাদের। বার বার বলতে থাকে, "আমার একদম খিদে নেই, তবু তোমরা আমাকে জোর করে নিয়ে চললে। তোমরা জানো না, পদযাত্রার আগের রাতে উপোস দিলে শরীরটা ঝরঝরে হয়।"

শাদীলালজী এখনো দোকানে রয়েছেন। আমাদের চিঠিগুলি তাঁর হাতে দিই। এখানে কোনো পোস্ট অফিস নেই। শাদীলালই গোয়ালদামের অনারারী পোস্ট মাস্টার। তাঁর দোকানেই খাম পোস্ট কার্ড কিনতে পাওয়া যায়। তাঁর কাছেই সবার চিঠি আসে। তিনই এখানকার চিঠি-পত্র পরদিনের বাসে গরুড় পোস্ট অফিসে পাঠিয়ে দেন।

দুপুরে খিচুড়ি খেয়েছি বলে রাতের জন্য অসিতবাবু ভাতের অর্ডার দিয়েছিলেন। কিন্তু তখন বুঝতে পারেননি, তাঁর সাধের ভাত এমন বিচিত্র বস্তু হবে। রাঁধুনী ফেনাভাত রাঁধার চেষ্টা করেছিল। মহৎ প্রচেষ্টা সন্দেহ নেই।

শীতের রাতে বিশুদ্ধ দেশী ঘি দিয়ে গরম গরম ফেনাভাত নিঃসন্দেহে উপাদেয় খাদ্য। কিন্তু জলাধিক্যের জন্য সেই ফেনাভাত এক বিচিত্র বস্তুতে পরিণত হয়েছে। সঙ্গের উপকরণ দুটিও উপেক্ষণীয় নয়। একটি উড়দ্‌কা ডাল—জলবৎ তরলং। অপরটি ভিণ্ডিকা সব্জী—স্বাদহীন অখাদ্য। রাঁধুনী চিনিয়ে দেবার পরেই বুঝতে পারলাম। নইলে সাধ্যও ছিল না ওদের প্রকৃত পরিচয় আবিষ্কার করি। তবে ওদের সঙ্গে দুটি পরিচিত বস্তু রয়েছে—কাঁচা লঙ্কা ও কাঁচা পেঁয়াজ। পেঁয়াজ যেমন মিষ্টি, লঙ্কা তেমনি ঝাল।

ভাত ডাল ও তরকারীর বর্ণ পরিচয় যাই হয়ে থাকুক, তাতে কিন্তু রাঁধুনীর কোন সাশ্রয় হল না। সে আমাদের খাবার পরিমাণ দেখে নিশ্চয়ই আত্মপ্রসাদ লাভ করল। ভেবে নিল, এমন উপাদেয় খাদ্য ইতিপূর্বে আর আমাদের অদৃষ্টে জোটেনি। আমরা নিজেরাও কম আশ্চর্য হলাম না। এই না খাবার চেহারা দেখে নাসিকা কুঞ্চিত করছিলাম। আর খাওয়া শুরু করেই সব বেমালুম ভুলে গেলাম। তবে সব চেয়ে বেশি অবাক করল সুজল। শরীর ঝরঝরে রাখার জন্য উপোস করতে চাইছিল। আর সেই কিনা হাপুসহুপুস শব্দে দোকানীর দুথালা ভাত সাবাড় করে দিল। কিন্তু না করেই বা উপায় কি? এটি যে হিমালয় পথের নিয়ম। ভাল-মন্দ বিচার না করে, যখন যেখানে যা পাও, তাই পেট পুরে খেয়ে নাও। একজন মানুষের খাদ্য আর একজন মানুষের অখাদ্য হতে পারে না।

খাওয়া-শেষে ফিরে চলি ডাকবাংলোয়। চলতে চলতে মোহিত জিজ্ঞেস করে, "দেবকীদা এখানে নাকি ভালুক আছে?"

"কেন তোর ভয় করছে নাকি?" দাশু ঠাট্টা করে।

"না। ভয়ের জন্য নয়, এমনি জিজ্ঞেস করছি।" মোহিত বলে।

"আছে শুনেছি। আর থাকাই স্বাভাবিক।" সিগারেটে সুখ টান মেরে দেবকীদা মন্তব্য করেন।

অসিতবাবু কিন্তু অন্য চিন্তা করছিলেন। এবারে মনের কথা প্রকাশ করেন, "কাল রওনা হতে পারব কিনা কে জানে?"

"কেন?" আকস্মিক প্রশ্নে বিস্মিত হয়ে অমিতাভ বলে।

"রামচাঁদ যে এখনও এলো না।"

সত্যই চিন্তার কথা। কথাটা ভাবতে ভাবতে আমরা ওপরে উঠে আসি। সপ্তমীর চাঁদ কখন যেন পালিয়ে গেছে আকাশের আঁচল ছেড়ে। অসংখ্য তারা

এসে জমা হয়েছে সেখানে। সন্ধ্যার পরে চাঁদের আলোয় দেখেছিলাম ত্রিশূলকে। এখন চাঁদ নেই, কিন্তু ত্রিশূল রয়েছে সেখানে। আঁধার মুছে ফেলতে পারেনি তাকে। বরং সে রহস্যময় রূপ নিয়ে হাতছানি দিয়ে কাছে ডাকছে আমাদের। অনন্তকাল ধরে মানুষকে আহ্বান করছে তার বুকে। সে চিরকাল ছিল ওখানে, চিরকাল থাকবে ওখানে, আর চিরকাল আমাদেরই মত দলে দলে মানুষ ছুটে যাবে তার কাছে।

কিন্তু আমরা যেতে পারব কি? রামচাঁদ যে এখনও আসেনি। আজ আর আসবে না। কালই যে আসবে তারই বা নিশ্চয়তা কি? তা হলে কি আমরা যাব না রূপকুণ্ডে? না না, যাব বৈকি, নিশ্চয়ই যাব। রামচাঁদকে ছাড়াই আমরা যাব রূপকুণ্ডে। কাল সকালেই আমাদের যাত্রা হবে শুরু।

সিদ্ধান্ত শেষে ঘরে এসে স্লিপিং ব্যাগের আশ্রয় নিই। দশটা বাজে, এবারে শুয়ে পড়া যাক। কাল সকালে বেরুতে হবে। ঘোড়াওয়ালা বলে গেছে ঠিক ছটায় হাজির হবে। এবারে বিশ্রামের প্রয়োজন। কিন্তু শুতে গিয়ে দেখি অসিতবাবু চশমা পড়ছেন। তাঁকে চলাফেরা করার জন্য চশমার সাহায্য নিতে হয় না, কেবল লেখাপড়ার জন্যই চশমার দরকার। তা হলে কি অসিতবাবু এত রাতে বই খুলে বসবেন নাকি? না, বই নয়—খাতা, হিসেবের খাতা। আমরা বলি, চিত্রগুপ্তের খাতা। ভুলেই গিয়েছিলাম যে এটি তার নিত্যকর্ম—দিনের শেষ কাজ। যতই রাত হোক, যত পরিশ্রমই হোক, শোবার আগে সারাদিনের খরচটি লিখে রাখা চাই। কলকাতায় ফিরে গিয়ে যে একখানি করে নিখুঁত 'ব্যালান্স সীট' প্রেজেণ্ট করতে হবে প্রত্যেক মেম্বারকে। কো-অপারেটিভ পদযাত্রা, নিখুঁত হিসেবটি রাখা চাই। কুড়েমি করলে চলবে কেন?

কয়েক মিনিট হিসেবের মধ্যে ডুবে থাকেন অসিতবাবু। তারপরে হঠাৎ বলে ওঠেন, "দেবকীদা আপনি ক'কাপ চা খেয়েছেন?"

দেবকীদা শুয়ে শুয়ে পাল্টা প্রশ্ন করেন, "কখন?"

"সকালে?"

"কোথায় গরুড়ে, বৈজনাথে, না গোয়ালদামে?"

"গরুড়ে।"

"এক কাপ।"

"তাহলে এক কাপ চায়ের যে কোন হিসেব পাচ্ছি না।"

অসিতবাবু সবিশেষ চিন্তিত।

সুজল চিন্তামুক্ত করে তাঁকে, "আমি দু কাপ খেয়েছি অসিতদা।"

অসিতবাবু চড়াস্বরে বলে ওঠেন, "এতক্ষণ বলতে পারিসনি! আমার এদিকে হিসেব মিলছে না, আর তুই ওদিকে দু কাপ চা গিলে চুপ মেরে আছিস।"

"চুপ মেরে রইলাম কোথায়? তুমি জিজ্ঞেস করতেই তো স্বীকার করলাম।" সুজল তার অপরাধ বুঝতে পারে না।

"কৃতার্থ করেছো। কিন্তু কথাটা তখন বললে তো ব্যালান্স না মেলার জন্য আমাকে এতক্ষণ হাঙ্গামা পোহাতে হত না।"

এতক্ষণে সুজল বুঝতে পারে অপরাধ। তাই এবারে সে সত্যি সত্যি চুপ মেরে যায়। অসিতবাবু পুনরায় হিসেবে মনোনিবেশ করেন।

কতক্ষণ পরে জানি না। একটু তন্দ্রার মত এসেছিল। হঠাৎ মনে হল কেউ দরজা ধাক্কাচ্ছে। ইতিমধ্যে কখন যেন আলো নিভিয়ে অসিতবাবু শুয়ে পড়েছিলেন। তিনি উঠে আলো জ্বালান। আমরাও বিছানায় উঠে বসি। অসিতবাবু বলেন, "বোধ হয় বীর সিং এসেছে।" তিনি দরজা খোলেন।

না, বীর সিং নয়। একজন অপরিচিত লোক বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। লোকটির পরনে দেশী পোশাক, পায়ে হাণ্টার শু, মাথায় পাহাড়ী টুপি। উন্নত নাসিকা, কিন্তু চোখ দুটি ছোট ছোট। মাঝারী গড়ন। বয়স বছর পঁয়তাল্লিশ। বেশ কেতাদুরস্ত। ঘরে ঢুকে সবাইকে স্যালুট ঠোকে। তারপরে একখানা চেয়ার নিয়ে বসে। লোকটি কে? আমরা তাকিয়ে থাকি তার মুখের দিকে। সে ধীরে সুস্থে বলে, "আজ একটু বেশি সরদী পড়েছে। মালুম হচ্ছে আপনাদের বেশ শীত করছে।"

আমরা মাথা নাড়ি। লোকটি বলতে থাকে, "আজ আকাশ সাফ ছিল। কিন্তু কাল কুয়াশা পড়তে পারে। তাহলেই বিপদ, বের হতে দেরি হয়ে যাবে। তা আপনারা কখন বেরুতে পারবেন?"

"বীর সিং যখন বলবে।" অসিতবাবু উত্তর দেন।

লোকটি অসন্তুষ্ট হয়। বিরক্ত কণ্ঠে বলে, "বীর সিং কি বলবে? সে কি জানে রূপকুণ্ডের।"

"কিন্তু......" অসিতবাবু শেষ করতে পারেন না।

"ছটার মধ্যে কি রেডি হতে পারবেন?"

"কেন পারব না?"

"তা হলে এবারে শুয়ে পড়ুন। কাল ঠিক ছটায় সময় রেডি থাকবেন।" লোকটি উঠে দাঁড়ায়।

"তুমি?" প্রশ্নটা করে ফেলি কোনমতে।

"আমি?" সে বিস্মিত হয়। "আমাকে চিনতে পারেননি?"

"না, কোনদিন দেখেছি বলে তো মনে পড়ছে না।"

"তসবীরও দেখেননি?"

"মনে পড়ছে না।"

"আমি রামচাঁদ……"

"হুর্‌রে, থ্রি চিয়ার্স ফর কমরেড্ রামচাঁদ!" সুজল জড়িয়ে ধরে তাকে। আমরাও আনন্দে উচ্ছল হয়ে উঠি। রামচাঁদ খুশি হয়। হয়তো বা একটু গর্ববোধ করে।

"আমরা ভেবেছিলাম তুমি আজ আর আসবে না।" দাশু বলে।

"ভুল ভেবেছিলেন। আমি আজই এসেছি।" বলতে বলতে ঘড়ি দেখে রামচাঁদ, "এখনও রাত বারোটা বাজেনি। রামচাঁদ কখনও কথার খেলাপ করে না। আচ্ছা আসি তা হলে। কাল সকাল ছটায় আসব। রেডি থাকবেন।"

'গুড নাইট' বলে বেরিয়ে যায় রামচাঁদ। আমাদের মাথার বোঝা নেমে যায়। সকল দুশ্চিন্তার অবসান হয়। বিছানায় ফিরে এসে নিশ্চিন্তে নিদ্রার কোলে ঢলে পড়ি।

॥ দশ ॥

সকালে ঘুম ভাঙে দেবকীদার ডাকে। চোখ মেলে দেখি জনতা-স্টোভ জ্বলছে, জল ফুটছে—কফির জল। তাড়াতাড়ি স্লিপিং ব্যাগ থেকে বেরিয়ে বিছানায় উঠে বসি। দেবকীদা বলেন, "মুখ ধুয়ে এসো।"

"আবার মুখ ধুতে হবে?"

"গোয়ালদামেই মুখ না ধুয়ে কফি খাবে নাকি?"

"কিন্তু বেশ শীত করছে যে।"

"করুক গে। মুখ ধুয়ে এসো।"

অগত্যা আমরা বাথরুমের দিকে পা বাড়াতে বাধ্য হই। মুখ ধুয়ে এসে ঘড়ি দেখি, পাঁচটা বেজে গেছে। তাহলে তো আর বসে থাকা ঠিক নয়। অনেক কাজ বাকি আছে। ছটার সময় রামচাঁদ আসবে। ভাগ্যিস দেবকীদা ঠিক সময়ে ঘুমে থেকে উঠেছিলেন। তবে এটি তাঁর চিরকালের অভ্যেস। কলকাতায়ও তিনি শেষরাতে শয্যাত্যাগ করেন। প্রাতঃভ্রমণ সেরে বাড়ি ফিরে, এমনি কফি করে সবার ঘুম ভাঙ্গান। হিমালয়ের পথেও দেবকীদা স্বেচ্ছায় এই কঠিন কর্তব্যভার গ্রহণ করেছেন।

কফির মগ হাতে নিয়ে বারান্দায় বেরিয়ে আসি। আকাশটা আস্তে আস্তে লাল হয়ে উঠছে। ত্রিশুলকে এতক্ষণ দেখাচ্ছিল অস্পষ্ট মর্মর-মূর্তির মত। এবারে ধীরে ধীরে স্পষ্ট হচ্ছে, আস্তে আস্তে তার রং ফিরছে। সাদা লাল হচ্ছে, লাল সোনালী হচ্ছে। সূর্য সোনার পাত দিয়ে মুড়ে দিল মহাদেবের ত্রিশুলকে। তবে কি দেবতাত্মা হিমালয়ের রং বদলের পালা শেষ হয়ে গেল?

না। এ পালা চলে প্রতি পলে। চলে দিনে রাতে—ঋতুতে ঋতুতে। উষার সঙ্গে মধ্যাহ্নের, গোধূলির সঙ্গে রাতের যেমন কোন মিল নেই, তেমনি মিল নেই গ্রীষ্মের সঙ্গে বর্ষার, শরতের সঙ্গে শীত কিংবা বসন্তের। আর এই অমিলই হিমালয়ের সব চেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য।

ত্রিশুলকে দেখে কিন্তু মনে হচ্ছে যে তার এই সোনালী রূপই চিরস্থায়ী। অথচ জানি কিছুক্ষণের মধ্যেই তার রূপ পরিবর্তিত হবে। পরিবর্তন যে হিমালয়ের নিয়ম। প্রথমে কয়েকটি কলঙ্কচিহ্ন দেখা দেবে ত্রিশুলের গায়ে। ধীরে ধীরে সোনালী রং আবার রুপোলী হতে থাকবে। তবে এ রুপোর সঙ্গে আগের রুপোর কোন মিল থাকবে না। জলন্ত রুপোর মত চকচক করতে থাকবে। আমরা সেই শাণিত আয়ুধকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়ে পদযাত্রা শুরু করব।

ঘড়ির দিকে নজর পড়তেই চমকে উঠি। ছটা বেজে গেছে। রামচাঁদ এখুনি এসে যাবে। আর আমি এখনও এয়ার ম্যাট্রেসের হাওয়া ছাড়িনি, পোশাক পড়িনি। তাড়াতাড়ি ভেতরে আসি। না, এমন কর্মঠ ও বিচক্ষণ নেতা থাকতে বিচলিত হই কেন? মোহিত, দাশু ও সুজনের সাহায্যে তিনি সবার মালপত্র গুছিয়ে ফেলেছেন। পোশাক পড়ে একেবারে তৈরি হয়ে বসে আছে ওরা। আমিও পোশাক পড়ে নিই। তারপরে আবার বারান্দায় বেরিয়ে আসি। এবারে ঘোড়া এবং রামচাঁদ এলেই রওনা হতে পারি।

কিন্তু কোথায় তারা ? এমন কি বীর সিং-এর পর্যন্ত পাত্তা নেই। যখন হয় আসবে, আমরা ততক্ষণ এখানে বসে বসে ত্রিশূলকে দেখি। যত দেখছি, ততই ভালো লাগছে। দেখার আশ মিটছে না—ভালোর যে শেষ নেই।

কিন্তু ধৈর্যের শেষ আছে। সাতটা বাজে, এখনও আসছে না ওরা। অসিতবাবু সবিশেষ চিন্তিত। আমরা তাঁকে নিশ্চিন্ত করতে চাইছি। বলছি—পদযাত্রার প্রারম্ভে প্রত্যেক যাত্রীকে এমন প্রতীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। মালবাহকরা ঘর ছেড়ে দুর্গম গিরি-কান্তারে যাত্রা করে। স্বাভাবিক ভাবেই ঘরের মানুষের কাছ থেকে বিদায় নিতে তাদের দেরি হয়ে যায়।

অসিতবাবু মানতে পারেন না আমাদের যুক্তি। বলেন, "ঘোড়াওয়ালার ঘরের মানুষ তো তার সঙ্গেই যাচ্ছে, সে সস্ত্রীক চলেছে আমাদের সঙ্গে। আর বীর সিং ও রামচাঁদের ঘরণীরা নেই গোয়ালদামে।"

কথাটা মিথ্যে নয়। কাজেই চুপ করে থাকতে হয়।

কিছুক্ষণ পরে অসিতবাবু আবার বলেন, "চলুন, একবার নিচে নেমে দেখা যাক ওদের কি হল!"

অসিতবাবুর সঙ্গে আমি ও দাশু ডাকবাংলো থেকে নেমে আসি বাস স্ট্যাণ্ডে। শাদীলালজী নমস্কার করেন আমাদের। আমরা প্রতি-নমস্কার করে তাঁকে বলি সব কথা। আমাদের কথা শুনে শাদীলালজী হেসে দেন। বলেন, "ওদের ছটা মানে আপনাদের আটটা। ওদের বাড়ি গিয়ে দেখবেন, সবে ঘুম ভেঙ্গেছে। সে যাই হোক। আপনাদের যাবার দরকার নেই, আমি লোক পাঠাচ্ছি রামচাঁদের কাছে।"

আমরা বেরিয়ে আসি শাদীলালজীর দোকান থেকে। অসিতবাবু দাশুকে বলেন, "রওনা হতে যখন দেরি আছে, তখন কিছু খেয়ে নে দোকান থেকে। ডাকবাংলোয় গিয়ে ডেকে নিয়ে আয় ওদের।"

"আপনারা খাবেন না কিছু ?" দাশু জিজ্ঞেস করে।

"খাবো, তবে তার আগে মহারাজের সঙ্গে একটু ঘুরে আসছি বনবিশ্রাম ভবন থেকে। একবার দেখা করে আসি মৈত্রমশায়ের সঙ্গে।"

দাশু চলে যায় ওপরে, আমরা নেমে চলি নিচে।

পর্বতারোহণে গোয়ালদামের অবদান অসামান্য। সেকালে গাড়োয়াল ও কুমায়ুন হিমালয়ের বহু বিখ্যাত পর্বতাভিযান হয়েছে এই পথে। সাধারণত অভিযাত্রীরা এসে মিলিত হতেন রানীক্ষেতে। সেখানেই অভিযানের আয়োজন

সম্পূর্ণ হত। তারপরে তাঁরা গাড়ি করে গরুড় আসতেন। সেখান থেকেই শুরু হত পদযাত্রা। গোয়ালদামে তখন নির্মাণ বিভাগের ডাকবাংলো ছিল না, ছিল এই আবাসটি। তখন ছিল মিস্টার ও মিসেস ন্যাশের বাংলো। এখন বনবিশ্রাম ভবন। এখানেই আশ্রয় নিতেন অভিযাত্রীরা। এখান থেকেই যাত্রা করতেন হিমালয়ের গহীন গিরি-কান্তারে।

বড়লাট লর্ড মিণ্টোর আমন্ত্রণে হিমালয় সমীক্ষার জন্য ডঃ টি. এস. লংস্টাফ, এ, এল. মাম, সি. জি. ব্রুস ও তিনজন এ্যালপাইন গাইড এবং নজন গুর্খাসহ ১৯০৭ সালের ২৮শে এপ্রিল গোয়ালদাম পৌছলেন। এখানে তাঁরা ন্যাশ দম্পতির আতিথ্য গ্রহণ করে এই বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। এই পথে তাঁরা ওয়ান হয়ে কুয়ারি গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করে তপোবনে গিয়েছিলেন। তাঁরা প্রায় সমস্ত গাড়োয়াল-হিমালয় ভ্রমণ করেছিলেন এবং ১২ই জুন (১৯০৭) ত্রিশুল পর্বতে আরোহণ করেছিলেন। সেই অভিযানের কথা এ. এল. মাম্ তাঁর 'Five months in the Himalaya' (১৯০৯) এবং সি. জি. ব্রুস তাঁর 'Twenty years in the Himalaya" (১৯১০) 'ও Himalayan wanderer' (১৯৩৪) গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। এই বই তিনখানি থেকে আমরা সে আমলের গোয়ালদাম ও ওয়ান অঞ্চলের বিশদ বিবরণ পাই।

মাম্ গোয়ালদাম সম্পর্কে লিখেছেন, 'We came, about mid-day, to the bungalow of Mr. & Mrs. Nash at Gwaldam,··· charmingly situated on a depression in the chain of hills that overlooks the Pindar river,······Trisui was now in sight, no longer seen as part of a ridge, but a single summit, its triple crest gleaming against the sky.'

ব্রুস লিখেছেন, 'The march beyond their estate (কৌশানী) brings one to the house of Mr. Nash who was equally kind, and has···for years travelled in Garhwal, and knows the Garhwali character well and appreciates it. Gwaldam, Mr. Nash's estate, is situated high above the Pindar river on the borders of Kumaon and Garhwal',

আমাদের দেখে মৈত্রমশাই বেরিয়ে এলেন বাইরে। বৈঠকখানায় এনে বসালেন আমাদের। তারপরে চায়ের ফরমাস দিতে ছুটলেন। ফিরে এসে

গল্প জুড়ে দিলেন। কথায় কথায় বলতে থাকলেন, "হ্যাঁ, সেকালের শ্রেষ্ঠ পর্বতারোহীদের পুণ্যস্মৃতি বিজড়িত এই বিশ্রাম ভবন।" হঠাৎ তিনি উঠে গেলেন ঘরের অপর প্রান্তে। ছোট টেবিলের ওপরে রাখা ভিজিটরস বুকটা নিয়ে এসে আমার হাতে দিয়ে বললেন, "এ বইটা ১৯৩২ সাল থেকে আরম্ভ হয়েছে। দুর্ভাগ্য আমাদের তার আগের বইখানি নেই এখানে।"

"চৌকিদারকে জিজ্ঞেস করেছিলেন?" অসিতবাবু বলেন।

"হ্যাঁ, সে কোন হদিশ দিতে পারেনি। সে যাকগে, এ বইটাও বহু মূল্যবান। খুললেই বুঝতে পারবে।"

অসিতবাবু আমার কাছে আসেন, আমি বই খুলি—প্রথম দিকেই রয়েছে তারিখ ৩১. ৫. ৩২, প্রথম স্বাক্ষরটি Marcel Kurz, দ্বিতীয়টি পড়া যাচ্ছে না। মার্শেল কুর্জ বিখ্যাত গ্রন্থ 'Himalayan Chronicle'-এর রচয়িতা। কুর্জ হিমালয় ও আলপ্‌সের একজন বিশেষজ্ঞ ছিলেন।

তার খানিক পরে দুটি স্বাক্ষর রয়েছে—H. W. Tilman ও E. E. Shipton, তারিখ—১৩. ৫. ৩৪। নন্দাদেবী শিখরের পথ আবিস্কার করার জন্য সেবারে টিল্‌ম্যান এসেছিলেন এখানে। তাঁদের সঙ্গে দুজন শেরপা ছিল। সেবারে তাঁরা নন্দাদেবীর রক্ষাপ্রাচীরের ভেতরে প্রবেশ করে একটি মানচিত্র অঙ্কন করেছিলেন। 'Two Mountains and a River' গ্রন্থে টিল্‌ম্যান এবং শিপটন 'Upon that Mountain,' ও 'Nanda Debi' গ্রন্থে সে অভিযানের কথা লিখে গেছেন।

পরবর্তী উল্লেখযোগ্য তারিখটি—৩০. ৫. ৩৬, লেখা আছে—Tilman with W. F. Loomis. সেবারে টিল্‌ম্যান এসেছিলেন নন্দাদেবী শৃঙ্গে আরোহণ করতে। লুমিস ছিলেন তাঁর প্রধান সহকারী। অভিযানের আয়োজন সম্পূর্ণ করতে তিনি আগেই রানীক্ষেত এসেছিলেন। ২৮শে মে টিল্‌ম্যান রানীক্ষেত আসেন। পরদিনই রওনা হন গরুড়ের পথে। ৩০শে মে তাঁরা গোয়ালদাম পৌছান। সেই যাত্রা ও গোয়ালদাম সম্পর্কে টিল্‌ম্যান তাঁর 'Ascent on Nanda Devi' গ্রন্থে লিখেছেন যে, 'I remembered, the march to Gwaldam in 1934 was a grim affair, for it was a gruelling hot day in May, and when we finally crawled into the bungalow we were more dead than alive...Gwaldam bungalow is a poor place, at least for a party of six.'

ছজন অভিযাত্রীর মধ্যে টিল্‌ম্যান কেন দুজনের নাম লিখলেন জানি না। তবে ফেরার পথে তিনি ভিজিটরস্ বুকে সবার নাম লিখে রেখে গেছেন। সহযাত্রী ওডেলকে সঙ্গে নিয়ে টিল্‌ম্যান ২৯শে আগস্ট (১৯৩৬) নন্দাদেবী শিখরে আরোহণ করেন। পাঁচজন অভিযাত্রী ও দুজন শেরপাকে নিয়ে টিল্‌ম্যান ১০ই জুলাই গোয়ালদাম ফিরে আসেন। ঐ তারিখ দিয়ে ভিজিটরস্ বুকে লেখা আছে—T. Graham Brown, N. E. Odell, P. Lloyd, W. F. Loomis, Chas. Houston. লেখা দেখে মনে হয় টিল্‌ম্যান নিজেই সহযাত্রীদের নাম লিখেছেন। কিন্তু সবার নাম লেখার পরে তিনি বোধ করি নিজের নামটি লিখতে ভুলে গেছেন।

তার পরের লেখাটি সব চেয়ে স্মরণীয়—

'I camped out'. F. S. Smythe—5. 6. 37

দার্শনিক সাহিত্যিক উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী প্রকৃতি-প্রেমিক ও পর্বতারোহী ফ্রাঙ্ক এস. স্মাইথ। ১৯৩১ সালে কামেট শৃঙ্গে আরোহণ করার পরে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়ে স্মাইথ সহযাত্রী হোল্‌ডসওয়ার্থের সঙ্গে আকস্মিক ভাবে এক রমণীয় উপত্যকায় উপস্থিত হন। দেওমাংরী চাঁদনী-চক, সপ্তশৃঙ্গ ও সিংহ পর্বত পরিবেষ্টিত এবং পলিগোনাম পোটেনটিলা, জেনসিয়ান রডোডেনড্রন, ফেণকমল হেমকমল ও ব্রহ্মকমল পরিশোভিত আর নন্দাবতী বিধৌত এই উপত্যকা তাঁকে নন্দন-কাননের কথা স্মরণ করিয়ে দিল। তিনি এই উপত্যকার নাম রাখলেন—Valley of Flowers আর হোলড্‌সওয়ার্থ—Flora Valley. তবে স্মাইথ সেবারে বাস করতে পারলেন না নন্দন-কাননে। তাঁকে ফিরে যেতে হল দেশে। কিন্তু তাঁর মন পড়ে রইল নন্দন-কাননে। তাই ছ বছর পরে স্মাইথ আবার ফিরে এলেন ভারতে। এই পথে গেলেন নন্দন-কাননে। যাবার সময় তিনি একটি রাত কাটিয়ে গেছেন গোয়ালদামে। কিন্তু প্রকৃতি-প্রেমিক স্মাইথ বিশ্রাম ভবনের চার দেয়ালের মাঝে বন্দী করেননি নিজেকে। বিশ্রাম ভবনের বাইরে গোয়ালদামের উদার অনন্ত প্রকৃতির কোলে তাঁবু খাটিয়ে রাত কাটিয়েছেন।

সেবারে স্মাইথ তাঁবু খাটিয়ে বহুদিন ছিলেন নন্দন-কাননে। তারপরে দেশে ফিরে গিয়ে লিখেছেন তাঁর জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থ, 'The Valley of Flowers.' এই গ্রন্থে তিনি গোয়ালদাম সম্পর্কে লিখেছেন—

'So at last, after ten miles' walk (গরুড় থেকে) and an ascent

of some 4,000 feet, I emerged from the forest on to the ridge where the bungalow stands overlooking the haze-filled depths of the Pindar Valley to the remote gleam of the Himalayan snows'.

পরের উল্লেখযোগ্য স্বাক্ষরটি—Lady Joan Legge, তারিখ ২৫. ৫. ৩৯। স্মাইথের জন্যই তিনি এসেছিলেন এখানে। জোয়ান মার্গারেট লেগী ছিলেন কিউ-য়ের রয়াল বটানিক্যাল গার্ডেনসের একজন বটানিস্ট। স্মাইথের 'দি ভ্যালী অভ্ ফ্লাওয়ার্স' পড়ে তিনি এসেছিলেন এদেশে। এই পথে ছুটে গিয়েছিলেন নন্দন-কাননে, কিন্তু আর ফিরে আসেননি গোয়ালদামে—ফিরে যাননি নিজের ঘরে। ৪১ দিন পরে, ৪ঠা জুলাই তারিখে, তিনি তার মানস-কাননেই শেষ শয্যা পেতেছেন। আজও নন্দন-কাননে তাঁর সমাধিক্ষেত্রটি দর্শনার্থীদের মনে গভীর রেখাপাত করে।

ঠিক চার মাস পরে অর্থাৎ ২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখে একদল সুইস দেশীয় পর্বতাভিযাত্রী এসেছিলেন এই বিশ্রাম ভবনে। তাঁদের স্বাক্ষর আছে ভিজিটর্স বুকে—A. Roch, Steuri, D. Zogg, E. Huber.

আট বছর পরে ১৯৪৭ সালে আর একদল অভিযাত্রীর সঙ্গে আঁদ্রে রশ আবার এসেছিলেন এখানে। সেবারে তাঁরা কেদারনাথ শৃঙ্গে আরোহণ করেন। তেনজিং নোরগে তাঁদের সঙ্গে ছিলেন। কিন্তু তাঁর নাম নেই ভিজিটর্স বুকে। অন্যান্য অভিযাত্রীরা স্বাক্ষর করেছেন—

Mme. Lohner, R. Rahaul—10. 9. 47.

Alex Graven, Alfred Sutter—14. 9. 47.

Rene Dittert, Andre Roch—17. 9. 47.

১৯৫০ সালের ১২ই মে ভিজিটর্স বুকে সই করেছেন—T. D, Mackinnon, W. S. Murray, D, Scott ও T. Weir. এই অভিযাত্রীদল কুমায়ুন হিমালয়ের কয়েকটি দুর্গম পর্বতশৃঙ্গে অভিযান চালিয়েছেন। একটিতেও সফলকাম হতে পারেননি। কিন্তু মারে 'Scottish Himalayan Expedition' নামে সেই বিফল অভিযানের একখানি উল্লেখযোগ্য বই লিখে গেছেন। তিনি গোয়ালদাম সম্পর্কে লিখেছেন, 'On the hill top above Gwaldam Village, we found the forest rest house. A belvedere of lawn and rose garden fronted the building, commanding great

spaces over the Pindar Valley on the Wan Pass to the snows of Nanda Ghunti and Trisul.' গোয়ালদামের প্রকৃতি তাঁকে স্কটল্যাণ্ডের প্রকৃতির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। এখানে এসে তাঁরা মাতৃভূমির স্পর্শ পেয়েছেন। এই বিশ্রাম ভবনের অবস্থা দেখে তাঁরা উচ্ছ্বসিত হয়েছেন, 'beauty of setting is extraordinary, causing us to exclaim time and again that nothing like this could be seen in the Alps and to bewail that so few Indians of the plains have any conception of the untold beauty of their own country.' দুঃখের কথা, এ মন্তব্যটি আজও মিথ্যে নয়।

তার পরে এখানে এসেছেন নিউজিল্যাণ্ডের এক অভিযাত্রী দল। তাঁরা ১৯৫১ সালের ১লা জুনের তারিখ দিয়ে স্বাক্ষর করেছেন—W. G. Lowe, E. M. Colter, H. E. Reddiford, E. P. Hillary. বঙ্গের বিখ্যাত পর্বতারোহী কে. এফ্. বুন্‌শাও সই করেছেন এদের সঙ্গে।

ফেরার পথে ২২শে আগস্ট তাঁরা আবার সই করেছেন খাতায়। কিন্তু বুন্‌শার সই নেই তাঁদের সঙ্গে।

ভিজিটর্‌স বুকের শেষ উল্লেখযোগ্য নাম সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ হিমালয় অভিযাত্রী Dr. T. S. Longstaff. প্রবীণ হিমালয়-পথিক পুত্র সি. সি. লংস্টাফের সঙ্গে বেড়াতে এসেছেন গোয়ালদাম। পুত্রই পিতাপুত্রের নাম দুটি লিখে রেখেছেন।

"আরে এদিকে যে তোমাদের দেরি হয়ে যাচ্ছে। তা ছাড়া চাও জুড়িয়ে গেল।"

মৈত্রমশায়ের কথায় খেয়াল হয় আমাদের। খাতাটি বুজিয়ে চা-য়ে চুমুক দিই। চা ও জলখাবার শেষ করে মৈত্রমশায়ের কাছ থেকে বিদায় নিই। বেরিয়ে আসি হিমালয় অভিযানের পরমতীর্থ গোয়ালদাম বনবিশ্রাম ভবন থেকে। এখানকার ধূলিকণার সঙ্গে মিশে আছে বিশ্ববিখ্যাত পর্বতাভিযাত্রীদের পদধূলি, মিশে আছে তাঁদের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না ও আশা-নিরাশার স্মৃতি। সেই সুমহান স্মৃতি-বিজড়িত পুণ্যতীর্থকে প্রণাম করে আমরা ফিরে চলেছি ডাকবাংলোয়।

মনটি কিন্তু পড়ে আছে ওখানে। ভেবে চলেছি সেই সব বিশ্ববিখ্যাত পর্বতারোহীদের কথা। আর তাঁদের সঙ্গে মনে পড়ে রাধানাথ সিকদার ও শরৎ

চন্দ্র দাসের কথা। তাঁদের স্বাক্ষর নেই বিশ্রাম ভবনের খাতায়, কিন্তু তাঁদের দুজনের প্রতি শ্রদ্ধা না জানিয়ে কোন হিমালয়কাহিনী রচিত হতে পারে না।

রাধানাথ তখন সবে হিন্দু কলেজে ছাত্রজীবন শেষ করেছেন। কলেজের গণিতের অধ্যাপক টাইটলারের কাছে এক চিঠি এলো তৎকালীন সার্ভেয়ার জেনারেল অভ্ ইণ্ডিয়া ও বিশিষ্ট গণিতজ্ঞ স্যার জর্জ এভারেস্টের কাছ থেকে। এভারেস্ট ট্রিগনোমেট্রিক্যাল সার্ভে অভ্ ইণ্ডিয়ার অফিসে কাজ করার জন্য তিনি একজন মেধাবী ছাত্রকে চেয়ে পাঠিয়েছেন। অধ্যাপক টাইটলার তাঁর প্রিয় ছাত্র রাধানাথকে পাঠিয়ে দিলেন এভারেস্টের কাছে। ১৮৩২ সালে তরুণ রাধানাথ সার্ভে বিভাগে প্রবেশ করলেন। কিছুদিনের মধ্যে তিনি জর্জ এভারেস্টের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেন। রাধানাথের অসামান্য প্রতিভার প্রসঙ্গে স্যার জর্জ বিলেতে লিখলেন, রাধানাথ অঙ্কে যে রকম বুৎপত্তি লাভ করেছে তাতে তার মত পণ্ডিত ভারতবর্ষে তো বটেই ইয়োরোপেও বিরল।

জর্জ এভারেস্ট Ray Trace System নামে এক নতুন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে জরিপ কার্য শুরু করেন। রাধানাথ কিছুদিনের মধ্যেই এ পদ্ধতি শিখে নিলেন। স্যার জর্জ তাঁকে হিমালয়ে পাঠালেন। কারণ পার্বত্য অঞ্চলের জরিপ করা সমতলের চেয়ে অনেক বেশি কঠিন। এ কাজে তখন তাঁর চেয়ে যোগ্যতর ব্যক্তি ছিল না। এই সময় স্যার এভারেস্ট রাধানাথের বাবা তিতুরামকে লিখেছিলেন—দয়া করে একবার দেরাদুন আসুন। এসে দেখে যান, রাধানাথের মত পুত্রের পিতা হওয়া কতখানি গৌরবের।

১৮৪৩ সালে স্যার জর্জ অবসর গ্রহণ করেন। কর্নেল অ সার্ভেয়ার জেনারেল নিযুক্ত হন। তিনিও রাধানাথকে খুবই ভালবাসতেন।

১৮৪৯ সালে রাধানাথ এভারেস্ট শিখরের উচ্চতা নির্ণয় শুরু করেন ও ১৮৫২ সালে গণনা শেষ করেন। সে দিনটি হিমালয়ের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। গণনা শেষ করেই তিনি ছুটে এলেন সার্ভেয়ার জেনারেলের ঘরে। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, 'I have discovered the highest mountain in the world.' এই আবিষ্কারের স্বীকৃতি স্বরূপ কর্তৃপক্ষ তাঁকে অবজারভেটারী সুপারিনটেনডেন্ট পদে নিযুক্ত করেন। কিন্তু বেশিদিন ঐ পদে অধিষ্ঠিত থাকতে পারেননি। ঈর্ষাকাতর ইংরেজ সহকর্মীদের শত্রুতায় ১৮৬২ সালে তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। তারপরে কুচক্রীরা রাধানাথের এই অসাধারণ কৃতিত্বকে ইতিহাস থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা করতে থাকে।

কিন্তু তাদের সেই প্রচেষ্টা সফল হয়নি। ইংলিশম্যান, ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া, পাইওনিয়ার ও স্টেট্‌সম্যান প্রভৃতি সেকালের সব বিখ্যাত দৈনিক পত্রিকায় শ্রদ্ধার সঙ্গে রাধানাথের এই অমর আবিষ্কারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। স্বীকার করেছেন বিভিন্ন হিমালয় অভিযাত্রীরা তাঁদের Mount Everest, The Reconnaisance 1921, First Over Everest ও Houston Mount Everest Expedition, 1933 গ্রন্থে। স্বীকার করেছেন রয়াল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটির সভাপতি ও সদস্য স্যার ফ্র্যান্সিস ইয়ং হাজব্যাণ্ড ও ক্যাপ্টেন নোয়েল। স্বীকার করেছেন হিমালয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রামাণ্য গ্রন্থ 'এ্যাবোড অব্ স্নো'-র প্রণেতা কেনেথ মেসন।

হিমালয়-প্রেমিক রাধানাথ বিবাহ করেননি। পদত্যাগের পরে তিনি বিজ্ঞান ও সাহিত্য সাধনায় ব্রতী হন। ১৮৫৪ সালের ১৬ই অগাস্ট প্যারীচাঁদ মিত্রের সহযোগিতায় চলিত ভাষায় প্রথম বাংলা সাময়িক 'মাসিক পত্রিকা' প্রকাশ করেন। তিনি যেমন ল্যাটিন ও গ্রীক গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ করেছেন, তেমনি জরিপ এবং গণিতেরও কয়েকখানি পুস্তক প্রণয়ন করে গেছেন। তিনি তৎকালীন বহু সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ১৭ই মে সাতান্ন বছর বয়সে রাধানাথ দেহত্যাগ করেন।

রাধানাথের পরেই হিমালয় প্রসঙ্গে যে বীর বাঙ্গালীর কথা মনে পড়ছে, তাঁর নাম শরৎচন্দ্র দাশ। রাধানাথ বিশ্বের উচ্চতম গিরিশৃঙ্গ মাউণ্ট এভারেস্ট আবিষ্কার করেছিলেন আর শরৎচন্দ্র সহযাত্রী হরিরামের সঙ্গে মাউণ্ট এভারেস্টের সবচেয়ে কাছে পৌঁছেছিলেন। পরবর্তীকালে এভারেস্ট অভিযাত্রী ক্যাপ্টেন জে. বি. নোয়েল তাঁরই উল্লেখিত পথে এভারেস্ট অভিযানের পরিকল্পনা করেছিলেন। তিনি লিখেছেন, 'I planned the route from the writings of Sarat Chandra Das…journey of Hariram and that of Sarat Chandra Das were the nearest approaches made to Mount Everest.' তিনি শরৎচন্দ্রকে 'The hardy son of soft Bengal' বলে অভিহিত করেছেন।

সে যুগে শরৎচন্দ্র হিমালয়ের এমন উচ্চতায় উপস্থিত হয়েছিলেন, যেখানে তাঁর আগে আর কেউ পৌঁছতে পারেননি। তিনি বিনা সাজ-সরঞ্জামেই এই উচ্চতায় আরোহণ করতে সমর্থ হন। শরৎচন্দ্র তাঁর তিব্বতী ভাষা-শিক্ষক ও বন্ধু

উগায়েন গিয়াৎস্থ ও শেরপা ফরচুন্জের সঙ্গে ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে সিকিম হয়ে নেপালের কাং লা গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করেন। তারপরে কাংবাচেন উপত্যকা অতিক্রম করে ২০২০০ ফুট উঁচু জংসং লাতে পৌছান। সেখান থেকে ছোর্টেন নিমা গিরিপথ দিয়ে তাঁরা তিব্বতের শিগাৎসে পৌছান। এই দুঃসাহসিক অভিযানের কথাপ্রসঙ্গে ফ্রাঙ্ক স্মাইথ লিখে গেছেন—'This is one of the boldest journeys on record in that part of the world, and crossing of the Jongsong La, a high glacier pass, was a great feat.

দু বছর বাদে ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে শরৎচন্দ্র কাংবাচেন গ্রামের উত্তরদিকে অবস্থিত নাংগো গিরিপথ অতিক্রম করে লাসায় গিয়েছিলেন। দুটি অভিযানেই তিনি এভারেস্টের ৪০/৪৫ মাইলের মধ্যে পৌছেছিলেন। ১৮৮৫ সালে তিনি তিব্বত হয়ে পিকিং যান।

১৮৮৭ সালে তিনি বিলেতের রয়েল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটির পুরস্কার পান। দু বছর বাদে এই সোসাইটি তাঁর তিব্বত ভ্রমণকাহিনী প্রকাশিত করেন। ১৯০২ সালে Tibetan English Dictionary লেখা শেষ করেন। শরৎচন্দ্র এই অভিধানে তাঁর দুঃসাহসিক অভিযানসমূহ এবং তৎকালীন তিব্বতের ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, প্রত্নতাত্ত্বিক, ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গেছেন। এই গ্রন্থখানি আজও হিমালয় সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ বলে বিবেচিত। ১৯১৭ সালের ৫ই জানুয়ারী ৬৮ বছর বয়সে তিনি পরলোকে গমন করেন।

ডাকবাংলোয় ফিরে এসে দেখি বীর সিং ও রামচাঁদ এসে গেছে। কিন্তু ঘোড়াওয়ালা আসেনি এখনও। আমাদের দেখে রামচাঁদ ধমক লাগায়, "কোথায় ছিলেন এতক্ষণ?"

"একটু বিশ্রাম-ভবনে গিয়েছিলাম।" অসিতবাবু বিচলিত।

"কেন?"

"এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করতে।"

"দেখাটেখাগুলো কাল সেরে রাখতে পারেননি? কাল তো সারাদিন ছিলেন এখানে।" রামচাঁদ কৈফিয়ত চায়।

অসিতবাবুর অবস্থা দেখে দুঃখ হচ্ছে। রামচাঁদকে বলি, "কিন্তু তোমার

ঘোড়াওয়ালা যে এখনও আসেনি।"

"আসেনি। তবে যদি এসে যেত!"

ও হরি! যদি এসে যেত, তা হলে কি হত—তাই ভেবে এতক্ষণ আমাদের শাসন করছিল আমাদের পথপ্রদর্শক। তবু চুপ মেরে যেতে হয়। জলে নেমে কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করা চলে না।

যে কারণেই রামচাঁদ আমাদের শাসন করে থাক, তার সকল অনুমান ব্যর্থ হল। আধঘণ্টা কেটে গেল তবু ঘোড়াওয়ালা দর্শন দিল না। ইতিমধ্যে ত্রিশুল রুপোলী রং ধারণ করতে শুরু করেছে। তার গায়ের কলঙ্কচিহ্ন কটি অদৃশ্য হয়েছে। সে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হচ্ছে। এর পরেই সে তপ্ত ত্রিশুলের রূপ নেবে। সেই অপরূপ সংহার রূপের সামনে বিশ্বসংসারের অশুভ শক্তি মাথা নত করবে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে অপরূপকে দর্শন করার সৌভাগ্য হল না আজ। সুজল ও মোহিত দাঁড়িয়েছিল পথের ধারে। হঠাৎ ওরা চেঁচিয়ে উঠল, "এসে গেছে!"

আমরাও বারান্দা থেকে ছুটে এলাম ওদের কাছে। হ্যাঁ, সত্যই সস্ত্রীক ঘোড়াওয়ালা এসে গেছে। কিন্তু তার তো চারটি ঘোড়া আনার কথা। পাঁচটা এনেছে কেন? নিশ্চয়ই কারণ আছে। কিন্তু কি কারণ? এলেই জানা যাবে।

ওরা উঠে এল ওপরে। ঘোড়াগুলো দাঁড় করালো বারান্দার সামনে। আশ্চর্য, রামচাঁদ এই অস্বাভাবিক বিলম্বের জন্য একটুও শাসন করল না তাকে। বরং মুচকি হেসে স্বামী-স্ত্রীকে অভিনন্দিত করল। অসিতবাবু জিজ্ঞেস করেন রামচাঁদকে, "চারটে ঘোড়া আনার কথা ছিল, পাঁচটা এনেছে কেন?"

"দরকার আছে বলে।" রামচাঁদ জবাব দেয়।

"মানে?" অসন্তুষ্ট অসিতবাবু জিজ্ঞেস করেন।

"মানে, কাল রাতে আপনাদের মালের বহর দেখে আমিই ওকে পাঁচটা ঘোড়া আনতে বলেছি।"

"কিন্তু মালপত্র সব ওজন করে দেখেছি, চারটার বেশি ঘোড়ার দরকার নেই আমাদের।"

সহসা হেসে ফেলে রামচাঁদ। অসিতবাবু অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন। হাসি থামিয়ে রামচাঁদ বলে, "ওজন দিয়েই যদি ঘোড়ার হিসেব করা যেত, তা হলে

তো কথাই ছিল না। ঘোড়া বা কুলির হিসেব করার সময় মালের চেহারাটাও মনে রাখতে হয়।"

অসিতবাবু চুপ করে থাকেন। বুঝতে পারেন, যুক্তির জাল বিস্তার করা বৃথা। কারণ আমাদের মাল সবই ছোট ছোট কিটব্যাগে। তাদের চেহারা মোটেই ভয়াবহ নয়। তা ছাড়া রামচাঁদ কাল রাতে তো মালপত্র দেখেনি। আসলে আমাদের রামচাঁদ ঘোড়াওয়ালার বাড়তি আয়ের ব্যবস্থা করছে। যে রক্ষক সেই যদি ভক্ষক হয়, তাহলে চুপ করে থাকা ছাড়া উপায় কি?

বীর সিং মালপত্র সব বুঝিয়ে দেয় ঘোড়াওয়ালাকে। রামচাঁদ গিয়ে ঘোড়াওয়ালাকে সাহায্য করতে থাকে। কিছুক্ষণ বাদে অসিতবাবু বলেন তাকে, "আর তো এখানে আমাদের কোন দরকার নেই। বেলা নটা বাজে। চোদ্দ মাইল হাঁটতে হবে আজ। আমরা কি আস্তে আস্তে এগোতে থাকব?"

"আস্তে কেন জোরেই যান না।" একবার হাসে রামচাঁদ। "আমরা আপনাদের ধরে ফেলব।"

"কিন্তু আমাদের সঙ্গে কেউ না গেলে..." অসিতবাবু শেষ করতে পারেন না।

"আমি গেলে, এদিকে দেখবে কে? আর সঙ্গে যাবার দরকারই বা কি?" রামচাঁদ যেন বিস্মিত হয়।

"আমরা যে রাস্তা চিনি না।"

"চিনবার কি আছে? সোজা রাস্তা।"

"তা হলেও তোমাদের একজনকে আমাদের সঙ্গে যেতে হবে। আমরা বীর সিংকে নিয়ে যাচ্ছি, তুমি ঘোড়ার সঙ্গে এসো।"

অসিতবাবুর কণ্ঠস্বর শুনে রামচাঁদ বোধ করি আর অমত করতে সাহসী হয়না। বলে, "বেশ বীর সঙ্গে যাক আপনাদের। আমি আসছি পেছনে। আপনারা দেখছি পাহাড়ী পথকে বড়ই ভয় করেন।"

আমরা ওর উক্তির কোন প্রতিবাদ না করে বীর সিংকে নিয়ে রওনা হই নিচে।

বাস স্ট্যাণ্ডে এসে দেখি শার্দূলালজী সহ সবাই অপেক্ষা করছেন আমাদের জন্য। অপেক্ষা করছেন আমাদের বিদায় দিতে—দুর্গম পথযাত্রার প্রাক্কালে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাতে। ওদের সবার সঙ্গে আমাদের পরিচয় পর্যন্ত নেই। যাঁদের সঙ্গে সামান্য পরিচয় হয়েছে তাঁরাও মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা আগে আমাদের

অপরিচিত ছিলেন। অথচ পরমাত্মীয়ের মত তাঁরা করমর্দন করেন, আলিঙ্গন করেন। শুভার্থীদের সকল শুভেচ্ছা সম্বল করে আমরা এগিয়ে চলি উৎরাই পথে। চলি নন্দকিশোরী দেবল ও বগরিগড়ের পথে, দুর্গম গিরি-কান্তারের পথে।

॥ এগারো ॥

গোয়ালদাম বাজার পড়ে রইল ডানদিকে, আমরা বাঁদিকের উৎরাই পথে চললাম এগিয়ে। সবার আগে চলেছেন দেবকাঁদা ও অমিতাভ। সবার শেষে সুজল মোহিত ও দাশু। মাঝখানে আমি অসিতবাবু ও বীর সিং। আমরা চলেছি রূপকুণ্ডে। গোয়ালদাম থেকে ৪৩½ মাইল। তিনটি ভাগে বিভক্ত এই পদযাত্রা—গোয়ালদাম থেকে ওয়ান, ওয়ান থেকে বাগুয়াবাসা কিংবা হুণিয়াথর, সেখান থেকে রূপকুণ্ড। গোয়ালদাম থেকে ওয়ান ২৫ মাইল। সেখান থেকে বাগুয়াবাসা ১৫ মাইল। আর বাগুয়াবাসা থেকে রূপকুণ্ড যাওয়া আসা ৭ মাইল। পঞ্চম দিনে পৌঁছনো যায় সেই মরণ-হ্রদের তীরে। আমাদের বেশি লাগবে। কারণ উপেনবাবুর জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে ওয়ানে। গোয়ালদামের উচ্চতা ৬৫০০ ফুট, রূপকুণ্ড ১৬,৫০০ ফুট। অর্থাৎ দশ হাজার ফুট ওপরে উঠতে হবে আমাদের কিন্তু চড়াই ভাঙতে হবে অনেক বেশি। আজই আমরা দু হাজার ফুট নেমে প্রথম যাচ্ছি ৪৫০০ ফুট উঁচু নন্দকিশোরীতে। তারপরে আবার দেড় হাজার ফুট চড়াই ও পাঁচশ ফুট উৎরাই ভেঙে পৌঁছব ৫৫০০ ফুট উঁচু বগরিগড়ে। গোয়ালদাম থেকে নন্দকিশোরী ৪ মাইল, সেখান থেকে দেবল ২ মাইল। দেবল থেকে বগরিগড় ৮ মাইল।

ফুট চারেক প্রশস্ত পথ। চীড় ও দেওদার বনের মধ্য দিয়ে স্যাঁতস্যাঁতে উৎরাই পথ। পথের দুধারে ভুট্টা ও রামদানার ক্ষেত। এরা রামদানাকে বলে চুয়া। হিমাচলেও দেখেছি তাই বলে। মাঝে মাঝে বাড়িঘর। ঘরের মানুষরা আমাদের দেখে পথের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। সবিনয়ে তারা আমাদের জিজ্ঞেস করে, আমরা কোথা থেকে এসেছি, কোথায় যাচ্ছি?

উত্তর শুনে খুশি হয়। একে অন্যের মুখের দিকে তাকায়। তারপরে হাত

জোড় করে নিজেদের জীবন দেবতার কাছে আমাদের নির্বিঘ্ন যাত্রার জন্য সকরুণ আবেদন জানায়। ওদের আন্তরিক শুভেচ্ছাকে সশ্রদ্ধ চিত্তে গ্রহণ করে আমরা এগিয়ে চলি।

উৎরাই পথে নেমে আসার পর থেকে আর ত্রিশুলকে দেখতে পাচ্ছি না। দেখতে পাচ্ছি না তুষারমৌলি হিমালয়কে। সামনের বনের আড়ালে সে অদৃশ্য হয়েছে। অথচ ত্রিশুলের পদপ্রান্তে পৌঁছবার জন্যই আমাদের এই পদযাত্রা। দূরকে কাছে পেতে হলে, তাকে ক্ষণেকের তরে আরও দূরে ঠেলে দিতে হয়। পাওয়া আনন্দের, কিন্তু হারিয়ে পাওয়া পরমানন্দের। বিরহহীন মিলন অসম্পূর্ণ।

সাধারণতঃ হিমালয়ের পথ হয় নদী কিংবা ঝর্ণার ধার দিয়ে। কিন্তু আমরা এখন পর্যন্ত নদী পাইনি পথে। আমরা চলেছি তেমনি সঙ্কীর্ণ ও উৎরাই বন-পথে।

বেশ কিছুদূর এগিয়ে একটি বড় ঝর্ণার পারে এলাম। এখানেই সাক্ষাৎ হল নির্মিয়মাণ মোটরপথের সঙ্গে। জায়গাটার নাম চিরঙ্গা—একটি ছোট গ্রাম। হাঁটাপথে গোয়ালদাম থেকে তিন মাইল। কিন্তু মোটরপথ এসেছে দশ মাইল ঘুরে। মোটরপথ যাচ্ছে গোয়ালদাম থেকে দেবল। অদূর ভবিষ্যতে রূপকুণ্ড-পথযাত্রীদের আর সাতাশি মাইল চড়াই উৎরাই ভাঙতে হবে না। হিমালয়যাত্রীদের কাছে গোয়ালদামের মূল্য যাবে কমে।

ছোট কাঠের পুল পেরিয়ে আমরা সেই সঙ্কীর্ণ স্রোতস্বিনীর অপর তীরে এলাম। এগিয়ে চললাম উৎরাই পথে। পথ ও প্রকৃতি রইল অপরিবর্তিত। তেমনি গহন বনের মধ্য দিয়ে সঙ্কীর্ণ স্যাঁতস্যাতে পথ। একটি লোক নালা থেকে সাতটা ছোট ও মাঝারি মাছ ধরেছে। দেখে আর লোভ সামলাতে পারে না সুজল। বলে, "একবেলা বেশ ভাল চলে যাবে আমাদের।" তারপরেই লোকটিকে জিজ্ঞেস করে, "কত দিতে হবে ভাই?"

"দেড় টাকা।"

সুজল লাফিয়ে ওঠে। বাংলায় বলে "অসিতদা, মোটে দেড় টাকা চাইছে, নিয়ে নেওয়া উচিত।"

নির্দয় নেতা সম্মত হন না। বলেন, "বগরিগড় এখনও এগারো মাইল। কখন পৌঁছব ঠিক নেই। অযথা মাছগুলো পচিয়ে কি হবে বলতে পারিস?"

অকাট্য যুক্তি। সুজল প্রতিবাদ করতে পারে না। সে বেজার মুখে

এগিয়ে চলে।

একটু এগিয়েই চড়াই পথের দেখা পেলাম। চড়াই ও উৎরাই দুইকে নিয়েই হিমালয়ের পদযাত্রা। এর একটিকে বাদ দিয়ে অপরটি অসম্পূর্ণ। তাই যে কোন একটির অভাবে পদযাত্রী পথের প্রেরণা হারিয়ে ফেলে। কেবল চড়াইয়ের মত কেবল উৎরাইকেও ভাল লাগছিল না আমাদের। এবারে চড়াই পেয়ে খুশি হলাম। তবে চড়াই বড়ই সহজ। তবু ভাল লাগছে—'নেই-মামার চেয়ে কানা-মামা ভাল।'

একটু এগিয়েই একটা নদী। নদীর ওপরে পুল নেই। থাকার দরকারও নেই, কারণ নদীতে জল নেই। জলের নয়, পাথরের নদী। পাথরের ফাঁকে ফাঁকে কোথাও কোথাও একটি দুটি ক্ষীণ জলরেখা বয়ে যাচ্ছে ছলছল করে। পাথর থেকে পাথরের ওপরে সাবধানে পা ফেলে, জিমনাস্টিকের কসরৎ করে, প্রভূত পরিশ্রমের পরে আমরা পাথুরে নদী পেরিয়ে এলাম।

আমরা পেরিয়ে এলাম নির্বিঘ্নে। কিন্তু পাথর ডিঙোতে গিয়ে পড়ে গেলেন অসিতবাবু। আর সঙ্গে সঙ্গে ঘটল দুর্ঘটনাটা। তাঁর হাতখানি খুলে এলো কাঁধ থেকে। ছোটবেলায় কুস্তি করতেন অসিতবাবু। কুস্তির সময় একদিন তাঁর হাতখানি খুলে যায়। এখনও ঠিকমত জোড়া লাগেনি। আকস্মিক চোট লাগলেই এমনি হয়। আমি খুবই বিচলিত হয়ে পড়ি। কিন্তু বিচলিত হলেন না অসিতবাবু। প্রথমে তাঁর পিঠ থেকে রুকস্যাকটা খুলে নিতে বললেন, তারপরে নিজেই ভাঙ্গা হাতখানি চেপে ধরলেন কাঁধের সঙ্গে। সুজল ও দাশু ছুটে গিয়ে হাতখানি ধরল। কিছুক্ষণ চেষ্টার পরে হাতটা আবার কাঁধে লেগে গেল। আমরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। অসিতবাবু হাসতে হাসতে এগিয়ে চললেন। বীর সিং তাঁর রুকস্যাকটা তুলে নিল নিজের কাঁধে।

বেলা এগারোটার সময় আমরা নন্দকিশোরীতে পৌছলাম। পিণ্ডার নদী বিধৌত বৰ্দ্ধিষ্ণু গ্রাম নন্দকিশোরী। পিণ্ডারের বেলাভূমি বড়ই সুন্দর। দু তীরেই খড়িমাটি। মনে হয় শ্বেতপাথর। মাঝখানে বয়ে যাচ্ছে সুনীল জলরাশি। মনে হচ্ছে মর্ম[illegible] সদাচঞ্চল নীলধারা।

নদীর তীরে শিব ও ভগবতী[illegible]র মন্দির। প্রাচীনতর একটি পাথর বাঁধানো বটবৃক্ষের ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে মন্দির[illegible] মন্দিরে রয়েছে কয়েকটি কষ্টিপাথরের প্রতিমূর্তি। জন্মাষ্টমী ও নন্দাষ্টমীতে মেলা বসে মন্দির[illegible]

পথের পাশে কয়েকটি চা ও ভাজির দোকান। দোকানের সামনে কাঠের

বেঞ্চি। তারই ওধারে বসে ছোলাভাজা ও চা খেয়ে নিই। একটু বিশ্রাম করে আবার পথ চলা শুরু করি।

নন্দকিশোরী চারিপাশের গ্রামসমূহের বাণিজ্যকেন্দ্র। থরালী ও গোয়ালদাম থেকে মহাজনরা মাল নিয়ে-আসেন এখানে। এখান থেকে চালান যায় চারি-পাশের গ্রামে। গ্রামবাসীদের পোশাক-পরিচ্ছদ বেশ ভাল। এখানেও শাদীলালজীর মতো একজন দোকানদার-কাম-পোস্টমাস্টার রয়েছেন।

নন্দকিশোরীর পরে পথ কিছুদূর সমতল। তারপরে চড়াই। নন্দকিশোরী থেকে দেবল দু মাইল। দেবলের উচ্চতা ৬০০০ ফুট। তার মানে দু মাইলে আমাদের দেড় হাজার ফুট চড়াই ভাঙতে হবে।

একটু বাদেই আর একটি গ্রাম। বীর সিং দূরের একটি বাড়ি দেখিয়ে বলে, "ঐ আমার মকান।"

"তাই নাকি?" আমরা ভাল করে চেয়ে দেখি।

"চলুন না, একটু ঘুরে আসবেন।" বীর আমাদের নেমন্তন্ন করে।

কি বলব! গিরি-কান্তারের যাত্রী ঘরের কাছে এসেছে। মন বলছে, একবার ঘর থেকে ঘুরে এসো, ঘরণীকে দেখে যাও। কিন্তু নির্দয় আমাদের নেতা। মৃদু হেসে বীরকে বলেন, "এখন নয় বীর, দেরি হয়ে যাবে। সময় পেলে ফেরার পথে নিশ্চয়ই তোমার মকানে যাব।"

আবেগবিহীন নেতার সিদ্ধান্তে মনে মনে বীর যত ব্যথাই পাক, মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়ে সে বলে, "বেশ তাই হবে।" হাসতে হাসতেই এগিয়ে চলে বীর সিং। সব সময় ওর মুখে হাসি লেগে আছে। হাসতে পারা মানুষের মহৎ গুণ। কবিবর সুকুমার রায়ের 'রাম গরুড়' সকল দেশের, সকল কালের মানুষরের কাছে বিপদ স্বরূপ।

ছোট গ্রাম পূর্ণা। চারিদিকে চীরবন। পথের পাশে কোন দোকান নেই। আমরা গ্রাম ছাড়িয়ে এগিয়ে চলি।

ওপর দিয়ে আর একটি পথ। ঐ পথটিও লোহাজঙ্গ গেছে। কিন্তু ওপথে কোন দোকানপাট কিংবা লোকালয় নেই। তাই আম[illegible] পথ পরিহার করে মর্ত্যের পথে হেঁটে চলেছি।

পূর্ণার পরে [illegible]তে পরিবর্তিত হল। পথের পাশে রঙীন ক্ষেত। [illegible]শেষে বহুদূরে পাহাড়ের রেখা। বন ক্রমেই হালকা হচ্ছে।

নন্দকিশোরী পিণ্ডার ও কৈলু নদীর সঙ্গম। কৈলুর অপর নাম কালীগঙ্গা।

পিণ্ডার নদী পিণ্ডারী হিমবাহ থেকে সৃষ্ট হয়ে খাতি থেকে এসেছে নন্দকিশোরী। এখান থেকে চলে গেছে কর্ণপ্রয়াগ—অলকানন্দায় গিয়ে মিলিত হয়েছে। কর্ণপ্রয়াগে পিণ্ডার নদীর নাম পিণ্ডরগঙ্গা বা কর্ণগঙ্গা। এই নদীর তীর দিয়ে একটি হাঁটাপথ আছে। সেই পথে নন্দকিশোরী থেকে খাতি হয়ে পিণ্ডারী হিমবাহে পৌঁছনো যায়। খাতি থেকে পিণ্ডারী হিমবাহ পর্যন্ত নির্মাণ বিভাগের পথ আছে। রূপকুণ্ড থেকে ফিরে আমাদের পিণ্ডারী হিমবাহে যাবার কথা। কিন্তু আমরা এ পথে যাব না। আমরা আবার ফিরে যাব গোয়ালদাম, সেখান থেকে বাসে করে বাগেশ্বর। বাগেশ্বরে মেজর ও প্রাণেশ অপেক্ষা করবে আমাদের জন্য।

কৈলু নদী নন্দকিশোরীর পর থেকে চলেছে আমাদের সঙ্গে—পথের পাশে পাশে। নদী পাশে না থাকলে হিমালয়ের পথে পদচারণা করতে ভাল লাগে না। নদীর কুলুকুলু ধ্বনি জনহীন হিমালয় পথের আবহসঙ্গীত।

সেই স্বর্গীয় সঙ্গীত শুনতে শুনতে একসময় আমরা এসে পৌঁছলাম একটি বিদ্যালয় ভবনের সামনে। পাইন বনের ভেতরে সুন্দর একটি বাড়ি। বীর বলল, "এটি মেয়েদের স্কুল। এখান থেকেই দেবল গ্রাম আরম্ভ। আমরা গোয়ালদাম থেকে ছ মাইল হেঁটেছি।"

একটু এগিয়ে বাজার। দেবল বেশ বড় গ্রাম। এখানে ডাকঘর, বন বিশ্রাম ভবন, আয়ুর্বেদিক হাসপাতাল, পশু চিকিৎসালয় ও প্রসূতি সদন আছে। অনেক নিচে বয়ে যাচ্ছে কৈলু নদী। এসেছে কৈলু বিনায়ক থেকে। কৈলুর কোলে ছোট শিবমন্দির। শিবরাত্রির সময় মেলা মেলে মন্দির-চত্বরে।

আশ গোয়ালদাম আসার আগে হিমালয় অভিযাত্রীরা বৈজনাথ থেকে কুলান ও চিরঙ্গা হয়ে দেবল আসতেন। নৈনিতালের আবিষ্কর্তা পি. ব্যারন ১৮৪৩ সালে কুয়ারি গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করে এখানে এসেছিলেন। সেই যাত্রার কথা তিনি লিখে গেছেন তাঁর 'Notes of Wandering in the Himmala' গ্রন্থে। বইখানি ১৮৪৪ সালে আগ্রা থেকে প্রকাশিত হয়েছে। ব্যারন পর্বতাভিযাত্রী ছিলেন না। তিনি ছিলেন শিকারী। তিনি দেবলে মৎস্য শিকারের চেষ্টা করেছিলেন, 'I tried my luck with the fishing rod and fly; but the fish would not bite, and indeed they very seldom do in any of the streams.' শিকারী ব্যারন মৎস্য শিকারে ব্যর্থ হয়েছেন। কারণ এ অঞ্চলের মাছ ধরার গুপ্ত কৌশলটি তাঁর জানা ছিল না।

এটি বড়ই বিচিত্র। খরস্রোতা নদীনালায় পাথরের বাঁধ দিয়ে সেখানে একরকমের পাতা ফেলে রাখে। স্রোত এড়াতে দলে দলে মাছ ছুটে আসে সেই আশ্রয়ে। আর এসেই ঐ পাতা খায়। তার পরেই মরে ভেসে ওঠে। অথচ ঐ পাতা খেলে মানুষের কিছুই হয় না।

মাম্ দেবল সম্পর্কে লিখেছেন, 'Descending through the terraced tea plantations we entered Garhwal, crossed the river by a fine suspension bridge, and pitched camp at Dewal, a mile or two further up. Here we said good bye to houses, beds, table-cloths, and a good many other things for three months.'

বেলা একটা বাজে। ছ মাইল আসতে প্রায় চার ঘণ্টা লেগেছে। পদযাত্রার প্রথম দিন—আমরা ধীরে ধীরে পথ চলছি। তবু ক্লান্তি লাগছে। মাঝে মাঝেই চড়া রোদে হাঁটতে হয়েছে। রাস্তার নিচে একটা ঘর ভাড়া নিয়ে সেখানে এসে রুকস্যাক নামাই। তেল সাবান ও গামছা বের করে কলতলায় এসে জড়ো হই।

শীতল জলে স্নান সেরে শরীর স্নিগ্ধ হল—দেহের জ্বালা জুড়ালো। গরম গরম ভাত ডাল ও তরকারী খেয়ে পেটের জ্বালা মিটল। ঢেকুর তুলে আমরা আবার পদচারণা শুরু করি।

সুন্দর গ্রাম দেবল। চকচকে বাড়িঘর, ছায়াঘন পথ আর শুচিশুভ্র মন্দির।

স্কটিশ অভিযানের নেতা মোহিত হয়েছিলেন দেবলে এসে, 'On either side the hills rose to 10,000 feet, heavily wooded, but never giving us a 'shut in' feeling,···for the eye was at once drawn to a little promontory by the river and caught there by the brilliant white of a temple spire. It gave a lift to the mind and heart, causing head and eyes to lift in sympathy, until—how unexpectedly !—They beheld the snow spire of Trisul shining bright and sudden through the right-hand branch of the Kali. Nowhere else I have seen a temple sited with such inspiring effect. It is small and humble, its white cone catching the sunshine and pointing up, up to where Trisul is, pointing too, pure white too, the one no more beautiful

than the other and no less holy.' আমরা শুধু মন্দির-শীর্ষই দেখছি, ত্রিশুল দেখতে পাচ্ছি না—কারণ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন।

পথের পাশে নানা রকমের গাছ। ডালিম গাছ দেখে মোহিত ও সুজল এদিক-ওদিক তাকিয়ে কয়েকটি ডালিম ছিঁড়ে পকেটে পুরল। বীর হেসে বলে, "চুরি করলেন কিন্তু ভোগে লাগবে না।"

"কেন?" সুজল জিজ্ঞেস করে।

"বড্ড টক।"

"তা হোক্ গে। তিয়াস মিটবে। তোমরা এ ডালিম খাও না?" মোহিত বলে।

"না। তবে এ গাছের ছাল খাই।"

"কেন?" দাশু প্রশ্ন করে।

"ঠাণ্ডায় স্বর বসে গেলে, গলা সাফ হয়।"

"বাঃ, বেশ ভাল জিনিস তো। শহরে চালান দিলে দেখছি স্বরবিণের বাজার নষ্ট হবে। গায়করা লুটেপুটে নেবে।"

গল্প করতে করতে পুরনো একটা বড় বাড়ি দেখে অমিতাভ জিজ্ঞেস করে, "এটা কার বাড়ি?"

"এটি ছেলেদের স্কুল। ১৮৮৬ সালে প্রতিষ্ঠিত। এ অঞ্চলের দ্বিতীয় প্রাচীনতম বিদ্যালয়।" বীর উত্তর দেয়।

"প্রাচীনতমটি কোথায়?" দেবকীদা প্রশ্ন করেন।

"থরালীতে।"

দেবল শেষ হতেই শুরু হল উৎরাই—সামান্য উৎরাই। দেবল থেকে বগরিগড় ৮ মাইল, মাত্র পাঁচশ ফুট নেমে যেতে হবে। তবে পথের প্রকৃতি প্রায় অপরিবর্তিত। তেমনি ক্ষেত আর বন। অনেক নিচে বয়ে যাচ্ছে কৈলু। সব সময়ে দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু কৈলুর কুলকুল ধ্বনি যাচ্ছে শোনা।

কিছুদূর এসে একটি গ্রাম—কৈল। ব্রাহ্মণপ্রধান গ্রাম। ব্রাহ্মণদের মধ্যেও শ্রেণীবিভেদ আছে। এক শ্রেণী হাল ধরতে পারেন, আরেক শ্রেণী পারেন না। তাঁদের পুজো করেই পেট চালাতে হয়। গ্রামের বাইরে কয়েক ঘর রাজপুত ও হরিজন আছেন। রাজপুতদের বলা হয় ব্রিজওয়াল। হরিজনদের মধ্যে আছেন—কর্মকার কারিগর, শিল্পীকার ও সূত্রধর। তাদের সংখ্যা গ্রামের জনসংখ্যার এক-পঞ্চমাংশ।

কৈল গ্রামের শেষে একটি ছোট নালা পেরোতে হল আমাদের। এরা ছোট নালাকে বলে গধেরা, আর বড় নালাকে বলে গড়। পথ তেমনি বনময়। চীর, পাইন, দেওদার ও নানা রকমের ছোট বড় গাছ। গাছে গাছে বন বিভাগের নম্বর। আগে টেণ্ডার ডেকে দেরাদুনে বসে বিক্রি হত এইসব গাছ। এখন জেলা সদর চামোলীতেই বেচা-কেনা হয়। ক্রেতা গাছ কেটে নদীতে ভাসিয়ে দেয়। বিনা ভাড়ায় পরিবহনের কাজ করে পাহাড়ী নদী। বন বিক্রয়ের অর্থ সরকার আত্মসাৎ করেন না, বনাঞ্চলের উন্নয়নের জন্য ব্যয় করেন। গাছের টাকায় গাঁয়ের রাস্তা খাল ও পঞ্চায়েত কোঠি তৈরি হয়।

কিছুদুর এসে একটি ছোট গ্রাম। নাম লোয়ানী।

সহসা বীর কি যেন একটা ইশারা করে। বুঝতে না পেরে আমরা দাঁড়িয়ে পড়ি। রাস্তার ধারে একটি বেশ বড় বাড়ির ভেতরে অদৃশ্য হয়ে যায়। বাড়ি থেকে রেডিওর শব্দ ভেসে আসছে। আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রেডিও শুনতে থাকি। একটু বাদে বীর ফিরে আসে। তার হাতে কয়েকটি কাঁকুড়। আমরা সাগ্রহে তার হাত থেকে কাঁকুড় নিয়ে মহানন্দে খেতে শুরু করি। সুজল হাঁক ছাড়ে "কমরেড বীর।"

আমরা বলি, "জিন্দাবাদ।"

লোয়ানীর পরে একটি বড় নালা—গসিরগড়। নালা পেরিয়ে বেশ খানিকটা চড়াই ভেঙে ওলাংগুরা—বড় গ্রাম। প্রায় পঞ্চাশ ঘর বাসিন্দা। একটা স্কুল আছে। গ্রামটির অবস্থান বড়ই সুন্দর। বড় একটি পর্বতশিখরকে সমতল করে বাড়িঘর বানানো হয়েছে।

বেলা চারটে কিন্তু কেমন যেন গোধূলির ভাব দেখা দিয়েছে চারিদিকে। এখানে সন্ধ্যা হয় অনেক দেরিতে। আকাশের দিকে তাকাতেই বুঝতে পারি ব্যাপারটা। কালো মেঘে ছেয়ে যাচ্ছে আকাশ। তবে কি বৃষ্টি নামবে নাকি? নামবে কি, নেমে গেছে। গুড়িগুড়ি বৃষ্টি পড়তে শুরু হয়েছে। যখন গোয়ালদাম থেকে রওনা হই, তখন ভাবতেও পারিনি বৃষ্টি নামবে। তাই রুকস্যাকের ওজন কমাতে বর্ষাতি ঘোড়ার পিঠে চাপিয়েছি। হিমালয়ের অস্থির প্রকৃতি আমাদের অচেনা নয়। তবু বর্ষাতি সঙ্গে নিইনি কারণ রামচাঁদ বলেছিল, কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের ধরে ফেলবে। অথচ এখন পর্যন্ত তার পাত্তা নেই। বুঝতে পারছি তার কথায় বিশ্বাস করে ভুল করেছি। আর ভুল করলে হিমালয়ের পথে তার প্রায়শ্চিত্ত করতেই হবে।

সেই প্রায়শ্চিত্তই করছি আমরা। ভিজতে ভিজতে পথ চলেছি। কিন্তু আর বুঝি এগোনো গেল না। জলের বদলে বরফ পড়ছে—শিলাবৃষ্টি শুরু হয়েছে। বাধ্য হয়ে পথের পাশে একটা স্কুলবাড়ির বারান্দায় ছুটে এসে আশ্রয় নিতে হয়। বীর বলে—এ গ্রামের নাম লবুয়া।

শিলাবৃষ্টি চলল প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে। বর্ষার পরে বর্ষাতি এলো। সস্ত্রীক ঘোড়াওয়ালার সঙ্গে রামচাঁদ এসে উপস্থিত হল। আর এসেই প্রশ্ন করল, "আপনারা এখনও এখানে ?"

"কি করব, সঙ্গে বর্ষাতি নেই যে।" অসিতবাবু উত্তর দেন।

"কেন বর্ষাতির কি হল ?"

"ঘোড়ার পিঠে রয়েছে।"

"আপনারাও তো ঘোড়ার পিঠে চড়ে এলেই পারতেন।" রামচাঁদ রসিকতা করে। তারপরে তিরস্কারের স্বরে বলে, "আপনারা দেখছি, পাহাড়ী পথের নিয়মকানুন কিছুই জানেন না। বর্ষাতি খাবার ও টর্চ সব সময় সঙ্গে রাখতে হয়।"

অপরাধ স্বীকার করে চুপচাপ পথে বেরিয়ে আসি। ঘোড়াওয়ালা এগিয়ে যায়। রামচাঁদ চলতে থাকে আমাদের সঙ্গে।

জলে কাদায় পিচ্ছিল পথ। দেখে দেখে ধীরে ধীরে পথ চলতে হচ্ছে। পথের একপাশে উঁচু পাথুরে জমি আর একপাশে খাদ। দুদিকেই গাছ।

বোধ হয় ঘণ্টাখানেকও হাঁটিনি। একটা নালা পেরোবার পরে পথটা বাঁক নিয়েছে। আর বাঁক ফিরতেই আশ্চর্য ব্যাপারটা ঘটল। হঠাৎ অন্ধকার ঘনিয়ে এলো। অথচ নালার ওপারে বেশ আলো ছিল। পথ চলতে কোন কষ্ট হচ্ছিল না। বুঝতে পারছি জায়গাটার অবস্থানই আঁধারকে ডেকে এনেছে। অসিতবাবু ও অমিতাভর রুকস্যাক থেকে টর্চ বের করা হল। সবার আগে টর্চহাতে চলেছে বীর। তার পেছনে অসিতবাবু অমিতাভ আমি ও দেবকীদা। দেবকীদার পরে টর্চহাতে রামচাঁদ। সবার পেছনে সুজল মোহিত ও দাশু। সঙ্কীর্ণ ও পিচ্ছিল পথ। সারি বেঁধে একের পেছনে অতি সন্তর্পণে হাঁটতে হচ্ছে অন্ধকে। নজন মানুষ মিলে অনেকটা জায়গা জুড়ে চলেছি আমরা। দুটি টর্চের আলো আঁধারকে দূর করা দূরে থাক, আরও ভয়াবহ করে তুলেছে দুর্গম আঁধারে পথকে।

হঠাৎ গলা ছেড়ে গান ধরে সুজল—

'দুর্গম গিরি কান্তার মরু, দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি-নিশীথে, যাত্রীরা, হুঁশিয়ার !
..., ...
গিরিসংকট, ভীরু যাত্রীরা, গুরু গরজায় বাজ,
পশ্চাৎ-পথ-যাত্রীর মনে সন্দেহ জাগে আজ।
কাণ্ডারী ! তুমি ভুলিবে কি পথ ? ত্যজিবে কি পথমাঝ ?
ক'রে হানাহানি তবু চলো টানি নিয়াছ যে মহাভার।'

সুজলের নজরুলগীতি শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে দাশু আবৃত্তি আরম্ভ করে—

'যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে,
সব সংগীত গেছে ইঙ্গিতে থামিয়া,
যদিও সঙ্গী নাহি অনন্ত অম্বরে,
যদিও ক্লান্তি আসিছে অঙ্গে নামিয়া,
মহা-আশঙ্কা জপিছে মৌন মন্তরে,
দিক্-দিগন্ত অবগুণ্ঠনে ঢাকা—
তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি, অন্ধ, বন্ধ করো না পাখা ॥'

যেভাবে সংগীত ও কাব্য-সরস্বতীর চর্চা চলেছিল, তাতে বাকি পথটুকু শেষ হবার আগে সরস্বতীর সাধনা বন্ধ হবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। তবু আমাদের গান ও আবৃত্তি বন্ধ হয়ে গেল, আমাদের কথা গেল ফুরিয়ে। দাশুর আবৃত্তি শেষ হবার পরে মোহিত গলা ভাঁজছিল, কিন্তু তার গান আরম্ভ করার আগেই দেবকীদা হঠাৎ প্রশ্ন করলেন বীর সিংকে, "কি রকম একটা গন্ধ নাকে আসছে ?"

"হ্যাঁ, ভালুর গায়ের গন্ধ।" বীর নির্বিকার ভাবেই উত্তর দেয়।

"ভালুক ?" লাফিয়ে ওঠে সুজল।

"কোথায় ?" লাফিয়ে উঠি আমরা সবাই।

"হয়ত কাছাকাছি কোথাও আছে। এটা ভালুর জঙ্গল।" রামচাঁদ গম্ভীর স্বরে বলে।

বীর সিং বলে, "দু দিন আগে ঠিক এখানে দুজন মানুষ জখম করেছে।"

আমরা থমকে দাঁড়াই। গা ছমছম করছে।

রামচাঁদ ধমক দেয়, "দাঁড়িয়ে পড়লেন কেন, দাঁড়িয়ে থাকলে কি ভালু

ছেড়ে দেবে ?"

"না।" ঢোক গিলে কোনমতে জবাব দিই।

রামচাঁদ বলে, "ভয় কি, আমি সঙ্গে রয়েছি। ওরা আমাকে চেনে, জানে হাতিয়ার ছাড়া আমি কখনও চলা-ফেরা করি না। এতগুলো মানুষ রয়েছি একসঙ্গে, প্রত্যেকের হাতে লাঠি কিংবা আইস এক্স রয়েছে। এত ভয় পাচ্ছেন কেন ? ওরা কি করবে আমাদের ?"

তবু দ্বিধা করতে থাকি আমরা। বীর বলে, "চার-পাঁচজনকে একসঙ্গে দেখলে ওরা কখনও আক্রমণ করে না। আমরা নজন রয়েছি। ভালুরা আসবে না আমাদের কাছে। ওদেরও প্রাণের ভয় আছে।"

"চলুন, চলুন, আর দাঁড়িয়ে থাকবেন না। দেরি হয়ে যাচ্ছে।" রামচাঁদ তাড়া দেয়।

আমরা ধীরে ধীরে এগিয়ে চলি। বীর চলেছে সবার আগে, রামচাঁদ সবার শেষে। কর্দমাক্ত পিচ্ছিল দুর্গন্ধযুক্ত সঙ্কীর্ণ পথ। টর্চের আলো খুব সামান্যই সাহায্য করছে। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে পথ চলেছি আমরা। ক্রমাগত হোঁচট খাচ্ছি, আছাড় খাচ্ছি। মাঝে-মাঝেই ক্ষীণ জলধারা পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে এসে বয়ে যাচ্ছে পথের ওপর দিয়ে। জুতো মোজা ও প্যাণ্ট ভিজে যাচ্ছে। কেবল আমার ও অসিতবাবুর প্যাণ্ট ভেজেনি। কারণ আমরা গোয়ালদাম থেকে হাফপ্যাণ্ট পরে রওনা হয়েছি। এজন্য অবশ্য তখন অনেক ঠাট্টা সইতে হয়েছে। সহযাত্রীরা আমাদের খোকা বলে অভিহিত করেছে। এখন ওদের হিংসে আমাদের ওপর। বুড়োদের পাতলুন ভিজে গেছে, কিন্তু খোকাদের হাফপ্যাণ্ট রয়েছে শুকনো।

বীর সিংয়ের ছায়া অনুসরণ করে অন্ধের মত এগিয়ে চলেছি আমরা। জঙ্গলটা যেন ধীরে ধীরে পাতলা হচ্ছে। হ্যাঁ, পথের পাশে কয়েকখানি বাড়ি-ঘর। বীর সিং বলে, "পিলখাড়া গ্রাম।"

"মানুষজন নেই ?"

"আছে বৈকি।"

"সাড়া-শব্দ পাচ্ছি না তো !"

"সবাই সন্ধ্যার আগে ঘরে ঢুকে দোরে খিল দিয়েছে।"

"কেন ?"

"ভালুর ভয়ে।"

অসিতবাবু বলেন, "গ্রামের কারও কাছ থেকে একটা হ্যারিকেন ধার করা যায় না। কাল ফেরত পাঠিয়ে দেব।"

"চেষ্টা করা যেতে পারে।" রামচাঁদ বলে। সে একটা বড় ঘরের দরজায় ধাক্কা দেয়। ঘরের ভেতরে কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছি। কিন্তু দ্বার উন্মুক্ত হবার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

সুজল হেসে বলে, "বৃথাই চেষ্টা, অন্তঃপুরবাসীরা মুখ দেখাবে না আমাদের। ওরা ভেবেছে ভালুক মানুষের মত গলার স্বর করে ওদের সঙ্গে প্রতারণা করছে।"

কথাটা মিথ্যে নয়। তবে সে ভাবনায় সময় নষ্ট না করে আমরা এগিয়ে চলি। গ্রাম পেরুবার পরে জঙ্গল আবার ঘন হল। এমন ঘন যেন সে কখনও ছিল না। দুপাশের গাছ মাথার ওপরে শাখা মেলেছে। বৃষ্টি থেমে গেছে, আকাশ নিশ্চয়ই পরিষ্কার হয়েছে এতক্ষণে। তারারা উঁকি মারছে চারিদিকে। কিন্তু এ এক ভিন্ন জগৎ, এখান থেকে আকাশ দেখা যায় না, দেখা যায় না ডাইনে বাঁয়ে, সামনে পেছনে। ক্ষেত-জঙ্গল নদী-নালা পথ ও প্রান্তর সব অসীম আঁধারে একাকার হয়ে আছে।

সেই সীমাহীন আঁধারের বুক চিড়ে আইস এক্স ঠুকে ঠুকে অনুমানে এগিয়ে চলেছি। কেউ কোন কথা বলছি না। তবে পায়ের শব্দ, আইস এক্সের শব্দ আর নিঃশ্বাসের শব্দ কর্দমাক্ত পথকে শব্দময় করে তুলেছে। গোড়াতেই রামচাঁদ সবাইকে একসঙ্গে পথ চলতে বলেছিল। এতক্ষণ ছিলামও একসঙ্গে। কিন্তু এবারে কেন যেন ক্রমেই ওরা পেছিয়ে পড়ছে। অসিতবাবু অমিতাভ দেবকীদা ও আমি চলেছি বীর সিং-এর সঙ্গে। দাশু মোহিত ও সুজলের সাড়া-শব্দ পাচ্ছি না। ওরা অনেক পেছিয়ে পড়েছে। ওদের সঙ্গে টর্চ নেই, কিন্তু আমাদের শরীরও যে আর বইতে চাইছে না। কোন রকমে পৌছতে পারলে বেঁচে যাই। এখন কারও পক্ষে কারও জন্য প্রতীক্ষা করা সম্ভব নয়। আমরা এগিয়ে চলি।

পথের কোথাও কোথাও হাঁটুসমান জল। তীব্র বেগে জল বয়ে চলেছে। জলে পা দিতেই সারা শরীর অবশ হয়ে আসছে।

কেবলই মনে হচ্ছে পায়ে কোন ঠাণ্ডা জিনিস চলা-ফেরা করছে। হাত দিতেই নরম কিছু হাতে ঠেকে। কথাটা দেবকীদাকে বলতে তিনি বলেন তাঁরও তাই মনে হচ্ছে। অসিতবাবু আর অমিতাভরও নাকি একই অবস্থা। বীর সিংকে জিজ্ঞেস করি। সে বলে, "জোঁক হতে পারে, এ পথে খুব জোঁক আছে।"

"জোঁক!" লাফিয়ে উঠি আমরা। "আগে বলনি কেন?"

"কি লাভ হত! বগরিগড় পৌছবার আগে তো গা থেকে ছাড়াতে পারবেন না!"

"তা হলে ওরা এতক্ষণ ধরে আমাদের রক্ত খাবে?"

"কতক্ষণ আর! আমরা প্রায় পৌছে গেছি। ঐ যে লালাজীর দোকানের আলো দেখা যাচ্ছে।"

ঠিকই বলেছে বীর সিং। দূরে একটা আলো দেখা যাচ্ছে। তাহলে তো আমাদের পথ ফুরিয়ে এসেছে। থাক্ গে জোঁক। আগে তো নিরাপদ আশ্রয়ে পৌছনো যাক। তারপরে জোঁকের কথা ভাবা যাবে। আমরা চলার বেগ বাড়িয়ে দিই। ছুটে চলি আঁধার থেকে আলোর দিকে।

অপরিচিত লালাজী অভিনন্দন জানান আমাদের। আশ্বাস দেন, "চৌকিদার ডাকবাংলোতেই আছে। সে আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছে।"

লালাজীর দোকানে চা ও পুরী-তরকারী থেকে ডাল-আটা, তেল-মশলা সবই পাওয়া যায়। শাদীলালজীর মত লালাজীও বগরিগড়ের অনারারী পোস্ট-মাস্টার। তাঁর দোকানেই থাম-পোস্টকার্ড কিনতে পাওয়া যায়।

দোকানের সামনে নির্মাণ বিভাগের ছোট ডাকবাংলো। চারিদিকে জঙ্গল। একখানি বড় ও একখানি ছোট ঘর। পাশে রান্নাঘর। বড় ঘরখানা দখল করলেন অসিতবাবু। চৌকিদার দরজা খুলে দিল। মালপত্র এই ঘরেই রেখে দিয়েছে। ঘরের ভেতরে ঢুকে দেখি, এতেও সবাই হাত-পা মেলে শুতে পারব না। না পারলেই বা উপায় কি? হাত-পা না মেলেই রাত কাবার করে দিতে হবে। এর থেকে ভাল আশ্রয় নেই বগরিগড়ে। চৌকিদার জানায়—সস্ত্রীক ঘোড়াওয়ালা তার ঘরে আশ্রয় নিয়েছে। রামচাঁদও তার সঙ্গেই থাকবে। কাজেই আমরা বীরকে নিয়ে এ ঘরে থাকতে পারলেই হয়ে যাবে।

অসিতবাবু আলো জ্বালান। আমরা গা থেকে জোঁক ছাড়াতে থাকি। বেশ বড় বড় জোঁক। শরীরের কোথাও কোথাও রক্তপাত হয়েছে। জোঁক ছাড়িয়ে জামা-প্যান্ট পালটাতে প্রায় আধঘণ্টা কেটে গেল। রাত সাড়ে নটা বাজে। ওরা এখনও এলো না। দুশ্চিন্তার কথা। অন্ধকার দুর্গম পথ। ভালুকের জঙ্গল। তবে কি কোন বিপদ হল?

বাইরে বেরিয়ে আসি। আবার গুড়িগুড়ি বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে। ভারী

মুশকিলেই পড়া গেল। বীর সিংও চিন্তিত। সে বলে, "আমি বরং ঘোড়াওয়ালার সঙ্গে একটু এগিয়ে দেখছি, দুটো বর্ষাতি দিন আমাদের। আপনারা চৌকিদারকে নিয়ে রান্নার ব্যবস্থা করুন। সে জ্বালানি কাঠ দিচ্ছে। ওকে এজন্য কিছু পয়সা দিতে হবে।"

বর্ষাতি ও লণ্ঠন নিয়ে বেরিয়ে যায় বীর। চৌকিদারের সঙ্গে অসিতবাবু ও অমিতাভ চলে যায় রান্নাঘরে। দেবকীদা বলেন, "এসো আমরা ঘরটা পরিষ্কার করে এয়ার ম্যাট্রেস ফুলিয়ে বিছানাগুলি পেতে ফেলি।"

আমরা কাজ শুরু করে দিই। কিন্তু ঠিকমত মন দিতে পারি না। বার বার ঘড়ি দেখি, বার বার দরজা খুলি। কিন্তু কোথায়? যতদূর দৃষ্টি যায়, কেবল সীমাহীন আঁধার, কোথাও আলো নেই।

এখনও আসছে না কেন? কিছুই বুঝতে পারছি না। কি হতে পারে? ওরা তিনজনই যুবক। তিনজন লোককে কি ভালুক আক্রমণ করতে সাহসী হবে? হতে পারে। অন্ধকার দুর্গম পথ, জল পড়ছে। তবে ওরা তো নিরস্ত্র নয়। ওদের সঙ্গে আইস এক্স আছে। আক্রমণ করে থাকলে ভালুক নিশ্চয়ই সুবিধে করে উঠতে পারেনি। দু-একজন হয়ত একটু-আধটু আহত হয়েছে। তাই ওদের এত দেরি হচ্ছে।

আর ভাবতে পারছি না। নানা দুশ্চিন্তায় মাথার মধ্যে জট পাকিয়ে যাচ্ছে। সময় আর কাটতে চাইছে না। সেই কখন বীর বেরিয়ে গেল। তখন সাড়ে নটা বেজে গেছে। আর এখন? দশটা বাজেনি? ঘড়িটা কি বন্ধ হয়ে গেছে নাকি? আজ বোধ হয় চাবি দিইনি। না, ঘড়ি তো চলছে ঠিকই। তাহলে সময় কাটছে না কেন?

দরজা খুলতেই মনে হল, বহুদূরে আঁধারের মাঝে একটা আলো নড়া-চড়া করছে। নিজের অলক্ষ্যেই চীৎকার করে উঠি, "সুজল দাশু মোহিত···"

দেবকীদা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসেন ঘর থেকে।

বেরিয়ে আসে অমিতাভ, অসিতবাবু ও চৌকিদার।

অসিতবাবু আবার ডাক দেন।

এবারে সাড়া মেলে। গলা বুঝতে পারি না। তবে নিশ্চয়ই ওরা। এসময় আর কে আসবে এখানে?

আমরা ছুটতে শুরু করি। বৃষ্টিতে ভিজে যাচ্ছি, আছাড় খাচ্ছি। তবু ছুটছি। ছুটছি অন্ধকার দুর্গম পথে, ছুটছি ঐ আলোর দিকে। ও আলো

আলেয়া নয়। দেয়ালীর রাতে শ্যামাপোকা এমনি করেই ছুটে যায় প্রদীপ শিখার কাছে। তবে ওরা ছোটে মরণের পানে, আমরা ছুটছি জীবনের কাছে।

একটু বাদেই আমরা ওদের কাছে এসে পৌছাই। সে কি, সুজলকে মোহিত আর বীর সিং ধরে নিয়ে আসছে কেন? তবে কি সত্যই ভালুক ওদের আক্রমণ করেছিল?

"না," বীর বলে, "ভালুক নয়, নালা পেরোতে গিয়ে পড়ে গেছেন মুখার্জিসাব। আঘাত সামান্য তবে চলতে কষ্ট হচ্ছে বলে ধরে নিয়ে যাচ্ছি।"

যাক নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। ডাকবাংলোয় এসেই ফার্স্ট এড্ বক্স খুলে বসল অমিতাভ। জোঁক পরিষ্কার করে জামা-প্যান্ট পাল্টাবার মধ্যে দেবকীদা কফি বানিয়ে ফেললেন। অসিতবাবু ও অমিতাভ সুজলের চিকিৎসায় লেগে গেল। দাশু ও মোহিত কফি খেয়ে বীর সিংয়ের সঙ্গে রান্নাঘরে চলে গেল। বীর সিং বে-সরকারী ভাবে যাই করুক, সরকারী ভাবে সে আমাদের পাচক। দেখা যাক পাচক ঠাকুরের হাতে খিচুড়িটা কেমন হয়।

ভালই হয়েছে। বারো-তেরো ঘণ্টা চড়াই-উৎরাই ভাঙ্গার পর এই আবহাওয়া আর পরিবেশে কি গরম খিচুড়ি খারাপ লাগতে পারে? খেতে বসার পরে সুজলকে দেখে মোটেই বোঝা যাচ্ছে না যে সে অসুস্থ। তাই হাসতে-হাসতে জিজ্ঞেস করি, "কি রে, তুই না কিছুক্ষণ আগে চোট খেয়েছিস্!"

"ইঁ তো একটু বেশি খিচুড়ি খাচ্ছি। কাল সকালের মধ্যে শরীরটাকে ঝরঝরে করে তুলতে হবে তো।"

কিন্তু তুই যেন কাল রাতে বলেছিলি, উপোস দিলেই শরীরটা ঝরঝরে হয়!" দেবকীদা সুজলকে মনে করিয়ে দেন।

"সে থিয়োরিটা এখানে অচল। এখানে যত খাবে, তত বেশি ঝরঝরে হবে।"

ওর নতুন থিয়োরি শুনে হেসে ফেলি। হাসির চোটে আমরাও বেশি খেয়ে ফেলি। হাসির মধ্যেই খাওয়া শেষ হয় আমাদের। রামচাঁদ চলে যায় চৌকিদারের ঘরে। বীর সিং ফায়ার-প্লেসের আগুনটা বাড়িয়ে দেয়। আমরা ভেজা জুতোগুলো রেখে দিই ফায়ার-প্লেসের চারিদিকে। তারপরে এসে শুয়ে পড়ি। অসিতবাবু হিসেবের খাতা নিয়ে বসেন। আর বীর ফায়ার-

প্রেসের পাশে বসে আমাদের মোজা শুকোতে থাকে। হিমালয়ের পথে এমন সেবাপরায়ণ বন্ধু পাওয়া ভাগ্যের কথা।

॥ বারো ॥

পাখির গানে ঘুম ভাঙে। আমি কান পেতে গান শুনি। গান থামলে চোখ মেলি। মিঠে রোদে ভরে গেছে ঘর। তাহলে তো অকাল বর্ষণ শেষ হয়েছে। শুধু ঝরণার শব্দ কানে আসছে। তাড়াতাড়ি উঠে বসি। ঘড়ি দেখে চমকে উঠি—নটা বাজে। সবাই ঘুমোচ্ছে, কেবল দেবকীদার শয্যা শূন্য।

ঘরের দরজা খোলা। বোধ হয় বাইরে গেছেন দেবকীদা। আমিও বাইরে বেরিয়ে আসি। পায়চারি করছেন দেবকীদা। জিজ্ঞেস করি, "কখন উঠেছেন ?"

"তা প্রায় ঘণ্টা তুয়েক হবে।"

"কফি বানালেন না ?"

"এইবারে বানাবো। চৌকিদার উনোন ধরিয়ে দিচ্ছে। কফির পরেই রান্না চড়বে। আজ আমরা স্নান-খাওয়া সেরে বের হব।"

দেবকীদা রান্নাঘরের দিকে যান। আমি মুখ-হাত ধুয়ে ঘরে আসি। একে একে সবাইকে ডেকে তুলি ঘুম থেকে। বীর সিং লজ্জা পায় ঘড়ি দেখে। বলি, "কী আর দেরি হয়েছে ? কাল অত রাতে শুয়েছ।"

বীর সিং চলে যায় রান্নাঘরে। ওরা সবাই মুখ-হাত ধুয়ে নেয়। সুজল অমিতাভকে বলে, "চমৎকার ওষুধ দিয়েছিলেন। খুব ভাল ঘুম হয়েছে। ব্যথাও কমে গেছে।"

একটু বাদে বীর গরম জল নিয়ে ঘরে ঢোকে। দেবকীদা সঙ্গে আসেন। তিনি কফি বানাতে থাকেন। আর তখুনি 'গুড মর্নিং' বলে দরজা ঠেলে ঘরে ঢোকে রামচাঁদ।

কফি শেষ করে মোহিত দাশু ও বীর রান্নাঘরে চলে যায়। আমরা মালপত্র গুছিয়ে ফেলি। ঘোড়াওয়ালা আসে। রামচাঁদ তাকে বুঝিয়ে দেয় সব। সে মাল বোঝাই করতে থাকে। আমরা সামনের ঝরণায় একে একে

স্নান সেরে নিই। ঘোড়াওয়ালা চলে যায় মাল নিয়ে। রামচাঁদ ওদের এগিয়ে দেয় ওপরে—বড় রাস্তা পর্যন্ত।

খাওয়া-দাওয়া শেষ করতে বেলা এগারোটা বেজে গেল। আমরা তৈরি হয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ি। লালাজীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এগিয়ে চলি চড়াই-পথে।

চীর ও দেওদার গাছের ছায়ায় সঙ্কীর্ণ স্যাঁতস্যাতে পথ। পথের পাশে কোন নদী নেই। কৈলু রয়ে গেল পাহাড়ের ওপাশে। আমরা চলে এসেছি এপাশে।

ধীরে ধীরে চীর ও দেওদারের চিহ্ন মুছে গেল। গাছপালাহীন পাহাড়ের গা বেয়ে আমরা ওপরে উঠছি। মেঘমুক্ত নির্মল আকাশ। কে বলবে কাল সারারাত অমন দুর্যোগ গেছে! আজ রাতেও যে তেমন হবে না, তাই বা কে বলতে পারে? এখন চারিদিকে চড়া রোদ। চড়াই ভাঙতে খুবই কষ্ট হচ্ছে। তবু চলছি। চলার জন্যেই যে আসা।

মাইল তিনেক এসে একটা পাঠশালার সামনে পৌঁছলাম। এখান থেকে বহুদূরে ছবির মত দেখা যাচ্ছে গোয়ালদাম। আমরা বগরিগড থেকে দেড় হাজার ফুট চড়াই ভেঙেছি। এ গ্রামের নাম মান্দোলী—বেশ বড় গ্রাম। উচ্চতা ৭০০০ ফুট।

ছেলে-মেয়েরা ঘাড় গুঁজে পাঠশালায় পড়াশুনা করছিল। কি কারণে জানি না একজন পড়ুয়া বাইরে এল। এসেই দেখতে পেল আমাদের। আর যায় কোথায়! ইশারা করে সতীর্থদের। একটি দুটি করে গুটি গুটি পড়ুয়া বেরিয়ে আসে বাইরে। গুরুমশায় গর্জন করে ডাকতে থাকেন ওদের। অবাধ্য ছাত্র-ছাত্রীরা আসি বলে দাঁড়িয়ে থাকে বাইরে। বেত দুলিয়ে গুরুমশায় বেরিয়ে আসেন। এসেই দেখতে পেলেন আমাদের। ছাত্র-ছাত্রীদের অবাধ্যতার কথা বিস্মৃত হয়ে তিনি বেত হাতে এগিয়ে আসেন। ছাত্র-ছাত্রীদের ছাড়িয়ে আমাদের কাছে এসে হাতজোড় করে নমস্কার করেন। বেতখানি কিন্তু এখনও রয়েছে তাঁর হাতে।

সমস্ত পাঠশালা নেমে এসেছে পথে। ছাত্র-ছাত্রীরা ঘিরে ধরে আমাদের। গুরুমশায় আলাপ করেন। খুশি হন আমাদের পরিচয় পেয়ে। দুঃখিত হন আমরা আজ এখানে থাকব না শুনে। গরম মকাই (ভুট্টা)-ও ঠাণ্ডা জল দিয়ে আপ্যায়িত করেন আমাদের। আশ্চর্য এই হিমালয়ের মানুষগুলি। সম্বল

সামান্য কিন্তু কি উদার এদের অন্তঃকরণ, কত আন্তরিক এদের আতিথেয়তা।

অতিথিবৎসল এরা চিরকাল। ১৮৪৩ সালে এ অঞ্চলের অধিবাসীদের আতিথেয়তা দেখে পি. ব্যারণ লিখে গেছেন—

'At the end of almost every lane which led from a village to the main road, a man from it was posted with a lota full of milk, which he never failed to press upon our acceptance with the most gentlemanly courtesy, and was always unwilling to accept any remuneration.'

শতাধিক বছরের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিবর্তনের মধ্যেও ওদের সেই স্বভাবের কিছুমাত্র পরিবর্তন হয়নি। যুগ বিবর্তনের ফলে জল দুধের স্থান নিয়েছে। কিন্তু মানুষগুলোর মন একই রয়ে গেছে।

পথের পাশে ক্ষেত-খামার আর তারই মাঝে মাঝে বাড়িঘর। দু-একটি বাড়ি বেশ বড়। চারিদিকে সারি-সারি ঘর, মাঝখানে পাথর বাঁধানো উঠান। উঠানে কাপড় ও কম্বল মেলে দেওয়া হয়েছে, চুয়া শুকানো হচ্ছে। শুকনো চুয়া পেষাই হচ্ছে। গ্রামের পঞ্চায়েত ঘরটিও ভারী সুন্দর। কয়েক বছর আগে আদর্শ গ্রাম হিসেবে উত্তর প্রদেশ সরকারের পুরস্কার পেয়েছে মান্দোলী।

মেয়েরা কাজ করছে গান গাইছে ক্ষেতে-খামারে, পথে-প্রান্তরে, ঘরে-বাইরে। ফসল তুলছে, কাঠ কাটছে, জল আনছে। আর ছেলেরা চা খাচ্ছে, হুঁকো টানছে, আড্ডা দিচ্ছে। বড় জোর উল বুনছে। রামচাঁদ অবশ্য বলল—বাজারে গেলে নাকি কর্মঠ ছেলেদেরও দেখা মিলবে। কাজের ছেলেরা বাজারে বসছে। বাজার একটু দূরে, গ্রামের ভেতরে।

রামচাঁদ দেখছি গ্রামের মেয়েদের সবাইকেই চেনে। সে ডেকে ডেকে তাদের সঙ্গে কথা বলে। একটু-আধটু রসিকতাও করে। তারপরে একসময় সহসা আমাদের নির্দেশ দেয়, "আপনারা এই পথে সোজা এগোতে থাকুন, আমি একটু পোস্ট অফিস হয়ে আসছি।"

"পোস্ট অফিস?" বিস্মিত হই আমরা।

"হ্যাঁ, এখানে পোস্ট অফিস আছে।"

"গোয়ালদাম বা দেবলে পোস্ট অফিস নেই, আর এখানে আছে?"

"হ্যাঁ, এ পথের একমাত্র পোস্ট অফিস এই মান্দোলীতে।" রামচাঁদ

জানায়। তারপরে আবার বলে, "আমি যাই। আমার একটা জরুরী চিঠি আসার কথা আছে।"

কয়েকটি মেয়ের পেছনে পেছনে রামচাঁদ গ্রামের ভেতরে অদৃশ্য হয়ে যায়। পথটা বড়ই সরু। পাশাপাশি চলা যায় না।

আমরা এগিয়ে চলি নিজেদের পথে। কিছুদূর এসে পথের পাশে বিরাট একটি পাথরের বেদী দেখে দাঁড়িয়ে পড়ি আমরা। বীর আমাদের সপ্রশ্ন দৃষ্টির উত্তরে বলে, "নন্দাযাতের সময় যাত্রীরা এখানে রাত কাটান। তাঁরা এই বেদীর ওপরে নন্দাদেবীর মূর্তি নামিয়ে রাখেন।"

নন্দাদেবী গাড়োয়াল ও কুমায়ুনের সর্বশ্রেষ্ঠা আরাধ্যা। তাই বারো বছর বাদে তাঁর রৌপ্যমূর্তি ও ত্রিশুল নিয়ে এক শোভাযাত্রা এই পথে যায় ত্রিশুল পর্বতের দিকে। তাঁদের যাত্রাস্থল রূপকুণ্ড ছাড়িয়ে ১৩,২০০ ফুট উঁচু হোমকুণ্ড। কিন্তু প্রায় প্রত্যেকবারই প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য তাঁরা গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারেন না। এই যাত্রায় অংশগ্রহণ করতে পারলে কুমায়ুনীরা নিজেদের সৌভাগ্যবান বলে মনে করেন। ১৯৫৩ সালে শেষযাত্রা হয়েছে। আবার যাত্রা হবে ১৯৫৫ সালে।

নন্দাদেবীর বেদীর শেষে পথও যেন শেষ হয়ে গেল। বীর অবশ্য বলছে, এটাই পথ। কিন্তু নিজের চোখকে অবিশ্বাস করি কেমন করে! বনময় পাহাড়ের গা বেয়ে অজস্র ধারায় বর্ষার জল গড়িয়ে পড়ছে। তারই ওপর দিয়ে খাড়া চড়াই ভাঙছি আমরা। উঠছি এই পাহাড়ের চূড়োয়। ওখানে পৌঁছতে পারলে পরিত্রাণ পাব এই কুৎসিত চড়াইয়ের কবল থেকে।

কিন্তু সে আশা অপূর্ণ রইল। গিরিশিরাটির শেষে এসে বুঝতে পারছি, এর পরেও চড়াই আছে। তবে বীর সিং সামনের গিরিশিরাটি দেখিয়ে আশ্বাস দেয়—ওখানেই আপাতত চড়াই শেষ। ওরই নাম লোহাজঙ্গ। কিন্তু এদিকে যে হাঁটুতে জং ধরে গেল। একটু জিড়িয়ে নিয়ে আমরা আবার এগিয়ে চলি।

তবে এগোনো কি সহজ! এও তেমনি চড়াই, তেমনি পিচ্ছিল। শরীরের সর্বশক্তি নিয়োগ করে খুব সাবধানে চলতে হচ্ছে। চলার জন্যই যে হিমালয়ে এসেছি, থামার জন্য নয়।

চলার শেষ নেই, কিন্তু চড়াইয়ের শেষ আছে। একসময় আমরা এসে পৌঁছলাম সেই গিরিশিরার শেষে। এলাম লোহাজঙ্গ—ন' হাজার ফুট উঁচু একটি

গিরিবর্ত্ম। আমরা মান্দোলী ছাড়ার পরে চার মাইলে দু হাজার ফুট চড়াই ভেঙেছি।

গতকাল গোয়াল্দাম থেকে রওনা হবার পরে যে তুষারমৌলি হিমালয়কে হারিয়ে ফেলেছিলাম, এখানে এসে আবার তাকে পেলাম ফিরে। কেবল ফিরে পেলাম না, পেলাম আরও কাছে, আরও নিবিড় করে।

ভাল করে দেখে নিই নন্দাঘুন্টিকে। এর আগে এত কাছে, আর পাইনি ওকে।. নন্দাঘুন্টি খুব উঁচু শৃঙ্গ নয়। কুমায়ুন হিমালয়ের কনিষ্ঠতম শৃঙ্গ নন্দাঘুন্টি। তবু তাকে দেখা যায় কুমায়ুনের বহু জায়গা থেকে। মনে হয় ত্রিশুল ও হাতী পর্বতের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অথচ তারা ওর থেকে অনেক উঁচু। আর সৌন্দর্য! সৌন্দর্যে সে কারও থেকে খাটো নয়। তাই সে আমাদের মন কেড়ে নিয়েছে। আর তাই নন্দাঘুন্টি থেকেই বাংলার বে-সরকারী পর্বতাভিযান আরম্ভ হয়েছে।

লোহাজঙ্গ গিরিবর্ত্ম হলেও উচ্চতা বেশি নয়। কাজেই কিছু লোক বাস করেন এখানে। বাস করেন বহুদিন থেকেই। তাঁরাই তৈরী করেছে দুটি ছোট ছোট পাথরের মন্দির। এত ছোট যে ভেতরে প্রবেশ করা কষ্টকর। অথচ অপূর্ব সুন্দর তাদের কারুকার্য। একটিতে শিব-দুর্গার অনিন্দ্যসুন্দর মূর্তি। স্থানীয়রা বলেন—কালী মাঈজী। আর একটি মন্দিরে মূর্তি নেই। বোধ হয় মূর্তি ব্যবসায়ীরা অপহরণ করেছে। সেটি নিশ্চয়ই আরও সুন্দর ছিল। মন্দিরের নিচে একটি বড় দেওদার গাছের সঙ্গে বিরাট একটা পেতলের ঘণ্টা ঝুলছে।

লোহাজঙ্গ থেকে একটি পথ গেছে বিগুণতাল, ব্রহ্মতাল ও খপলুতালে। আমরা ফেরার পথে এইসব তাল অর্থাৎ হ্রদ-কটি দর্শন করব। কিন্তু সে কথা পরে হবে। এখন লোহাজঙ্গের কথা বলে নিই।

এখানে আছে কয়েকটি চায়ের দোকান। তারই একটিতে বসে বিস্কুট সহযোগে চা খেয়ে নিলাম আমরা। চায়ের দোকানে বসেই আলাপ হল একটি স্থানীয় যুবকের সঙ্গে। যুবকটির নাম কলঙ্কিনী

কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে আমরা আবার চলা শুরু করি। এবারে পথ রেখা স্পষ্ট। তবে পথের প্রকৃতি ভিন্ন। এতক্ষণ ছিল যেমন চড়াই, এখন তেমনি উৎরাই। লোহাজঙ্গ থেকে ওয়ান চার মাইল। ওয়ান ৮০০০ ফুট উঁচু। ভেবেছিলাম চার মাইলে হাজার খানেক ফুট নামতে হবে। কাজেই তেমন

থাড়া উৎরাই ভাঙতে হবে না। কিন্তু এ যে দেখছি বহু নিচে নেমে গেছে পথ। বুঝতে পারছি এর পরে আবার উঠতে হবে ওপরে।

আস্তে হলেও চড়াইতে মোটামুটি হাঁটতে পারছিল সুজল। কিন্তু উৎরাই ভাঙতে গিয়েই সে হাঁটুতে ব্যথা বোধ করতে থাকল। ওর কষ্ট বুঝতে পারে বীর। বীর এগিয়ে যায় ওর কাছে। বলে, "আইস এক্সে ভর দিয়ে আস্তে আস্তে নামুন।"

সুজল তাই করতে থাকে। আমরাও আস্তে আস্তে চলতে থাকি। উৎরাইতে আস্তে চলা বড়ই কষ্টকর। বিশেষ করে পিঠে মাল নিয়ে। আমাদের অসুবিধে বুঝতে পারে বীর। বলে, "আপনারা এগিয়ে যান, আমি মুখার্জিসাবের সঙ্গে আসছি।"

একজনের জন্য সবার দেরি করা ঠিক নয় বিশেষ করে বীর যখন রয়েছে সুজলের সঙ্গে। কিন্তু আমরা যে পথ চিনি না। রামচাঁদ তো এখনও উদয় হল না। মান্দোলীর মেয়েরা হয়তো তাকে ছুটি দেয়নি। ইয়ং হিরো অব্ ফরটিফাইড আমাদের গাইড। আমরা গর্বিত।

আমরা লজ্জিত। আমরা পথ চিনি না। অচেনা পথে এগিয়ে যাব কেমন করে? বীর ভরসা দেয়, "আমি তো রয়েছি পেছনে। আপনারা এগিয়ে যান। সন্দেহ হলেই আমার জন্য অপেক্ষা করবেন।" সে পথের একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেয়। আমরা এগিয়ে চলি।

বীর সিং-য়ের নির্দেশিত পথে নেমে চলেছি আমরা। নামছি তো নামছিই। এ নামার যেন শেষ নেই। পাহাড়ের গায়ে ঘন বন। সেই বনের মধ্য দিয়ে পথ। অধিকাংশই চীর ও ঝাঁঝ গাছ। বীর বলেছে ঝাঁঝ গাছ খুব শক্ত। খুব ভাল জ্বলে আর এর পাতা গরুতে খায়। কাজেই এদেশের মানুষের খুব প্রিয় এই গাছ। আরও অনেক রকমের গাছ আছে এ বনে। আছে বুরাল। বেশ বড় বড় গাছ। লাল ফুল হয়। ফুলের কেশর খেতে মিষ্টি। আমরা খেলাম। আর এক রকমের গাছে দেখছি গোল হলুদ ফুল। বেশ মিষ্টি গন্ধ। এমন ফুল আর কখনও দেখিনি। পরে জেনেছি, এ গাছের নাম কসনম। এক রকমের গাছে দেখছি অনেকটা আখরোটের মত ফল ধরেছে। এ গাছের নাম পাঙ্গর। খোলস ভেঙ্গে ফেললে কালো পর্দায় ঢাকা একটি সাদা শাঁস পাওয়া যায়। সেই শাঁসটিকে গুঁড়ো করে ওরা কাপড় কাচে। এই গুঁড়োকে বলে পীনা। মাঝে মাঝে অবশ্য দু-চারটে করে আখরোট

গাছও দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু আখরোট নেই গাছে। সুজলের কথা ভেবে যেমন দুঃখ পাচ্ছি, তেমনি উপেনবাবুর কথা ভেবে আনন্দ হচ্ছে। উপেনবাবু উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের বহু মাল-মশলা পাবেন এই বনময় পাহাড়ী পথে।

মন ভোলানো বন। কিন্তু বনের চাইতে বনের পাখি বেশি আকর্ষণ করছে। নানা রংয়ের নানা রকমের ছোটবড় পাখি। কোনটি নীল, কোনটি খয়েরী, কোনটি কালো, আবার কোনটি রং-বেরংয়ের। কোনটি ময়ূরের মত, কোনটি তিতিরের, কোনটি কোকিলের, কোনটি বা চড়ুইয়ের মত। পুচ্ছ ও কেশরের কি বাহার! আর কি সুন্দর কণ্ঠস্বর। তারা গান গাইছে। সেই সুর বনের পাতায় পাতায় মর্মরিত হচ্ছে, পাহাড়ী পথে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। আমরা বিহ্বল হয়ে পড়েছি।

তিনটি ছোট ছোট নালা পেরিয়ে দেড় মাইল এসে বাবগড়িগড়—একটি বড় নালা। তীরে বসে একটু বিশ্রাম করি। আর বসেই দেখতে পাই ওদের। মানুষ নয় হনুমান। তবে আমরা সাধারণতঃ যেমন হনুমান দেখি ঠিক তেমন নয়। এদের কেশর সাদা। তাই এখানকার বাসিন্দাদের মতে এরা বালী-সুগ্রীবের ভাই। হনুমানকে এরা বলেন গুণী।

গুণীদের গুণপনা দেখার মত সময় এখন নেই আমাদের। আমরা গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াই। গুণীদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এগিয়ে চলি নিজেদের পথে। কিন্তু পথ চলতে চলতে আলোচনা করতে থাকি কুমায়ুনের পশুপক্ষীদের কথা।

কুমায়ুনের গিরি-কান্তার সংকীর্ণ গিরি-সংকট ও সবুজ বনে বোঝাই। কুমায়ুনের তৃণভূমি ঝোপ-ঝাড় ও বড় বড় ঘাসে পরিপূর্ণ। তাই কুমায়ুন প্রাণী-সম্পদে সম্পদশালী। নানা বর্ণের, নানা জাতির সংখ্যাতীত পশুপক্ষীদের আনন্দ-নিকেতন কুমায়ুন।

কুমায়ুনের গিরি-কান্তারে আছে অজগর, গোখরো প্রভৃতি বিষাক্ত সাপ। আছে হাতী, হায়না, হনুমান ও হরিণ, বানর, শজারু, শেয়াল, বাঘ, ভালুক ও লেপার্ড। আছে সেরো মার্তেন মার্মোট কস্তুরী ও লেজহীন ইঁদুর। আছে তুষার-মোরগ, বন-মোরগ, ময়ূর মুনিয়াল চড়ুই রুবি-থ্রোট, রক্-থ্রাস, রেডস্টার্ট, স্টোনচ্যাট্, ডিপার, দাড়িওয়ালা শকুন ও সোনালী ঈগল, আরও কত রকমের পাখি। আছে ট্রাউট মহাশোল প্রভৃতি নানা রকমের মাছ।

মাছ নয় পাখিদের কথাই প্রথম আলোচনা করছিলাম আমরা। রুবি-থ্রোট্

বাসা বাঁধে তেরো থেকে ষোল হাজার ফুট উঁচুতে। মানুষ দেখলে ভারী আনন্দ হয় ওদের। তাই অভিযাত্রীরা যখন তাঁবু ফেলে, ওরা রোজ সকালে গান গেয়ে ঘুম ভাঙ্গায় তাদের। বুগিয়ালে বাস করে নীল রং-য়ের রবিন্‌ ফ্লাইক্যাচার। তারাও রোজ সকালে গান গেয়ে ঘুম ভাঙ্গায় মেষপালকদের। সোনালী ঈগল অভিযাত্রীদের সঙ্গী হয় অনেক উঁচু পর্যন্ত। তারা মাঝে-মাঝেই তাঁবুর ওপর উড়ে বেরিয়ে অভিযাত্রীদের অভিনন্দন জানায়।

জিম করবেটের অমর গ্রন্থ 'ম্যান ইটারস অভ কুমায়ুন' নামটি শুনে অনেকেরই ধারণা কুমায়ুন মানুষখেকো বাঘে বোঝাই, আর তারা মনুষ্যরক্ত পানের নেশায় ব্যাকুল হয়ে কুমায়ুনের পথে ও প্রান্তরে পাগলের মত পায়চারি করছে। কুমায়ুনে পা দিলেই তারা ঘাড় মটকাবে।

ধারণাটা কিন্তু একেবারে মিথ্যে। কুমায়ুন প্রাণীসম্পদে সম্পদশালী হলেও এখানকার পথে মনুষ্যজীবন বিপন্ন নয়।

ভারতের বন্যজন্তুদের মধ্যে বাঘের স্থান সবার ওপরে। কিন্তু সব বাঘই নর-খাদক নয়। নর-খাদক না হলে বাঘ অকারণে মানুষকে আক্রমণ করে না। মানুষ যেমন বাঘকে ভয় করে, বাঘও তেমনি মানুষকে এড়িয়ে চলে।

নর-খাদক বাঘের মধ্যেও আবার রকমফের আছে। ১৯৬৩ সালের জুলাই মাসে গাড়োয়ালের ডুল্লোপট্টি এলাকায় একটি নারীমাংসপ্রিয় বাঘ দেখা গিয়েছিল। সে সুবিধা পেলেও পুরুষদের আক্রমণ করত না, কিন্তু মেয়ে দেখলেই তার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ত। তিন বছরে সে বহু নারী বধ করেছে।

বাঘ গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের প্রাণী। কাজেই তারা বাস করে নিচের দিকে। এসব অঞ্চলে বাঘ আছে কিনা বলতে পারি না। থাকলেও খুবই কম। তবে এ অঞ্চলে আছে স্নো-লেপার্ড, যাকে আমরা বাংলায় বলে থাকি তুষার-চিতা।

বাঘ নিষ্ঠুর ও ভয়ঙ্কর কিন্তু সে উদার ও সাহসী। সে লেপার্ডের মত সর্বভুক নয়। এরা উভয়েই বিড়াল জাতীয় প্রাণী—রাতের আঁধারে পরিষ্কার দেখতে পায়। উভয়েরই হত্যা করার পদ্ধতি মোটামুটি এক। তবু সাহসের তারতম্যে এদের শিকারের সময় পৃথক। মানুষখেকো বাঘ মানুষ মারে দিনের আলোয় আর মানুষখেকো লেপার্ড আঁধার রাতে লুকিয়ে লোকালয়ে এসে মানুষ নিয়ে পালিয়ে যায়।

সাধারণের ধারণা স্নো-লেপার্ড মাত্রই মানুষখেকো। তাই এ অঞ্চলের মানুষ ওদের ভয় করে। অথচ ওরা সবাই মানুষখেকো তো নয়ই বরং মানুষের

চেয়েও ভীতু। তাই দিনের বেলা ওরা কখনই লোকালয়ে আসে না। তবে এরা খুবই ধূর্ত। ফলে শিকারীরা এদের সঙ্গে তেমন সুবিধে করতে পারেন না।

বাঘের মতই স্নো-লেপার্ড মানুষের রক্তের স্বাদ পেলে মানুষখেকো হয়। অনেক সময়ে বৃদ্ধ বয়সে যখন ছুটোছুটি করে বন্যপশু শিকার করতে পারে না, তখন এরা মানুষ মারে। কারণ পশু মারার চাইতে মানুষ মারা অনেক সহজ। আবার অনেক সময় ব্যর্থ শিকারীর গুলি খেয়ে প্রতিহিংসাপরায়ণ বাঘ বা লেপার্ড নরখাদকে পরিণত হয়।

এ অঞ্চলের সব চেয়ে ক্ষতিকর প্রাণী কালো ভালুক। এদের সম্পর্কে মেষপালক গ্রামবাসীরা সর্বদা সশঙ্কিত। এদের থাবা থেকে ভেড়া ও ছাগলকে রক্ষা করার জন্য মেষপালকরা কুকুর পোষে। গ্রামবাসীরাও কুকুর রাখে। যাদের কুকুর নেই তারা সন্ধ্যার আগেই দোরে খিল দেয়। শত ডাকাডাকি করলেও খিল খোলে না।

কুমায়ুনে লাল কিংবা সাদা ভালুক খুবই কম। গাড়োয়ালের উচ্চভূমিতে মাঝে মাঝে লাল ভালুক দেখা যায়।

প্রাণীসম্পদে সম্পদশালী কুমায়ুন কিন্তু বিবেচনা ও দূরদৃষ্টির অভাবে আমরা এই অমূল্য সম্পদ প্রায় হারাতে বসেছি। কুমায়ুন ও গাড়োয়ালের গাঁয়ের মেলায় দেখেছি কস্তুরী বিক্রি হচ্ছে। তবে গাঁয়ের মানুষের সাধ্য কি তা কেনে। মহাজনদের দালাল কিনে নিয়ে চালান করছে শহরে। সেখান থেকে রপ্তানি হচ্ছে বিদেশে। ভারত অর্জন করছে বিদেশী মুদ্রা, যা এখন স্বর্গাদপি গরিয়সী। বর্তমানের মায়ায় আমরা ভবিষ্যৎকে হারিয়ে ফেলেছি। প্রাণী সম্পদে দরিদ্র হয়ে পড়ছে হিমালয়। কস্তুরী মৃগ আজ অবলুপ্তির পথে।

মনে পড়ছে সেবারের কথা। নীলগিরি পর্বত আরোহণের পরে আমরা গোবিন্দঘাট থেকে বদ্রীনাথ যাচ্ছিলাম। সহযাত্রীরা প্রাচীন পায়ে-চলা পথে অগ্রসর হচ্ছিল। আমি নির্মিয়মান মোটরপথ দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। একটা বাঁক পেরিয়ে দেখি কয়েকজন লোক কথাবার্তা বলছে। তাদের একজনের কাছে চার পায়ে দড়ি বাঁধা একটি মৃগশিশু। একটু দাঁড়িয়ে বুঝতে পারি ঐ মৃগশিশুই তাদের আলোচনার বিষয়। আর সেটি কস্তুরীমৃগ। সেই লোকটি কিছুক্ষণ আগে এটি ধরেছে। এখন বিক্রয় করছে—দরাদরি চলেছে। ক্রেতা বলে—বেশ, ছ'টাকা দিচ্ছি।

এবারে বিক্রেতার মন গলে। আমি তাকাই বন্দী মৃগশিশুটির দিকে। সে সজল নয়নে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। বোধ করি কিছু প্রার্থনা করে। কী? সে কি প্রাণভিক্ষা করছে?

ছ' টাকা কথাটা বার বার আমার কানে আঘাত করতে থাকে। আমি আবার সেই মৃগশিশুর দিকে তাকাই। সে তেমনি করুণ নয়নে চেয়ে আছে। নিজের অলক্ষ্যেই সহসা বলে উঠি, "সাত টাকা"

বিস্মিত বিক্রেতা আমার দিকে তাকায়। আমি আবার বলি, "আমি সাত টাকা দেব, কস্তুরীমৃগটি তুমি আমাকে দাও।"

ক্রেতা অসন্তুষ্ট হয় আমার আচরণে। সে চেঁচিয়ে ওঠে, "আমি আট টাকা দেব।"

"দশ টাকা", সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠি আমি।

এবারে ক্রেতা রণে ভঙ্গ দেয়। সে বুঝতে পারে, আমি সহজে ছেড়ে দেব না।

দশ টাকার একখানি নোটের বিনিময়ে সেদিন সেই মৃত্যুপথযাত্রী মৃগশিশু-টিকে আমি কিনে নিয়েছিলাম। তাকে কোলে তুলে নিয়েছিলাম। অনুভব করেছিলাম সেই মৃত্যুভয়ে ভীত মৃগশিশুর বুকের স্পন্দন। কিছুদূর এসে একটা জঙ্গলে তাকে দিয়েছিলাম ছেড়ে। মুক্তি পেয়েও পালিয়ে যায়নি সে। যতক্ষণ আমাকে দেখতে পেয়েছে সেইখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে আর শব্দহীন ভাষায় কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে। হয়তো বা আমার মঙ্গল কামনাও করেছে।

জানি না সে আজ কোথায়? তবু কস্তুরীমৃগের কথা উঠলেই তার কথা আমার মনে পড়ে। মনে পড়ে তার সেই সকরুণ চাহনি আর সকৃতজ্ঞ দৃষ্টির কথা।

কস্তুরীমৃগ ছাড়া আরও বহু রকমের হরিণ আছে কুমায়ুনের এ অঞ্চলে। এদের মধ্যে সব চেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য থার বা বার্কিং ডিয়ার। এদের মাথাটি সরু ও লম্বা। গলায় ও ঘাড়ে কেশর। গায়ের রং কুচকুচে কালো। তবে শৈশবে ওরা অত কালো থাকে না। থার শিশুর রং হয় মেটে কিংবা খয়েরী। সাধারণতঃ থার তিন থেকে সাড়ে তিন ফুট উঁচু হয়। এদের ওজন হয় প্রায় আড়াই মণ। আর শিং দুটির দৈর্ঘ্য এগারো থেকে ষোল ইঞ্চি।

থারের সংখ্যাও অনেক কমে এসেছে। শীতকালে এরা নিচে নেমে আসতে বাধ্য হয়। শিকারীদের তখন থার মারার মরশুম। গ্রামবাসীরাও রেহাই

দেয় না ওদের। তারা থার ধরার ফাঁদ পাতে। তাড়া দিয়ে ক্লান্ত করে ফেলে থারকে। বর্শা দিয়ে খুঁচিয়ে কিংবা লাঠি দিয়ে পিটিয়ে এই নিরীহ প্রাণীকে হত্যা করে। তারপর এদের চামড়া বিক্রি করে গাঁয়ের মেলায়।

থারের পরেই মনে পড়ছে ছাগজাতীয় প্রাণীদের কথা। বুড়েল বা বড়াল নামে এক রকমের পাহাড়ী ছাগল আছে এ অঞ্চলে। এরা অত্যন্ত চালাক, তাই শিকারীরা খুব সুবিধে করতে পারে না এদের সঙ্গে। ওয়ান ছাড়াবার পর থেকে আমরাও নাকি প্রচুর বুড়েল দেখতে পাব এ পথে। তবে টিলম্যান বা শিপটন যেমন বিরাট বিরাট বুড়েলের দল দেখেছেন, তেমনটি নাকি আর দেখা যায় না আজকাল। আগের চাইতে এদের সংখ্যা অনেক কমে গেছে। কিছু মারা পড়েছে শিকারীদের হাতে, আর কিছু মহামারীতে।

মাঝে-মাঝেই এদের মধ্যে মহামারী দেখা দেয়। এই মহামারীর কারণটি বেশ বিচিত্র। গ্রীষ্মকালে মেষপালকরা ভেড়া ও ছাগলের পাল নিয়ে বুগিয়ালে যায়। তখন বুড়েলরা এসে আলাপ জমায় সেই পালিত-পশুদলের সঙ্গে। তাদের সঙ্গে খেলা করে। ফলে পালিত পশুদের কোন সংক্রামক ব্যাধি থাকলে, তা বুড়েলদের মধ্যে সংক্রামিত হয়। প্রকৃতির কোলে অনন্ত হিমালয়ের বীজাণুহীন আবহাওয়ায় বড় হয়েছে তারা। সংক্রামক ব্যাধিকে রুখবার ক্ষমতা নেই ওদের শরীরে। তাই মহামারীতে দলে দলে বুড়েল মারা যায়।

আলোচনাটা আরও কতক্ষণ চলত কে জানে। কিন্তু সামনে কয়েকজন পথচারী দেখে আমি থেমে যাই। এ পথে পথচারী বড়ই কম। শহরে মানুষের ভিড়ে পথ চলা যায় না। তাই মানুষের মূল্য বোঝে না রাজপথের পথিক। জনহীন পথের দুঃখ জানে না তারা। সেই দুঃখ ভোগ করছিলাম আমরা। ওদের দেখে তাই আনন্দ হল আমাদের। নিজেদের কথা বন্ধ করে আমরা ওদের কথা শুনতে চাই। জিজ্ঞেস করি, "এ গ্রামের নাম কি?"

ওরা বলেন, "আখোড়ি। ছোট গ্রাম। এখান থেকে একটি পথ চলে গেছে আলিবুগিয়াল।"

বুগিয়াল মানে তৃণভূমি। ছোট বড ঘাসের ঢেউ খেলানো প্রান্তর। খুব উঁচু-নিচু নয়। হিমালয়ে যেমন নন্দন-কাননের মত পুষ্পময় উপত্যকা আছে, তেমনি আছে বিস্তীর্ণ তৃণময় প্রান্তর। সাধারণতঃ এগারো-বারো হাজার ফুট উঁচুতে এই তৃণভূমি বা বুগিয়াল হয়ে থাকে। এই সব বুগিয়াল গ্রীষ্মকালে সারা অঞ্চলের পশুচারণক্ষেত্রে পরিণত হয়। এ পথেও তেমনি দুটি বিখ্যাত

বুগিয়াল আছে—আলি ও বৈদিনী। উপেনবাবুর প্রধান আকর্ষণ বৈদিনী বুগিয়াল। তিনি এর উদ্ভিদ-সমীক্ষা করবেন। ইতিপূর্বে এ বুগিয়ালের কোন সরকারী সমীক্ষা হয় নি।

আখোড়ির পরে আর একটি গ্রাম—পুলা। এক জায়গায় জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে অনেকগুলো ছোটবড় ঘর। অথচ মানুষ নেই কোন ঘরে। সব ঘরই বন্ধ। জনশূন্য গ্রাম। এ গ্রামের বাসিন্দারা সবাই এখন ওয়ানে রয়েছে। শীত শুরু হলে তারা চলে আসবে এখানে। পুলা শীতকালীন ওয়ান। হিমালয়ের সর্বত্র এমনি শীতকালীন গ্রাম আছে।

পুলার পর থেকে পথটি ভারী সুন্দর। পথের পাশে গাছপালা আছে কিন্তু আগের মত ঘন জঙ্গল নেই। পথটি সামান্য চড়াই তবে একেবারে সোজা। ধীরে ধীরে সামনের সবুজ পাহাড়টির ওপরে পৌছেছে। মনে হচ্ছে কেউ একখানি বিচিত্র বর্ণের কোমল গালিচা বিছিয়ে রেখেছে।

পাহাড়ের ওপরে যেখানে পথটি গিয়ে শেষ হয়েছে, সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি গাছ—ঠিক একটি গাছ। জনহীন পথের শেষে প্রতীক্ষারত। কার জন্য? আমাদের জন্য কী? কে জানে?

একক বৃক্ষ আমাদের পথ চলায় নতুন প্রেরণার সঞ্চার করল। সকল শ্রম বিস্মৃত হয়ে আমরা চলার বেগ বাড়িয়ে দিলাম। যত শীঘ্র সম্ভব যেতে হবে ওর কাছে। কোমল গালিচাসম এই যে সরল ও সবুজ সরণি, এ যে আমাদেরই জন্য। ঐ যে একক বৃক্ষ, সে আমাদেরই প্রতীক্ষারত। প্রকৃতি যে হাতছানি দিয়ে ডাকছে আমাদের। বলছে—কাছে এসো, আরও কাছে। আমার এই আঁচল জড়ানো বুকের মাঝে—দুর্গম গিরি-কান্তারে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা এসে পৌছলাম এখানে। আর এসেই দু চোখ গেল জুড়িয়ে। দূরে ছবির মত সুন্দর একটি গ্রাম। তা হলে তো আমরা এসে গেছি ওয়ান, প্রায় পৌছে গেছি গন্তব্যস্থলে। দিনের যাত্রা হবে শেষ! সকল শ্রমের হবে অবসান। পথপ্রদর্শকের সাহায্য ছাড়াই আমরা এসেছি ওয়ান-এ। কি আনন্দ! আনন্দের আতিশয্যে সেই একক বৃক্ষতলে বসে পড়ি। প্রাণভরে ওয়ানকে দেখি। ভারী সুন্দর গ্রাম। পথের দুপাশে সারি সারি গাছ—চীর আর অন্যান্য গাছ। দু-একটি গাছে বকফুলের মত অজস্র ফুল ফুটেছে। তবে সে ফুলের রং সাদা নয় বেগুনী। লাল হলুদ ও সাদা রংয়ের ফুলগাছও আছে মাঝে মাঝে। গাছের ফাঁকে ফাঁকে পথের ওপরে ও নিচে বাড়িঘর।

অনেকটা করে জমি নিয়ে এক-একটি বাড়ি। একটি বাড়ির সঙ্গে আর একটি বাড়ির দূরত্ব লক্ষ্য করবার মত। দেখে মনে হচ্ছে সাধারণ পাহাড়ী গ্রাম নয়, যেন কোন বিখ্যাত শৈলাবাস।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে. দেবকীদা বললেন, "কালকের থেকে আজ অনেক তাড়াতাড়ি হেঁটেছি, কি বল ?"

"তা তো হাঁটবই। কাল যে প্রথম দিন ছিল।" অসিতবাবু উত্তর দেন।

"আমরা কি এখানেই বীর আর সুজলের জন্য অপেক্ষা করব ?" অমিতাভ জিজ্ঞেস করে।

"যদি বৃষ্টি এসে যায় ?" দাশু বলে।

আকাশের দিকে তাকিয়ে মোহিত বলে, "এসে যায় কি, এসে গেল বলে।"

"তাহলে তো আর দেরি করা ঠিক হবে না। আমরা বরং ডাকবাংলোতে গিয়ে ওদের জন্য অপেক্ষা করি।" অসিতবাবু উঠে দাঁড়ান। আমরা তাঁকে অনুসরণ করি।

গ্রামের পথ ধরে এগিয়ে চলেছি। প্রতি বাড়িতেই বাসিন্দাদের সাড়া পাচ্ছি। সন্ধ্যা সমাগমে ঘরে ফিরে ওরা সংসারের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। তাই আমরাই কেবল চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখছি, আমাদের কেউ দেখছে না।

না দেখুক। আমরা দেখতে এসেছি। প্রাণভরে দেখে নিই।

ওপরের দিকে একটি বাড়ি দেখে মনে হয় ওটাই ডাকবাংলো। খাড়া চড়াই বেয়ে উঠে আসি ওপরে। আর এসেই বুঝতে পারি, ভুল হয়েছে। ডাকবাংলো নয়, কোন গৃহস্থের বাসগৃহ। কিন্তু এখন আর পালাবার পথ নেই। গুটিচারেক পাহাড়ী কুকুর চারদিক থেকে বন্দী করেছে আমাদের। আমরা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আইস এক্স উঁচিয়ে কোনরকমে আত্মরক্ষা করছি আর বৃষ্টিতে ভিজছি। ইতিমধ্যে কৌতূহলী গৃহস্বামী লাঠি হাতে সপরিবারে বেরিয়ে আসেন বাইরে। সব শুনে কিছুক্ষণ হেসে নেন। তারপরে ধীরেসুস্থে জানান—ভুল হয়েছে, এ বাড়িটা যেমন ডাকবাংলো নয়, তেমনি এ গ্রামটিও ওয়ান নয়।

"তাহলে ? এটা কোন্ গ্রাম ?" হতাশ কণ্ঠে নেতা বলেন।

"তলওয়ানী। ওয়ান এর পরের গ্রাম। তা আপনারা একটু ঘরে এসে বসুন না, বৃষ্টি কমলে রওনা হবেন।" গৃহস্বামী আহ্বান করেন আমাদের।

প্রস্তাবটা মন্দ নয়। আমরা তাঁর পেছনে উঠে আসি ঘরে। ভেতরে এসে

তাকে সুজল আর বীরের কথা বলি। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর এক ছেলেকে ছাতা দিয়ে পাঠিয়ে দেন বড় রাস্তায়। আমাদের জন্য চায়ের ফরমাস করেন।

চা আসার আগে ওরা এসে গেল। সুজল ভালই আছে। চা খেয়ে কয়েক মিনিট পরে আমরা গৃহস্বামীকে সকৃতজ্ঞ নমস্কার করে পথে বেরিয়ে আসি। বৃষ্টি প্রায় কমে গেছে। কিন্তু পথ বড়ই পিচ্ছিল। বীর বলে, "বড় রাস্তা দিয়ে গেলে ওয়ান পৌঁছতে প্রায় দু ঘণ্টা লাগবে।"

দু ঘণ্টা! আমরা হতাশ হয়ে পড়ি।

বীর বলে, "একটা সর্ট-কাট আছে। বড় জোর ঘণ্টাখানেক লাগতে পারে। কিন্তু পথটা তেমন ভাল নয়।"

"আমরা সে পথেই যাব।" সুজল বলে ওঠে।

"জংলা পথ, চড়াই-উৎরাই, জল-কাদা—আপনি পারবেন কি ?"

"নিশ্চয়ই।" সুজল বলে, "গরম গরম চা খেয়েছি, এখন আমার শরীর পুরো ঝরঝরে।"

অতএব আমরা বীরের সঙ্গে তার সর্ট-কাট ধরি। একটু বাদেই বুঝতে পারি সর্ট-কাটের মহিমা। পথ বলে কিছু নেই। বর্ষণসিক্ত পিচ্ছিল পাহাড়ের গা বেয়ে লতা-পাতা ও গাছের গুড়ি ধরে ধরে এগোচ্ছি। কখনও হাঁটছি, কখনও হামাগুড়ি দিচ্ছি। মাঝে মাঝেই খরস্রোতা পাহাড়ী ঝর্ণা পেরোতে হচ্ছে। বরফের মত ঠাণ্ডা জল। জলে নামা মাত্র পা অবশ হয়ে যাচ্ছে। প্রথমে বীর গিয়ে ওপারে উঠছে। তারপরে আমরা হাত ধরাধরি করে কোনমতে তার কাছে পৌঁছচ্ছি। সে একে একে আমাদের টেনে তুলছে। রক্ষা যে কালকের মত জোঁক নেই। কিন্তু অন্ধকার একই রকম। টর্চের আলো সামান্যই সাহায্য করছে। কাল বর্ষাতি সঙ্গে ছিল না। জলে ভিজেছি। আজ বর্ষাতি গায়ে চাপিয়ে ঠিক মত চলতে পারছি না। কেবলই আছাড় খাচ্ছি।

আধঘণ্টাখানেক চলার পরে বীর জানায় আর তেমন বড় ঝর্ণা নেই পথে, তবে এর পরে চড়াই আরও খাড়াই।

তেমনি হামাগুড়ি দিয়ে অথবা বুকে ভর করে ওপরে উঠছি। ঝোপঝাড় পেলে সুবিধা হচ্ছে। তাই ধরে সহজে উঠতে পারছি। কিন্তু কাঁটায় হাত ছড়ে যাচ্ছে কিংবা বিছুটির ঘষা লেগে পা জলে যাচ্ছে। তবু চলতে হচ্ছে। থামার উপায় নেই। অবশেষে পাহাড় পেরিয়ে পৌঁছলাম একটা পায়ে-চলা পথে।

পথ তো নয়, মৃত্যুর পরোয়ানা! জলে কাদায় নিমজ্জিত। একদিকে পাহাড়, আর একদিকে খাদ। চলতে বড়ই কষ্ট হচ্ছে। পা টল্‌ছে। এর চাইতে চড়াই অনেক ভাল ছিল। কিন্তু সে ভালর জন্য এখন দুঃখ করে কি হবে? বর্তমানের চেয়ে বড় সত্য যে কিছু নেই এ জগতে। কিন্তু পা দুটো যে আর শরীরের ভার বইতে পারছে না।

বীর যে বলেছিল পথে আর কোন বড় ঝর্ণা পড়বে না! সামনে তা হলে ওটা কি? ঝর্ণা বলেই তো মনে হচ্ছে। তবে কি আমাদের ওপারে যেতে হবে না?

বীর হেসে দেয়। বলে, "এটা না পেরোলে ডাকবাংলোয় পৌছবেন কেমন করে?"

"তুমি যে বলেছিলে আর কোন বড় ঝর্ণা নেই পথে। এটাকে তো বেশ বড় বলেই মনে হচ্ছে।"

"হ্যাঁ, বড় বৈকি। এটা হল গিয়ে লাটুদেবীর নদী। এই নদীর তীরেই লাটুদেবীর মন্দির। আর ওপারেই ডাকবাংলো।"

অগত্যা বীরের পেছনে জলে নেমে পড়ি। যেমন ঠাণ্ডা জল, তেমনি প্রবল স্রোত। তবু কোনমতে হাত ধরাধরি করে উঠে আসি অপর পারে।

আবার তেমনি পাহাড়ের গা বেয়ে চড়াই পথ। পাছে আমরা নিরুৎসাহ হই, তাই বীর বলে, "ওপরে উঠলেই ডাকবাংলো, খুবই কাছে।"

আমরা চড়াই ভেঙ্গে ওপরে উঠি। আর উঠেই দেখতে পাই ওয়ান ডাকবাংলো। আমরা ছুটতে শুরু করি। বীর সাবধান করে, "দেখবেন পথ ভাল নয়।"

কিন্তু কে তার কথা শোনে! আমরা ছুটতে ছুটতে একেবারে ডাকবাংলোর বারান্দায় এসে হাজির হই। সব চেয়ে বিস্ময়কর, সুজলও আমাদের সঙ্গেই ছুটে এসে পৌছল এখানে। এখন ওকে দেখে কে বলবে যে কাল ও জখম হয়ে ছিল, আজও ঠিকমত পথ চলতে পারে নি। অন্ধ আসে দেবদর্শনে, খঞ্জ আসে গিরিতীর্থে। কোথা থেকে তারা পায় পথ চলার শক্তি? যিনি দেবের দেব, যিনি সর্বশক্তিমান, তিনিই শক্তি যোগান দুর্বলকে। হিমালয় তো সেই শক্তিধরেরই শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। তাঁরই আশীর্বাদে আজ আমরা নির্বিঘ্নে পৌছতে পেরেছি এখানে। তাঁকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

॥ তেরো ॥

ওরা বসেছিল বারান্দায়। ঘোড়াওয়ালা, মিসেস ঘোড়াওয়ালা ও চৌকিদার। বসেছিল আলো জ্বালিয়ে, আমাদেরই অপেক্ষায়। আমরা আসতেই উঠে দাঁড়ায়। চৌকিদার দরজা খুলে দেয়। আমরা ভেতরে প্রবেশ করি।

ডাকবাংলোটি সুন্দর। সামনে বড় রাস্তা। আমরা এসেছি পেছন দিক থেকে। তাই হঠাৎ হাজির হয়েছে আমাদের সামনে। নইলে বড় রাস্তা দিয়ে এলে বহুদূর থেকে দেখা যায় ডাকবাংলো। রাস্তার পরে ছোট একফালি সবুজ জমি। তার পরে ডাকবাংলো। একখানি বড় ও একখানি মাঝারি ঘর। রান্না ও ভাড়ার ঘর আলাদা। পেছনে বারান্দা।

ঘরে ঢুকে ভেজা জুতো মোজা ছেড়ে ক্যাম্প সু পরে নিই। তারপরে গায়ে সোয়েটার চাপাই। চলার সময়ে শীত লাগে নি। থামতেই হিমেল হাওয়া কাঁপুনি ধরিয়েছে। ওয়ান ৮০০০ ফুট উঁচু। তার ওপর আজ আবার বৃষ্টি পড়েছে। বৃষ্টির বহরটা দেখে খুশি হতে পারছি না। বৃষ্টি পড়লেই পাহাড়ী নদীতে বান ডাকে। পথে ধস নামে, পুল ভাঙ্গে আর বরফ পড়ে। রূপকুণ্ড তুষারাবৃত হ্রদ। সারা বছরে মাত্র মাসখানেকের জন্য সেই হ্রদের বরফ গলে জল হয়। এখানে বৃষ্টি হলে সেখানে তুষারপাত হবে। রূপকুণ্ডের জল যাবে জমে। ফলে সেই রহস্যময় কঙ্কালের স্তূপ চাপা পড়বে বরফের তলায়। বিফল হবে আমাদের এই দুর্গম গিরি-কান্তার পরিক্রমা।

চৌকিদার চা নিয়ে আসে। আমরা খুশি হই। মোহিত বিস্কুটের টিন খোলে। বীর সিং রুকস্যাক খুলে মগ বের করে সবাইকে চা পরিবেশন করে। আর ঠিক তখনই ঝড়ের মত ঘরে ঢোকে রামচাঁদ। ওর সময়টা ঠিক আছে। বীর নিজের ভাগ থেকে তাকে অর্ধেকটা চা দেয়। মোহিতের কাছ থেকে বিস্কুট চেয়ে নিয়ে সে চায়ে চুমুক দেয়। তার পরে মাতব্বরী চালে বলে, "যাক আপনারা ঠিক মত এসে গেছেন তাহলে।"

"তুমি কি আশা করেছিলে, আমরা আসতে পারব না?" অসিতবাবুর কণ্ঠে তীব্র অসন্তোষ।

"না।" একটা ঢোক গেলে রামচাঁদ। "তবে পথে আপনাদের সঙ্গে

মুলাকাত হল না, তাই একটু চিন্তার মধ্যে ছিলাম।"

"তুমি বুঝি ভেবেছিলে, মান্দোলীতে তুমি যত দেরিই কর, আমরা তোমার জন্য বৃষ্টি মাথায় করে বসে থাকব পথে?"

অসিতবাবুর গলার স্বরে চমকে উঠি। তিনি কি ভুলে গেলেন এটা রামচাঁদের এলাকা। এখানে ওর সঙ্গে ঝগড়া করলে কুলি পাওয়া যাবে না। রূপকুণ্ড দর্শন হবে না। তাই রামচাঁদ কিছু বলার আগেই বলে ফেলি, "আমরা বড় রাস্তা দিয়ে আসি নি কিনা তাই। আমরা পিছনের পথ দিয়ে এসেছি।"

"বীর বুঝি ঐ বুরা রাস্তায় নিয়ে এসেছে আপনাদের?" সে কটমট করে বীর সিং-এর দিকে তাকায়।

বীর নতমস্তকে নির্বাক থাকে। কিন্তু দেবকীদা বলেন, "তবু বীর সঙ্গে ছিল বলে, আজ আসতে পেরেছি এখানে। নইলে আমরা হারিয়ে যেতাম হিমালয়ের জঙ্গলে।"

"কী যে বলেন!" মুচকি হেসে অবস্থাটা আয়ত্তে আনতে চায় রামচাঁদ।

কিন্তু অত সহজে ভুলবার পাত্র নন আমাদের নেতা। তিনি বলেন, "পরশু থেকে পথে বেরিয়ে তুমি সব সময়ে আমাদের সঙ্গে থাকবে।"

আশ্চর্য! রামচাঁদ কিন্তু কোন আপত্তি করে না। বরং নিতান্ত অমায়িক ভাবে উত্তর দেয়, "তা তো থাকতেই হবে, নইলে আপনারা রাস্তা চিনবেন কেমন করে?"

অসিতবাবু আর কথা বাড়ান না। রামচাঁদও যেন কিছুই হয় নি ভাব দেখিয়ে বলে, "তা হলে ঐ কথাই রইল। আমি এখন বাড়ি যাচ্ছি। কুলি যোগাড় করতে হবে। এবারে তাহলে ঘোড়াওয়ালার টাকাটা মিটিয়ে দিন।"

"এত রাতে?" বিস্মিত হন অসিতবাবু। "ওরা তো আজ এখানেই থাকছে। কাল সকালে হিসেব করে টাকাটা দিয়ে দেব।"

"কাল সকালে?" রামচাঁদ যেন আশাহত।

"কেন কোন অসুবিধে আছে?"

"না, আমাকে তাহলে আবার সকালে আসতে হয়। ওদিকে আবার কুলি যোগাড়ের অসুবিধে হবে কিনা।"

"তোমার আসার কি দরকার? পাঁচটা ঘোড়ার তিনদিনের পাওনা মিটিয়ে দেব। টাকা নিয়ে চলে যাবে ওরা।"

মোহিত বলে, "তিনদিন কেন অসিতদা?"

"খালি ঘোড়া ফিরে যাচ্ছে বলে একদিনের ভাড়া দিতে হবে।"

রামচাঁদ চুপ করে থাকে। কি যেন ভাবে। তারপরে বলে, "আমি না থাকলে আবার গোলমাল করতে পারে কিনা, আচ্ছা আমি কাল সকালে একবার আসব। আমি না এলে ওকে টাকাটা দেবেন না।"

রামচাঁদের যুক্তিটা অর্থহীন। ঘোড়াওয়ালার টাকা দেবার সময় তার উপস্থিতির কোনো প্রয়োজন নেই। কারবারটা আমাদের মধ্যে। তবে তার নিজের কোন প্রয়োজন থাকতে পারে। কি প্রয়োজন? পঞ্চম ঘোড়াটির বাবদ কোন কমিশন? কে জানে?

আমরা চুপ করে থাকি। আমাদের নমস্কার করে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় রামচাঁদ।

অসিতবাবু বলেন, "কাল ও আসার আগেই আমি ঘোড়াওয়ালার টাকা মিটিয়ে দেব। তাকে বলে দেব রামচাঁদকে যেন এক পয়সাও না দেয়।"

পরদিন। ঘুম ভাঙ্গে কড়ানাড়ার চড়া শব্দে। এত ভোরে আবার কে এলো? উপেনবাবু নয়তো! কিন্তু তিনি এখন আসবেন কেমন করে? আর তো কোন পরিচিত লোক নেই এখানে। আছে। রামচাঁদ। কিন্তু সে কি এই সাতসকালে হাজির হবে? এখনও যে সাতটাই বাজে নি। কদিন পরে ঘরে ফিরেছে। আজ একটু আরাম করে ঘুমিয়ে নেবে। না রামচাঁদ নিশ্চয়ই নয়। তবে কে?

বীর সিং দরজা খোলে। রামচাঁদ ঘরে ঢোকে, "গুড্ মর্ণিং সাব।"

অসিতবাবু চোখ রগরাতে রগরাতে বলেন, "মর্ণিং।"

আমরাও বিরক্ত ভাবে তাকে শুভদিন জানাই।

অসিতবাবু উঠে বসেন। বলেন, "এত সকালে?"

একটু হেসে সে বলে, "এসেছিলাম এদিকে, কুলির খোঁজে। লোকটা খুব সকালে বেরিয়ে যাবে শুনেছিলাম। ভাবলাম একবার দেখে যাই সাবদের। আর…সেই সঙ্গে ঘোড়াওয়ালার টাকাটাও মিটিয়ে দিয়ে যাই।"

হায় অর্থ, তুমি কত অনর্থ ঘটাতে পারো। কি অসীম তোমার শক্তি, কত বিচিত্র তোমার প্রকাশ। মানুষ তোমাকে কত ভালবাসে। তোমার জন্য এই শীতের সকালে রামচাঁদ আরামকে হারাম জ্ঞান করে ছুটে এসেছে এখানে। দুঃখ হচ্ছে অসিতবাবুর জন্য। তিনি বলেছিলেন, রামচাঁদ আসার আগেই

ঘোড়াওয়ালার পাওনা মিটিয়ে দেবেন। কিন্তু তিনি হেরে গেলেন রামচাঁদের কাছে।

পরাজিত নেতা বাধ্য হয়ে সন্ধি করেন, "তব ঘোড়াওয়ালাকো বোলাও।"

"আবার আপনি কষ্ট করবেন ? কি দরকার ?" রামচাঁদ বলে, "আমাকেই দিন না, আমি গিয়ে দিয়ে দিচ্ছি।"

নেতা হিসেবে অসিতবাবুর ঘোড়াওয়ালাকে দরকার আছে বইকি। সব টাকাটা যাতে সে পায়, তা তাঁর দেখা দরকার। তবু তিনি চুপ করে থাকেন। ভদ্রতার খাতিরে মানুষকে অনেক সময় অন্যায়কে মেনে নিতে হয়।

তাই করলেন তিনি। তবে একবার রামচাঁদের দিকে তাকালেন। রামচাঁদ সে দৃষ্টি সহ্য করতে পারল না, সে মাথা নত করে।

আমরা অসিতবাবুর দিকে তাকাই। অসিতবাবু মৃদু হেসে তাঁর রুকস্যাকের কাছে এগিয়ে যান। কাগজ কলম বের করে রসিদ লেখেন। রসিদখানি রামচাঁদের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলেন, "এটা সই করে দাও।"

রামচাঁদ নিঃশব্দে সই করে। অসিতবাবুর হাত থেকে টাকাটা নেয়। একবার আমাদের দিকে তাকায়। তারপরে কোনমতে বলে, "টাকাটা দিয়েই আমি কুলি যোগাড়ে যাচ্ছি। আপনারা চা খেয়ে মাল বাঁধা শুরু করে দিন। আমি এগারোটার মধ্যে এসে যাব।" রামচাঁদ তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যেতে চায়। যেন পালিয়ে যাচ্ছে। সত্যই কি তাই ?

কিন্তু অত সহজে তাকে নিষ্কৃতি দিতে চান না অসিতবাবু। তিনি ডাক দেন, "রামচাঁদ ?"

সে ফিরে আসে।

নেতা জিজ্ঞেস করেন, "তিরিশ সের করে মাল বাঁধব তো ?"

"জী সাব।"

"কজন কুলি নিচ্ছ ?"

"পনেরো জন।"

"কেন ?"

"তাই লাগবে। পাঁচ ঘোড়ার মাল বইতে পনেরো জনই লাগে।"

"পাঁচ নয়, চার ঘোড়ার মাল পাঁচ ঘোড়ায় এনেছে।" মোহিত আর চুপ করে থাকতে পারে না।

রামচাঁদ মোহিতের উক্তিতে অসন্তুষ্ট হয়। সে চুপ করে থাকে। অমিতাভ

বলে, "আমাদের দশজন কুলিতে হয়ে যাবে।"

রামচাঁদ চুপ করে আছে। আমরা তাকে লক্ষ্য করছি। সহসা দেবকীদা বলে ওঠেন, "তুমি ভুল করছ অমিতাভ, আমাদের পনেরো জন কুলিরই দরকার হবে।"

খুশিতে উপচে পড়ে রামচাঁদ। সে হাসতে হাসতে অমিতাভকে বলে, "বড়াসাবের গিনতি ঠিক আছে।"

অসিতবাবুর মত আমরাও দেবকীদার প্রতি অসন্তুষ্ট হই। বিস্মিতও হই। তিনি সাধারণতঃ এ রকম কথা বলেন না। কিন্তু আমরা কোন প্রতিবাদ করি না, চুপ করে থাকি।

দেবকীদা আবার বলেন, "তোমার হিসেব ঠিক আছে রামচাঁদ। সাবরা ভুলেই গিয়েছেন যে ডক্টর ভট্টাচার্য আজ বিকেলে এসে যাবেন আর তাঁর চার-পাঁচজন কুলির দরকার।"

রামচাঁদের হাসি মিলিয়ে যায়। এখন হাসি পাচ্ছে আমাদের। বীর বেরিয়ে যায় ঘর থেকে—বোধ করি হাসতে। রামচাঁদের সামনে তার হাসতে মানা।

দেবকীদার পরিহাসটুকু নীরবে হজম করে রামচাঁদ। স্বাভাবিক স্বরেই বলে, "ঠিক আছে, তাই আনব।"

"কত করে চাইছে ওরা?" দাশু জিজ্ঞেস করে।

"এখনও দর ঠিক হয় নি।"

"স্বামীজী কিন্তু বলে দিয়েছেন দৈনিক চার টাকায় তিরিশ সের করে মাল বইবে।"

"হ্যাঁ, আমাকেও তিনি তাই লিখেছেন। চেষ্টা তো করছি, দেখা যাক কি করা যায়।" রামচাঁদ বেরিয়ে যায়। এবারে আর অসিতবাবু ডাকেন না তাকে। বরং রামচাঁদ বেরিয়ে গেলে তিনিও আমাদের সঙ্গে হাসিতে ফেটে পড়েন।

হাসতে হাসতে বীর ঘরে ঢোকে। সে জনতা জ্বালায়। কফির জল বসিয়ে আমাদের তাগাদা দেয়, "হাত মুখ ধুয়ে নিন। নাস্তা করেই বেরিয়ে পড়তে হবে।"

"কোথায়?" দাশু প্রশ্ন করে।

"স্নান করতে আর লাটুদেবীর পুজো দিতে।"

"কিন্তু রামচাঁদ যে বলে গেল মাল বাঁধতে। সে এগারোটায় আসবে।"

"বলুক গে। মাল বাঁধার অনেক সময় হাতে আছে। এখন বৃষ্টি নেই, চলুন পূজোটা সেরে আসি। এখানে লাটুদেবীর পূজো না দিয়ে কেউ রূপকুণ্ডে যায় না।"

"পূজো দেওয়া যাবে। কিন্তু তার আগে বলে ফেল দেখি, কি দিয়ে নাস্তা করা হচ্ছে?" সুজল নিজের কথায় ফিরে আসে।

"রুটি আর হালুয়া।" বীর বলে।

"এখন রুটি বানাবে নাকি?" সুজল আঁতকে ওঠে।

"না। কাল রাতেই বানিয়ে রেখেছি। আজ কেবল হালুয়া হবে।"

"চমৎকার, থ্রি কোর্স ব্রেকফাস্ট। থ্রি চিয়ার্স ফর কমরেড্ বীর।"

"হিপ্ হিপ্ হুররে…।"

আমরা থামলে নেতা ঘোষণা করেন, "কফির সঙ্গে তোমরা আরও একটি কোর্স পাবে।"

"কি?" সজল প্রশ্ন করে।

"ব্রিটানিয়া ক্রীম ক্র্যাকার।"

"ফোর চিয়ার্স ফর আওয়ার মাইন্ডার লীডার…"

অসিতবাবু মারতে যান সুজলকে। সুজল আত্মরক্ষা করতে বাথরুমে গিয়ে ঢোকে।

চৌকিদার পার সিং-এর সঙ্গে একজন অপরিচিত লোক ও সস্ত্রীক ঘোড়াওয়ালা হাজির হয়। ঘোড়াওয়ালা ফিরে যাচ্ছে। সে বিদায় নিতে এসেছে। লোকটি বড়ই নিরীহ। দুদিনের পরিচয় কিন্তু দুর্দিনের সাথী। দুর্গম পথের সেবক। ওরা আজ চলে যাচ্ছে আমাদের ছেড়ে। আর হয়তো কোনদিন দেখা হবে না ওদের সঙ্গে। স্বামী-স্ত্রী সসম্মানে নমস্কার করে আমাদের। লাটুদেবীর কাছে আমাদের নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রার্থনা জানায়। তারপরে ঘোড়া কটিকে সঙ্গে নিয়ে চলে যায় বড় রাস্তার দিকে। ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে যায়।

সঙ্গীকে দেখিয়ে পার সিংকে প্রশ্ন করে দাশু, "এ কি তোমার ভাই নাকি?"

"হ্যাঁ। মিলিটারীতে ছিল।" পার উত্তর দেয়।

"এখন কি করে?" মোহিত বলে।

"গাইডের কাজ করে সাব।"

"নাম কি?" সুজল বলে।

"হুকুম সিং।"

"ও, এই তাহলে হুকুম সিং?" অসিতবাবু বলেন।

"জী সাব।" হুকুম সিং সবাইকে সেলাম করে।

অমায়িক ও ভদ্র চেহারা। এর কথা আমরা শুনেছি অনেকের কাছে। শুনেছি সে রূপকুণ্ড পথের অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য পথপ্রদর্শক। কিন্তু তার মজুরী রামচাঁদের থেকে কম। কারণ রামচাঁদ তার চেয়ে অভিজ্ঞ। বেশ বুঝতে পারছি, অতিরিক্ত বস্তুটা কখনই মঙ্গলদায়ক নয়। অতিরিক্ত অভিজ্ঞ পথপ্রদর্শক নিয়োগ করার খেসারত দিতে হচ্ছে আমাদের। কথাটা বলে ফেলি হুকুমকে। হুকুম সব শুনে চুপ করে থাকে। বোধ করি রামচাঁদের বিরুদ্ধে কিছু বলতে সাহসী হচ্ছে না সে। রামচাঁদ ওয়ান গাঁয়ে অত্যন্ত প্রভাবশালী। অসিতবাবু তবু বলেন, "তোমার খোঁজে কোন কুলি নেই?"

"আছে সাব।"

"তাহলে আমাদের দাও না কয়েকজন যোগাড় করে।"

"তা তো পারব না সাব।" হুকুম বিনীত কণ্ঠে বলে।

"কেন?" অসিতবাবু বিস্মিত।

"আপনারা রামচাঁদকে জোগাড় করতে বলেছেন। এখন আর আমার কথায় কেউ যাবে না। তার লোকই নিতে হবে আপনাদের।"

"কিন্তু সে তো আমাদের থেকে বেশি পয়সা নেবে।"

"তা...একটু ..." সে শেষ করে না।

"এ তো জুলুম।"

"ওকে সঙ্গে নিলে..."

অসিতবাবুও আর কিছু বলেন না। বোধ করি ভাবছেন হিমালয়ের কথা। দেবতাত্মা হিমালয়। আর মানুষ?

অপ্রিয় প্রসঙ্গটার অবসানের জন্যই বোধ হয় বীর সহসা বলে ওঠে, "এবারে চলুন, বেরিয়ে পড়া যাক।"

"তুমি যে যাচ্ছ আমাদের সঙ্গে, রান্নাবান্নার কি হবে?" সুজল চিন্তিত।

"আজ আমাদের অরন্ধন।" অসিতবাবু বলেন।

"কেন, দোকানে খাব?"

"না।"

"তাহলে কি উপোস নাকি ?"

অসিতবাবু নীরব।

বীর হেসে বলে, "এ বেলা চৌকিদার আমাদের রান্না করে দেবে।"

"তাই বল। বাপ্‌রে বাপ। বড্ড ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে। তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি অসিতদা, আর কখনও আমাকে এমন দুশ্চিন্তায় ফেলবে না। আমার তাহলে সেলিব্র্যাল অ্যাটাক হয়ে যাবে।"

অসিতবাবু কিন্তু সুজলকে অ্যাটাক করলেন না। বরং আমাদেরই সঙ্গে হাসিতে ফেটে পড়লেন।

॥ চোদ্দ ॥

ওয়ান একটি সবুজ প্রদীপাকৃতি উপত্যকা। তিনদিকে বারো-তেরো হাজার ফুট উঁচু ধূসর কালো কিংবা সবুজ পাহাড। পাহাড়গুলির উপরিভাগ বৃক্ষহীন, তাই কালো কিংবা ধূসর তাদের রং। শীতকালে অবশ্য রং পালটায়—তুষার-ধবল। শুধু পাহাড় নয়, চারিদিকের সব কিছু। এমন কি নিচের এই উপত্যকায় পর্যন্ত ছ-সাত ফুট বরফ জমে যায়।

তাই তখন মানুষ থাকে না এখানে। অধিবাসীরা তুষারপাতের আগেই নেমে যান নিচে। জনহীন ওয়ান অনন্ত প্রকৃতির কোলে ঘুমিয়ে থাকে।

গ্রীষ্মের শুরুতে অধিবাসীরা ফিরে আসেন। ওয়ানের ঘুম ভাঙ্গে। তুষার-মুক্ত গ্রাম আবার জনপদে পরিণত হয়।

উপত্যকার তিনদিকের এই পাহাড়গুলির অদ্ভুত সব নাম—তিলবুলি, থামিলা, ফুলকোট, শুকরি ও পট্টি। ডাকবাংলোর সামনের পাহাড়টির নামই পট্টি। এ পাহাড়টির চারটি শিখর। তাই একে ওরা বলেন চারশূল।

ছোট ছোট গাছ, ক্ষেত-খামার আর বাড়ি-ঘরে বোঝাই ওয়ান উপত্যকা। প্রধান পথটি চলে গেছে দেবল হয়ে গোয়ালদাম। ছোট ছোট পথ ওপর কিংবা নিচের থেকে এসে মিশেছে মূলপথে। পাশের পাহাড়ের গায়েও অনেকটা উঁচু পর্যন্ত বাড়ি-ঘর। তার পরে বড় বড় গাছের গভীর বন। বেশ কিছুদূর বিস্তৃত হয়ে হঠাৎ এক জায়গায় গিয়ে থেমে গেছে। হিমালয়ের

গাছপালার ধর্ম এই। একটা বিশেষ উচ্চতা পর্যন্ত এক এক জাতীয় গাছ জন্মাতে পারে।

ওয়ানের চারিপাশে আরও কয়েকটি ছোট ছোট গ্রাম আছে। সেই সব গ্রামকে নিয়ে বৃহত্তর ওয়ানের আয়তন বারো বর্গমাইল। মূল ওয়ান গ্রামে এক হাজার মানুষ বাস করেন। এখানে একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও পঞ্চায়েত ঘর আছে।

ওয়ান থেকে একটি পথ গেছে শুকরি হয়ে ভূণা—সাত মাইল। সেখানে একটি বন-বিশ্রাম গৃহ (৯০০০ ফুট) আছে। ভূণা কুটচাষের জন্য বিখ্যাত। কুটগাছে গাঁদা ফুলের মত ফুল ফোঁটে। এই গাছের শেকরকে রোদে কিংবা আগুনে শুকোলে মাটি ছেড়ে যায়। তখন সেই শেকর থেকে ওষুধ তৈরি হয়। শুকরির উচ্চতা সাড়ে এগারো হাজার ফুট। এই পথেও বাগচো হয়ে পাথর নাচুনি তথা রূপকুণ্ড যাওয়া যায়। আমরা বুগিয়াল দেখবো বলে বৈদিনী হয়ে যাচ্ছি।

সেকালের দেবল থেকে ওয়ানের পথ এবং ওয়ানের প্রাকৃতিক বর্ণনা প্রসঙ্গে এ. এল. মাম্ লিখেছেন, 'The way lay over a depression between Dhunga Bukhtial and Trisul, at the head of river Wan, and two short marches brought us to the upper level of the valley where Wan village lies, within easy distance of the Pass.' মাম্ ওয়ান নদী বলতে লাটুদেবীর ঝরণা বুঝিয়েছেন। কাল রাতে আমরা যে ঝরণা পেরিয়ে ডাকবাংলোয় এসেছি, এখন যে ঝরণায় স্নান করতে চলেছি।

মাম্ গিরিবর্ত্ম বলতে কুকিনা খাল বুঝিয়েছেন। ১০,২১০´ ফুট উঁচু সেই গিরিপথ পেরিয়ে তাঁরা ঋষি উপত্যকা হয়ে ত্রিশুল পর্বতে আরোহণ করেছিলেন।

গাড়োয়ালের রমণীয় হ্রদ গোনাতালে যাবার অন্যতম পথও এই কুকিনা খাল হয়ে। এখান থেকে রামনী হয়ে পৌছনো যায় গোনাতাল—একটি স্বাদু জলের হ্রদ। বিরেহী গঙ্গার উৎস। তারিখটা ২৫শে আগস্ট ১৮৯৪ সাল। সময় রাত্রি সাড়ে এগারোটা। পাহাড়ী নির্ঝরিণী বিরেহী বইছিল পরমানন্দে আপন গতিপথে, বইছিল ১১,১০৯ ফুট উঁচু মৈখানা পর্বতের গা ছুঁয়ে। কি কারণে মৈখানা সেদিন ক্রুদ্ধ হল, আক্রোশে ভেঙ্গে পড়ল। সৃষ্ট হল প্রায়

সোয়া দু'মাইল লম্বা সিকি মাইল চওড়া ও তিনশ ফুট গভীর এই হ্রদ। কিন্তু বিরেহীর গতি স্তব্ধ হল না। প্রকৃতির বাঁধকে ছাপিয়ে সে আজও আপন মনে বয়ে চলেছে—পিপলকোঠির কাছে এসে মিলিত হয়েছে অলকানন্দায়।

সেখান থেকে ১২৪০০ ফুট উঁচু কুয়ারী গিরিবর্ত্ম পেরিয়ে পৌঁছনো যায় তপোবন। সংখ্যাতীত সন্ন্যাসীর তপস্যাধন্য এই তপোবন। রাজা ললিত-সুরের তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে, কাত্যুরী আমলে এখানে ব্রহ্মচারীদের একটি বিরাট আশ্রম ছিল। বিখ্যাত ইংরেজ মিশনারী রেভারেণ্ড ওকলে ৬৫ বছর আগে সেখানে গিয়েছিলেন। তিনি তপস্যারত দু'শ সন্ন্যাসীকে দেখেছিলেন। বহু তীর্থযাত্রীও তখন উপস্থিত ছিলেন। সাধু ও যাত্রীদের বিনামূল্যে আহার্য পরিবেশনের বন্দোবস্ত ছিল।

তপোবনের সে দিন আর নেই। খুবই অল্পসংখ্যক সন্ন্যাসীরই এখন সেখানে সমাগম হয়। বিগ্রহশূন্য তিনটি ছোট মন্দির ও হরগৌরীর বড় মন্দিরটি আজও তপোবনের সেই প্রাচীন ঐতিহ্যের সাক্ষ্য বহন করছে। কিছুদিন হল তপ্ত-কুণ্ডের পাশে একটি নতুন মন্দির স্থাপিত হয়েছে। ভবিষ্যবদ্রী এখান থেকে মোটে তিন মাইল।

ঝরণার তীরে এসে চলা শেষ হল আমাদের। কাছেই ছোট একটি কাঠের কুটির। কুটিরে মানুষ নেই, কিন্তু সে মানুষের স্পর্শবর্জিত নয়। কুটিরে একটি পাথরের প্রদীপ জ্বলছে। কে জ্বালিয়েছে, কেন জ্বালিয়েছে—কিছুই জানি না। কেবল জানি পুণ্যপ্রদীপের পুণ্যরশ্মিতে পুণ্যক্ষেত্র আলোকিত।

বীর বলে—এটি সাধারণ ঝরণা নয়, পুণ্যধারা। নন্দাযাতের সময় নাকি এই জলধারা সাদা হয়ে যায়। স্বর্গ থেকে দুগ্ধধারা মর্ত্যে নেমে আসে। যাত্রীরা সেই স্বর্গধারায় অবগাহন করে পুণ্যার্জন করেন। এখন দুধের নয়, জলের ঝরণা। কিন্তু স্বর্গধারা তো বটেই। স্নান করলে অবশ্যই কিছু পুণ্য অর্জিত হবে। মন তৃপ্ত হবে। কিন্তু ক্ষুদ্র এই জীবনে তো কত পুণ্যক্ষেত্র পরিক্রমা করলাম, কত পুণ্যস্নান করলাম, তবু পুণ্যলোভাতুর মন তো তৃপ্ত হল না। তাই আবার চলেছি রূপকুণ্ডে। এক তীর্থ থেকে আর এক তীর্থে। তীর্থের শেষ নেই।

স্নানশেষে শীতে কাঁপতে কাঁপতে মন্দির-চত্বরে এলাম। একটি প্রাচীন বৃক্ষতলে দুখানি কাঠের ঘর—মন্দির। বড়টি মূলমন্দির। দুটি মন্দিরেরই দরজা বন্ধ। মূল মন্দিরের দরজাটি লোহা ও তামা দিয়ে তৈরি। বীর বলে—সোনাও নাকি মেশানো আছে।

বছরে কেবল একদিন এই মন্দির-দ্বার উন্মুক্ত হয়—বৈশাখী পূর্ণিমার দিনে। বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতেই এখানে লাটুদেবীর প্রধান পূজা হয়। তখন এখানে মেলা বসে। দূর গাঁয়ের পুণ্যার্থী মানুষ দল বেঁধে মেলায় আসে। তারা কেনা-বেচা করে, নাচ-গান করে। কেবল পুরুষরাই নাচ-গানে অংশ নেয়। মেয়েরা চারপাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নাচ দেখে আর গান শোনে।

মন্দিরের বাইরে বিরাট একটা উনোন রয়েছে। উৎসবের সময় এই উনোনে রান্না হয়। একখানি প্রকাণ্ড পরাতে আটা মাখা হয়। যে ঠিকাদার ডাকবাংলোটি নির্মাণ করেছেন, তিনি ঐ পরাতখানি ওয়ানবাসীদের উপহার দিয়েছেন। বৈশাখী পূর্ণিমার উৎসবে আড়াই সের আটা ও এক সের ঘি-এর ভোগ পান লাটুদেবী। তখন ষোলটি পাঁঠা ও ভেড়া বলিদান করা হয়।

ভাদ্র মাসে, এখানে আর একটি উৎসব হয়। এই উৎসবকে বলে আঁঠো পরব। তখন মন্দিরের দরজা খোলা হয় না। কিন্তু উৎসব হিসেবে আঁঠো মোটেই খাটো নয়। গাঁয়ের মেয়েরা তখন নন্দাদেবীর মূর্তি বানিয়ে পুজো করে। তখনও মেলা বসে। ছেলেরা নাচ-গান করে, মেয়েরা দেখে আর শোনে। তবে তখন রাতেও নাচ-গান হয়।

এই সময় পরদেশীদের দেবস্থানে সেবা করা হয়। তখন তাদের উনোন ধরানো মানা। তাঁরা বাড়ি-বাড়ি নেমন্তন্ন খেয়ে বেড়ান।

আট দিন আট রাত ধরে উৎসব চলে। ষোল সের আটা আর দু সের ঘি-এর ভোগ দেওয়া হয় লাটুদেবীকে। আট দিনে নব্বইটি পাঁঠা ও ভেড়া বলিদান করা হয়। প্রায় হাজার দশেক লোক প্রসাদ পায়। দূর-দূরান্ত থেকে পাহাড়ী মানুষরা এখানে আসে। ওয়ানবাসীদের সঙ্গে তারাও ঐ দিন কটিকে হাসি আর গানে ভরে তোলে।

নন্দাযাতের শোভাযাত্রা যখন ওয়ানে পৌঁছয়, তখনও মেলা বসে এই মন্দির-চত্বরে। সে দিনটিও ওয়ানবাসীদের বড়ই আনন্দের দিন। তবে দিনটি আসে বারো বছর বাদে।

মন্দিরপ্রাঙ্গণটি প্রশস্ত। প্রাচীন বৃক্ষটির পাদদেশে পূজারী পুজোয় বসেছেন। বৃক্ষশাখায় সারি সারি ছোট-বড় ঘণ্টা ঝুলছে। প্রথম সারিতে পাঁচটি, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সারিতে চারটি ও চতুর্থ সারিতে তিনটি ঘণ্টা। কোনটি পেতলের কোনটি কাঁসার কোনটি বা লোহার।

পুজো শেষে পূজারী দরজার নিচ দিয়ে মন্দিরে ভোগ রেখে দিলেন।

বৈশাখী পূর্ণিমা ছাড়া অন্য কোনদিন কেউ যদি মন্দিরের দরজা খোলে, তাহলে তার নাকি সর্পাঘাতে মৃত্যু অবধারিত। লাটুদেবীর সর্পটি নাকি পাইন গাছের গুঁড়ির মত মোটা। সে কিন্তু বৈশাখী পূর্ণিমার দিনে অদৃশ্য হয়ে থাকে। কারণ সেদিন মন্দির মানুষের জন্য উন্মুক্ত।

পূজোর পরে প্রসাদ নিয়ে আমরা ফিরে এলাম ডাকবাংলোয়। ভিজে জামাকাপড শুকোতে দিলাম সামনের লনে।

চৌকিদার এসে সেলাম করে। বলে, "রান্না হয়ে গেছে।"

অসিতবাবু জিজ্ঞেস করেন, "রামচাঁদ এসেছে ?"

"না।"

"সেকি! একটা বাজে এখনও আসে নি! অথচ যাবার সময় বলে গেল এগারোটার সময় আসবে।" অসিতবাবু চিন্তিত।

দেবকীদা বলেন, "শ্রীরামচন্দ্রের ধ্যান না করে, খেয়ে নিয়ে মালপত্র বেঁধে ফেল। যারা নিজের বাড়িতে বা অন্যের বাড়িতে লম্বা লিপি লিখতে চাও, তারা কাগজ কলম নিয়ে বস। এর পরে আর রাণার পাবে না। অবশ্য মেঘদূত পেতে পারো।"

সবশেষে শুরু হয় মাল বাঁধা। স্প্রিং ব্যালেন্স দিয়ে তিরিশ সের করে মাল বইবে কুলিরা। স্প্রিং-এর ওজনযন্ত্র দিয়ে তিরিশ করে মাল ভাগ করে দেন অসিতবাবু। আমরা সেগুলি এক-একটা কিট্‌ব্যাগে পুরে মুখ বেঁধে দিই। ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে মাল বাঁধা হয়ে যায়।

পাঁচটার পরে রামচাঁদ দর্শন দেয়। অসিতবাবু বলেন, "ধন্য হলাম। কিন্তু এত দেরি কেন করলেন প্রভু ?"

"কি করব, কুলি না নিয়ে এসে লাভ কি ?"

"এনেছো ?

"হ্যাঁ।"

"কোথায় ?"

"বাইরে।"

আমরা দরজা ঠেলে বারান্দায় আসি। কোথায় কুলি ? কয়েকটি কিশোর বালক বসে আছে বারান্দায়। সকলেরই বয়স ষোলোর মধ্যে। এরাই কি রামচাঁদের কুলি ? রামচাঁদের দিকে তাকাই।

"কি করব, চার টাকায় বড়রা রাজী নয়, তাই এদের নিয়ে এসেছি।"

"কিন্তু এরা কতটা করে মাল বইবে?" মোহিত বলে।

"তা ধরুন গিয়ে সের দশেক।"

"তার মানে তিরিশ সের মালের জন্য আমাদের বারো টাকা লাগবে।" দাশু বলে।

"এরা তিন টাকায় যেতে রাজী হয়েছে।"

"তাতেই বা আমাদের লাভ কি?" অমিতাভ প্রশ্ন করে। রামচাঁদ কোন কথা বলে না।

অসিতবাবু বলেন, "বড় কুলিরা কত করে চাইছে?"

"সাড়ে চার টাকা।"

"তুমি তাদেরই নিয়ে এসো। দুর্গম পথ, এরা অনভিজ্ঞ শিশু। এদের নিয়ে যেতে চাই না।"

রামচাঁদ তার কিশোরবাহিনী নিয়ে মিলিয়ে যায়।

সুজল বলে, "কায়দা করে রেটটা বাড়িয়ে নিলে। শুধু দেখাবার জন্যই ছোঁড়াগুলোকে নিয়ে এসেছিল।"

হয়তো তাই। তবু কোন মন্তব্য করি না। বিরক্তিতে ভরে গেছে মন। কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। একে তো আকাশের অবস্থা ভাল নয়। দুপুরে কিছুক্ষণের জন্য সূর্যের মুখ দেখতে পেয়েছিলাম। তারপর থেকেই আকাশটা সেই যে মেঘে ছেয়ে আছে, এখন পর্যন্ত তার রূপ পালটাবার কোন লক্ষণ নেই। কয়েক পশলা জলও হয়ে গেছে। ভাল আবহাওয়ার জন্য আমরা লাটুদেবীর পূজো দিয়ে এসেছি। কিন্তু এখনও লাটুদেবী আমাদের প্রার্থনা পূরণ করেন নি। কবে করবেন জানি না। এদিকে উপেনবাবুও এসে পৌছচ্ছেন না। তিনি না এলে কাল রওনা দেওয়া যাবে না। এত বাধা অতিক্রম করে আমরা রূপকুণ্ড যেতে পারব কি? গেলেও কি তার সেই অনন্ত রহস্যময় রূপ দর্শন করতে পারব? শেষ পর্যন্ত কি হবে, কিছুই বুঝতে পারছি না।

কিন্তু এই অজ্ঞতা, এই অনিশ্চয়তাই যে হিমালয়ের বৈশিষ্ট্য। এরাই তো হিমালয় পথের নিত্যসঙ্গী। নির্দিষ্ট সময়ে নিরাপদে নির্দিষ্ট স্থানে পৌছে যাবার মধ্যে সুখ ও শান্তি থাকতে পারে, কিন্তু কোন বৈচিত্র্য নেই। বৈচিত্র্যের আকর্ষণেই তো বিচিত্র হিমালয়ে আসা। দুর্গম গিরি-কান্তারে যাত্রা যত বিঘ্নিত হবে, যাত্রী তত অভিজ্ঞ ও আনন্দময় হয়ে উঠবে।

রামচাঁদ কিন্তু আধ ঘণ্টার মধ্যে ফিরে এল জনা বিশেক লোক নিয়ে। এত

লোক দিয়ে কি হবে ?

রামচাঁদ বলে, "এরা দৈনিক সাড়ে চার টাকা মজুরিতেই রাজী হয়েছে তবে বিশ সেরের বেশি মাল বইতে রাজী নয়।"

"তোমরা কি আরম্ভ করলে রামচাঁদ, এই বলে গেলে তিরিশ সের, এখন বলছ বিশ—তার মানে তো আমাদের দেড়গুণ কুলি লাগবে।"

রামচাঁদের সেই এক কথা, "কি করব বলুন।"

"কিন্তু এ তো জুলুম হচ্ছে।" অসিতবাবু ক্ষেপে যান।

"আমি কি করতে পারি, ওরা রাজী না হলে। আপনি একবার বলে দেখুন।"

"না। আমি কিছু বলব না। তুমিই ওদের বলে দাও, তিরিশ সের করে মাল না বইলে, আমাদের দরকার নেই কুলির।"

রামচাঁদকে কিছুই বলতে হয় না। অসিতবাবুর হিন্দী বুঝতে পারে আগন্তুকরা। তারা নিজেদের ভাষায় রামচাঁদকে কি একটা বলে নেমে যায় ডাকবাংলো থেকে। আমরা চেয়ে চেয়ে তাদের দেখি আর ভাবি—তবে কি রূপকুণ্ড দর্শন হবে না আমাদের !

সবাই চুপ করে আছি। কিন্তু সুজল পারে না নীরব থাকতে। সে বাংলায় অসিতবাবুকে বলে, "তুমি তো পাহাড়ে নতুন আস নি অসিতদা, এরা যে সুযোগ বুঝে এমন জুলুম করে, তা তো তোমার অজানা নয়।"

"তুই থাম দেখি, তোকে আর জ্ঞান দিতে হবে না।"

অসিতবাবুর শান্ত হতে সময় লাগবে। বৃষ্টি বন্ধ হয়েছে। একটু মিঠে রোদের পরশ লেগেছে চারিদিকে। কাল আকাশ কি রকম থাকবে কে জানে। এই সুযোগে কয়েকটা ছবি নেওয়া যাক। প্রস্তাবটা পছন্দ হয় অমিতাভর। ক্যামেরা কাঁধে নিয়ে আমরা দুজনে বেরিয়ে আসি বাইরে। পায়েচলা পথটি ধরে ঝোপঝাড়ের পাশ দিয়ে হেঁটে চলি।

হঠাৎ অমিতাভ বলে ওঠে, "ওখানে কি আগুন লেগেছে নাকি ? একটু আগেও যে বৃষ্টি হয়ে গেল।" সে ইশারায় একটা ঝোপ দেখিয়ে দেয়।

ঝোপের ভেতর থেকে ধোঁয়া উঠছে। তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাই।

না, আগুন তো দেখা যাচ্ছে না। তাহলে ধোঁয়া উঠছে কেমন করে ? নিশ্চয়ই আগুন আছে। আমরা আরও এগিয়ে চলি।

না, আগুন নয় মানুষ। দুজন মানুষ চুপচাপ বসে আছে ঝোপের ভেতরে,

মহানন্দে হুঁকো টানছে। বনের আগুন নয়, তামাকের আগুন। এ আগুন নিজেই জ্বলে, কাউকে জ্বালায় না।

কিন্তু হুঁকো টানা তো ফৌজদারী দণ্ডবিধির এলাকায় পড়ে না। এত জায়গা থাকতে ওরা এমন গোপনীয় স্থান নির্বাচন করেছে কেন? লোক দুটিকে যেন কোথায় দেখেছি বলে মনে হচ্ছে। কোথায়…? ঐ রকম সবুজ পায়জামা আর নীল সোয়েটার পরা। কোথায় দেখেছি…? মনে করার চেষ্টা করি।

হ্যাঁ, তাই তো। এরা যে রামচাঁদের লোক। একটু আগেই তার সঙ্গে এসেছিল ডাকবাংলোয়। তিরিশ সের মাল বইতে হবে বলে বীরদর্পে চলে এসেছে। ও হরি, এই তাদের বীরত্ব। ডাকবাংলো থেকে বেরিয়ে এসে এখানে লুকিয়ে আছে। রামচাঁদের সিগন্যালের অপেক্ষায় রয়েছে।

কিন্তু বাকি ধর্মঘটীরা কোথায় গেল? সব আছে। ঐ তো ওখানে কয়েক-জন ঘাপটি মেরে বসে। লাটুদেবীর মন্দিরের পেছনেও কারা যেন লুকিয়ে। না, রামচাঁদ তো শুধু গাইড নয়, সে গ্রেট ডিরেকটর। যেমন সাইট সিলেক-শান, তেমনি এ্যাক্ট। আর কি নিখুঁত প্ল্যানিং। রামচাঁদের জয় হক। আর আমাদের? আমরা যে পরাজিত হব, তাতে আর সন্দেহ কি?

ছবি তোলার উৎসাহ উবে যায়। আমরা ফিরে আসি ডাকবাংলোয়। ইশারা করে অসিতবাবুকে বাইরে ডেকে এনে কথাটা বলি। কিছুক্ষণ ধরে আমাদের আলোচনা চলে। তারপরে ঘরে আসি। অসিতবাবু রামচাঁদকে বলেন, "তুমি তো জান ভাই, বহু ঘুরে আমরা এখানে এসেছি। আমাদের টাকাপয়সার একটু টান আছে। তাই বেশি কুলি নেবার সামর্থ্য নেই আমাদের। অথচ কুলিরা সাড়ে চার টাকায় বিশ সেরের বেশি মাল বইতে রাজী হচ্ছে না।"

"জী, সাব।"

"কিন্তু রূপকুণ্ডে তো যেতেই হবে।"

"জী, জরুর।"

"তাই ভাবছি বিশ সের করে পনেরো জনে যতটা মাল বইতে পারবে বইবে, বাকি মালটা আমরা ভরে নেব রুকস্যাকে।"

সুজল কি যেন বলতে চাইছিল, আমি ইশারায় তাকে চুপ করে থাকতে বললাম।

১০

দরদী স্বরে রামচাঁদ বলে, "পারবেন কি আপনারা, বড্ড চড়াই পথ।"

"পারতে হবে ভাই। তুমি বরং ওদের ডেকে আনো, নইলে অযথা দেরি হয়ে যাবে।"

"না না, দেরি হবে কেন? এই এখনই ডেকে আনছি।" বেরিয়ে যায় রামচাঁদ।

আমি ও অমিতাভ ছাড়া আর সবাই অসিতবাবুর আকস্মিক পরিবর্তনে বিস্মিত। দেবকীদা জিজ্ঞেস করেন, "ব্যাপারটা কি?"

"গ্র্যাণ্ড রিডাকৃশান।"

"মানে?" দাশু বলে।

"গ্র্যাণ্ড রিডাকৃশান সেলের মত।"

"বুঝতে পারছি না, খুলে বল।" সুজল বলে।

অসিতবাবু ক্ষেপে যান, "তোর মাথায় কি?"

"গোবর।"

আমাদের সঙ্গে অসিতবাবুও হেসে ওঠেন। হাসি থামলে বলেন, "জিনিসের দাম বাড়িয়ে তারপরে যেমন গ্রাণ্ড রিডাকৃশান সেল করা হয়, আমরাও তেমনি করব। অর্থাৎ প্রতি কিটের মধ্যে আরও মাল ভরে রেখে, সেই বাড়তি মালটুকু বের করে দেখিয়ে দিতে হবে ঠিক বিশ সের মাল আছে।"

"দি আইডিয়া অসিতদা। তাই করতে হবে।" সুজল লাফিয়ে ওঠে।

"করবে কেমন করে? ওরা তো ওজন করে নেবে।" মোহিত বলে।

"নেবে কেন, আমরা ওজন করে দেব।" অসিতবাবু বলেন।

"কিন্তু সামনে ওজন করে দিতে হবে তো?" দাশু বলে।

"এটুকু না পারলে, অত কষ্ট করে ম্যাজিক শিখেছিলি কেন? এটুকু হাত-সাফাই করতে পারবি না? তা ছাড়া রামচাঁদ ভিন্ন আর কেউ ইংরেজী পড়তে পারে না।"

"তা হলে সে সময় রামচাঁদকে সরিয়ে নিয়ে যাবেন। আর এখন মাল ওজন হবে না, কিট্গুলোতে বাড়তি মাল ভরে রাখতে হবে।" দাশু সম্মত হয়।

অসিতবাবু বলেন, "হ্যাঁ তাই হবে। আজ একটা ছুতো করে ওদের ফিরিয়ে দিচ্ছি। বলছি কাল রওনা হবার আগে মাল ওজন হবে।"

সদলবলে রামচাঁদ ফিরে আসে। আমরা আলোচনা বন্ধ করি। কথাবার্তা

পাকা হয়। ওরা অগ্রিম নিয়ে বেরিয়ে যায়। রামচাঁদ বলে, "কাল সকাল সাতটায় আসছি। আপনারা তৈরি থাকবেন।"

আমরা আপত্তি করি না। ওদের এখন বিদেয় হওয়া দরকার। ওরা চলে গেলে দাশু স্প্রিং-এর ওজনযন্ত্রটা হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ ধরে কি যেন করে। তারপরে মোহিত ও অসিতবাবুর সঙ্গে তার কাজে লেগে যায়। বীর-সিং চায়ের জল চড়ায়।

দেবকীদা অমিতাভ ও স্বজলের সঙ্গে আমি গ্রাম পরিক্রমায় বেরিয়ে পড়ি। পথে গাঁয়ের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে দেখা হয়। তারা সেলাম করে। কোথা থেকে এসেছি আর কোথায় যাচ্ছি—জিজ্ঞেস করে। প্রায় প্রত্যেকের হাতে উল তৈরির মাকু কিংবা উল বোনার কাঁটা। সবাই হয় পশম থেকে উল কাটছে, না হয় উল বুনছে। ব্যবসার জন্য নয়, জীবনের জন্যই মাকু কিংবা কাঁটা ওদের সর্বক্ষণের সঙ্গী।

ঘুরতে ঘুরতে একটি বেশ বড বাডির সামনে এসে দাঁড়াই। একজন বৃদ্ধ বাড়ির বাইরে বসে হুঁকো টানছিলেন। তিনি আমাদের কাছে ডাকেন। কাছে গেলে হুঁকোটা বাড়িয়ে ধরেন। আমরা সবিনয়ে প্রত্যাক্ষান করি।

বৃদ্ধ কাশতে কাশতে বলেন, তাঁর বয়স উনআশি বছর। এই বাড়িখানি তাঁর। কিছু জমি-জমাও আছে। এখন আর নিজে চায করতে পারেন না। তবে দেখা-শোনা করেন।

"বাড়িতে আর কে আছে আপনার?" অমিতাভ জিজ্ঞেস করে।

"কেউ নেই।"

"বিয়ে করেন নি বুঝি?" স্বজল বলে।

আর সঙ্গে সঙ্গে অট্টহাসিতে ফেটে পড়েন বৃদ্ধ। হাসি থামলে বলেন, "বিয়ে করলেই বুঝি বাড়ি বোঝাই হয়ে থাকে আপনজনে?"

লজ্জা পায় স্বজল। চট করে কোন কথা বলতে পারে না।

দেবকীদা বলেন, "সে কথা বলে নি। আপনি বললেন কিনা, বাড়িতে কেউ নেই। তা তাঁরা বোধ হয় বেড়াতে গেছেন!"

"না, বেড়াতে যাবার জন নেই আমার।" বৃদ্ধের কণ্ঠস্বরটা বড়ই করুণ শোনাচ্ছে। তিনি বলে চলেন, "কেউ নেই। শুধু এ বাড়িতে নয়, জগতের কোথাও কেউ নেই আমার। অথচ একবার নয়, দুবার নয়, পাঁচ-পাঁচবার বিয়ে করেছি আমি।"

ডাকবাংলোয় ফিরে এসে দেখি দুজন সহকারী আর দুঘোড়া মাল নিয়ে উপেনবাবু এসে গেছেন। আমরা ঘরে ঢুকতেই তিনি সহাস্যে বলে ওঠেন, "সব ঠিক আছে তো ?"

এ কথাটা আমাদের নীলগিরি অভিযানের ক্যাম্প-কোড ছিল। অভিযানের নেতা অমূল্য সেন এই অপূর্ব কোডের আবিষ্কর্তা।

হাসতে হাসতে জবাব দিই, "হ্যাঁ, সব ঠিক আছে।"

"থাকলেই ভাল, নইলে আবার গণ্ডগোল।"

সরল হাস্য-পরিহাসে পরিপূর্ণ হয়ে উঠি আমরা। কুলি নিয়ে বিকেলে যে গুমোট আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছিল, উপেনবাবুর আগমনে সেটি কেটে গেছে। হাসি আর গল্পে মুখরিত হয়ে ওঠে ডাকবাংলো। আর এমনি সময় গরম কফির কেটলি নিয়ে ঘরে ঢোকে বীর। আমরা তাকে স্বাগত জানাই। বীর মৃদু হেসে কফি পরিবেশন করে। আমাদের গল্প চলতে থাকে।

একটু বাদে চৌকিদার ঘরে আসে। আমরা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাই। সে বলে, "গাঁয়ের মানুষরা দাওয়াই নিতে এসেছে ডগ্‌দর সাবের কাছে।"

আমরা কিছু বলতে পারার আগেই কয়েকজন মেয়েপুরুষ তাদের সন্তান-সন্ততিদের নিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ে। একজন মহিলা তার ছেলেমেয়ের হাত ধরে এগিয়ে আসে উপেনবাবুর কাছে। বিনীত কণ্ঠে তাঁকে বলে, "সাব এই ছেলেটা কেবল বোখারে ভোগে, গায়ে হাত দিয়ে দেখুন—এখনও বোখার আছে। মেহেরবানি করে একটা আচ্ছা দাওয়াই দিন।"

"দাওয়াই ·····"

উপেনবাবু শেষ করতে পারেন না। মহিলা তার মেয়েটিকে দেখিয়ে বলতে থাকে, "আর আমার এই মেয়েটা, এর কি হয়েছে লাটুদেবী জানেন।" একবার থামে সে। ওপরদিকে মুখ করে চোখ বুজে বোধ করি লাটুদেবীকে স্মরণ করে। তারপরে আবার বলতে থাকে, "মেয়েটার পেটে কিছুই থাকে না, জন্মের পর থেকেই এটা পেটের অসুখে ভুগছে ডগ্‌দর সাব।"

"বিব্রত উপেনবাবু কোনমতে বলে ওঠেন, "আমি দাওয়াই দেব কি ?"

ইতিমধ্যে ওরা সবাই তাঁকে ঘেরাও করে ফেলেছে। তাদেরই একজন বলে, "আপনি না দিলে কে দেবে সাব। আপনার ঘোড়াওয়ালা বলল, আপনি ডগ্‌দর আছেন, আপনার কাছে বহুত দাওয়াই আছে।"

এইবারে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয় আমাদের কাছে। আমরা সবাই প্রায় একসঙ্গে হেসে উঠি। রোগী ও তাদের অভিভাবকরা ঘাবড়ে যায়।

আমাদের হাসি থামলে উপেনবাবু বলেন, "ঘোড়াওয়ালা ভুল বলে নি, আমি ডাক্তার, আমার সঙ্গে ওষুধপত্রও আছে। কিন্তু মানুষের নয়, আমি গাছ-পালার ডাক্তার, সেসব ওষুধও গাছপালার।"

"ও, আপনি হাকিম আছেন!" একজনে গম্ভীর স্বরে মন্তব্য করে।

বাকি সবাই উপেনবাবুকে ভাল করে দেখে নেয়। বোধ করি তাদের জানা হাকিমদের সঙ্গে, তাঁর আকৃতিগত সাদৃশ্যটা মেলাবার চেষ্টা করে।

মিল না পেয়ে একজনে হতাশস্বরে বলে, "গাছপালার দাওয়াই আছে, তাই দিন।"

না, উপেনবাবুর মুক্তি পেতে মুশকিল আছে আজ।

শেষ পর্যন্ত অমিতাভ মুশকিল আসানের ভূমিকা নেয়। সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলে ওদের। তারপরে নিজের হোমিওপ্যাথি বাক্স খুলে ভেবে-চিন্তে ওষুধ দেয়। ওরা খুশিমনে ঘরে ফেরে।

॥ পনেরো ॥

পদযাত্রার দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হবে আজ। আমরা তাই শেষরাতে শয্যাত্যাগ করেছি। দেবকীদা উঠেছেন সবার আগে। কফি করে আমাদের ডেকে তুলেছেন। আমরা কফি খেয়ে বিছানা ও অন্যান্য জিনিস বেঁধে ফেলি। দাশু আর মোহিতকে নিয়ে বীর রান্নাঘরে চলে যায়। সকালের জলখাবার ও দুপুরের খাবার তৈরি হবে। আমরা জলখাবার খেয়ে, দুপুরের খাবার সঙ্গে নিয়ে রওনা হব।

আটটার মধ্যে প্রস্তুত হয়ে গেলাম। কিন্তু আমাদের প্রস্তুতিতে কি এসে যায়। যারা না এলে আমরা অচল, তারা আসে নি এখনও। আসে নি কুলিরা, আসে নি রামচাঁদ। আমরা তাদেরই পথ চেয়ে বসে আছি। জানি না কখন এ প্রতীক্ষার অবসান হবে।

রামচাঁদ এলো বেলা নটার সময়। সে একা আসে নি, কুলিদের সঙ্গে নিয়েই এসেছে। কিন্তু তারা ঘরে ঢুকল না, চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল ডাকবাংলোর

বারান্দায়। রামচাঁদ একা ঘরে ঢুকল।

"কি ব্যপার? এত দেরি হল তোমাদের?"

"আর বলেন কেন।" রামচাঁদ একবার থামে। তারপরে ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলে, "বেটারা সব শয়তান, বেইমান, নমক-হারাম।"

"কেন কি হল?" আমরা বিস্মিত।

"সুযোগ বুঝে ব্যাটারা আবার বেঁকে বসেছে।"

"কে বাঁকালো, কাল বিকেলেও তো সোজা ছিল।" সুজল মাঝখান থেকে বলে ওঠে।

"নিজেরাই বেঁকেছে।" রামচাঁদ বলে, "কাল আপনাদের বলে গেল দৈনিক জনপ্রতি সাড়ে চার টাকা। আজ সকালে বলছে পাঁচ টাকার কমে যাবে না।"

"কতটা মাল বইবে?" অসিতবাবু জিজ্ঞেস করেন।

"না, সেদিক থেকে আর কোন গোলমাল করে নি। মাল বিশ সেরই বইবে।"

আমরা আঁতকে উঠি। কিন্তু আশ্চর্য, শান্তস্বরে অসিতবাবু বলেন, "তাই দেব। তবে মাল নামাবার আগে ওদের একবার ডাকো।"

"কেন?" রামচাঁদ বিস্মিত হয়।

"আর যাতে না বাঁকে তার একটা ব্যবস্থা করে নিতে চাই।" অসিতবাবু শান্তস্বরে জবাব দেন।

"না না, আর বাঁকবে কেন?" রামচাঁদ বলে, "মরদ্‌কা বাত, হাতীকা দাঁত।"

ওর কথা ও ভঙ্গিতে হাসি পায় আমাদের। তবু চুপ করে থাকি।

অসিতবাবু বলেন, "সেই কথাটাই ওদের সবাইকে লিখে দিতে হবে।"

"লিখে দিতে হবে? ওরা কি লেখাপড়ার মধ্যে যাবে!"

"না গেলে, আমরা ওদের নেব না।"

"না নিলে, আপনারা রূপকুণ্ড যাবেন কেমন করে?"

"যাব না।" অসিতবাবু নির্বিকার।

অগত্যা রামচাঁদ বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। যায় তার অনুচরদের কাছে। অসিতবাবু রুকস্যাক থেকে কাগজ-কলম বের করে সুজলকে বলে, "দাশুর সঙ্গে পরামর্শ করে হিন্দীতে একটা চুক্তিপত্র লিখে ফেল।"

একটু বাদে অনুচরদের নিয়ে রামচাঁদ ঘরে ঢোকে।

অসিতবাবু চুক্তিপত্রটি তার হাতে দেন। রামচাঁদ সেটি পড়ে কুলিদের বুঝিয়ে দেয়। আর তা শুনে ওরা সবাই একসঙ্গে বলে ওঠে, "ও সব লেখাপড়ার মধ্যে আমরা নেই।"

"তার মানে তোমরা এটা সই করবে না?" অসিতবাবু ধীরস্বরে বলেন।

ওরা উত্তর দেয়, "নহী।"

"বেশ।" একবার থামেন অসিতবাবু। তারপরে বলেন, "তোমরা তাহলে আসতে পারো।"

"মানে?" রামচাঁদ বলে ওঠে।

"আমাদের কোন দরকার নেই লোকের। আমরা ফিরে যাব গোয়ালদাম। তুমি ঘোড়ার ব্যবস্থা কর।"

রামচাঁদ ও কুলিদের সঙ্গে আমরাও আঁতকে উঠি। তাহলে কি রূপকুণ্ড যাওয়া হবে না? কি বলছেন অসিতবাবু? কিন্তু এখন চুপ করে থাকতে হবে। আমরা চুপ করে থাকি।

একটু বাদে রামচাঁদ জিজ্ঞেস করে অসিতবাবুকে, "আপনারা কি রূপকুণ্ড যেতে চান না?"

"নিশ্চয়ই চাই। না চাইলে এতদূর এসেছি কেন? কিন্তু তাই বলে এদের আর জুলুম সহ্য করতে রাজী নই। স্বামীজী বলে দিয়েছেন চার টাকায় তিরিশ সের মাল বইবে। কাল ঠিক হল সাড়ে চার টাকায় বিশ সের মাল নেবে। আজ বলছে সাড়ে চার নয়, পাঁচ। কাল যে ছ টাকা বলবে না, তারই বা কি স্থিরতা আছে। তাই একটা চুক্তিপত্র লিখে নিতে চাই। লেখাপড়া না করে আমরা কোন কুলি নেব না।"

কি একটু ভাবে রামচাঁদ। তারপরে হেসে বলে, "একবার পাকা কথা দিলে এরা আর নড়চড় করে না।"

"সেই পাকা কথাটাই পাকা করতে চাই।"

রামচাঁদ চট করে কোন জবাব দেয় না। একবার তার অনুচরবর্গের দিকে তাকায়। তারপরে বলে, "তোরা যদি লিখে না দিস, তাহলে সাবরা তোদের নেবেন না।"

ওরা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। তারপরে একজন প্রবীণ ব্যক্তি বলে, "আমরা যখন রাজী হয়েছি, তখন লিখে দিতে আপত্তি কি। কিন্তু

আমরা যে সই করতে পারি না।"

"টিপসই করে দাও।" সুজল কাগজখানি তার হাতে দেয়।

সবার স্বাক্ষর করা হলে ওরা মালপত্রের কাছে এগিয়ে যায়। আর তখুনি পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী উপেনবাবু বলে ওঠেন, "আমি তাহলে রামচাঁদের সঙ্গে একবার লাটুদেবীকে দর্শন করে আসি। চল রামচাঁদ, আমরা ঘুরে আসি।"

"আমাকে যেতে হবে?" রামচাঁদ বিস্মিত।

একটু পুজো দেব কিনা, তুমি সঙ্গে না থাকলে···তা ছাড়া তুমি আমাদের নিয়ে যাচ্ছ দুর্গম পথে, তোমারও তো একবার লাটুদেবীকে প্রণাম করে আসা উচিত।" উপেনবাবু বলেন।

"বেশ চলুন। কিন্তু এদিকে সাবরা কি মালপত্র ওজন করে দিতে পারবেন?"

"খুব পারব। তুমি নিশ্চিন্তে লাটুদেবীকে প্রণাম করে এসো। এদিককার সব ব্যবস্থা আমরা করে ফেলছি।" দাশু রামচাঁদকে ভরসা দেয়।

"বেশ চলুন।" রামচাঁদের স্বর শুনে বেশ বোঝা যাচ্ছে, সে অসন্তুষ্ট। নেহাৎ লাটুদেবীর মন্দিরে যাবার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা অসম্ভব বলেই সে উপেনবাবুর সঙ্গে যাচ্ছে।

উপেনবাবু মোহিতকে বলেন, "দেখো ভাই, আমার ব্লটিং পেপারটা জন দুয়েক জোয়ান লোককে দিও।"

মোহিত সহাস্যে সম্মতি জানায়। উপেনবাবু রামচাঁদকে নিয়ে বেরিয়ে যান।

উদ্ভিদ সমীক্ষায় ব্লটিং পেপার একটি মূল্যবান সামগ্রী। সমীক্ষার সময় যে সব পাতা কিংবা ফুলের নমুনা সংগ্রহ করা হয়, তা যাতে পচে না যায়, তাই এই ব্লটিং পেপার। দুখানি ব্লটিং পেপারের মধ্যে পাতা কিংবা ফুলটি সাজিয়ে নিয়ে, দুদিক থেকে চেপে চেপে তার রসটা শুকিয়ে ফেলতে হয়।

নীলগিরি অভিযানের সময় পিপলকোঠি থেকে জোশীমঠের পথে ধস পেরোবার সময় উপেনবাবুর ব্লটিং পেপার নিয়ে একটা ঘোড়া নিচে পড়ে গিয়েছিল। ঘোড়াটিকে বাঁচানো যায় নি, কিন্তু ব্লটিং পেপার উদ্ধার করা গিয়েছিল। উপেনবাবু বোধ করি সেই স্মৃতি স্মরণ করেই মোহিতকে সাবধান করে গেলেন।

সুজল ও মোহিতকে সহকারী করে দাশু কুলিদের ম্যাজিক দেখাতে থাকে —ওজনযন্ত্রের ম্যাজিক। কাল রাতে বাড়িয়ে রাখা মালটুকু কিট থেকে বের

করে নিয়ে প্রত্যেক কুলিকে দেখিয়ে দেয় সে মাত্র বিশ সের মাল বইছে।

কিছুক্ষণ বাদে রামচাঁদ ফিরে এল। ম্যাজিক শেষ হয়ে গেছে। তবে মাল ভাগ করে দেবার পরে দেখা গেল, আরও জনতিনেক মালবাহক দরকার।

আলোচনার শেষে রামচাঁদ চলে গেল তিনজন লোক আনতে। কুলিরা মাল নিয়ে রওনা হল। সুজল ও অমিতাভ এখানে অপেক্ষা করবে। তারা রামচাঁদের সঙ্গে পরে আসবে। আমরা আজ বৈদিনীতে তাঁবু ফেলব। চৌকিদার আমাদের দুপুরের খাবার তৈরি করছে। তৈরি হলে খাবার নিয়ে অসিতবাবু রওনা হবেন। ক্ষিদে পেলেই আমরা পথে বসে পড়ব।

ওয়ান ডাকবাংলো থেকে বিদায় নিলাম। বিদায় নিলাম সুজল আর অমিতাভর কাছ থেকে, বিদায় নিলাম আমাদের নেতার কাছ থেকে, বিদায় নিলাম অতিথিবৎসল চৌকিদার পার সিংয়ের কাছ থেকে। সুজল অমিতাভ ও অসিতবাবুর সঙ্গে দেখা হবে কিছুক্ষণ পরে। কিন্তু পার সিং?

ফেরার পথে, আমরা আর আসব না ওয়ান। পাথরনাচুনি থেকে বড়া দেওলডুঙ্গা (১১৫০০´) ভূণা ও কুকিনা খাল হয়ে তিনতাল দর্শন করে চলে যাব নন্দকিশোরী। পৌঁছব। কিন্তু সে কথা বলতে পারি না পার সিংকে। কোনমতে তাকে বলি, "ফির মিলেঙ্গে।"

সেও আবেগ জড়িত স্বরে আবৃত্তি করে, "ফির মিলেঙ্গে।" তারপরে আমার হাত ছেড়ে দেয়। আমরা এগিয়ে চলি। ওরা হাত নাড়ে।

সকাল থেকে মিঠে রোদ উঠেছে আজ। তা হলে কি লাটুদেবী সুপ্রসন্না হলেন? নীলগিরি অভিযানের সময়ও লাটুদেবীর পুজো দিয়ে আশাতীত ফল লাভ করেছিলাম আমরা। লাটুদেবী গাড়োয়াল ও কুমায়ুনের পরমারাধ্যা নন্দাদেবীর সেবিকা—প্রকৃতির নিয়ন্ত্রা। প্রকৃতির করুণা ছাড়া কোন হিমালয় যাত্রা সফল হতে পারে না।

সূর্য এখন মাথার ওপরে। চকচকে রোদে ভরে গেছে চারিদিক। রোদে উত্তাপ আছে। তবু পথ চলতে ভাল লাগছে।

পথ সামান্য চড়াই। পাহাড়ী গাঁয়ের পথ। পথের পাশে ক্ষেত-খামার। ধাপে ধাপে রামদানার ক্ষেত। লাল আর হলুদের মেলা মিলেছে। আমাদের কলহাস্য শুনে আশেপাশের ক্ষেত থেকে ছেলেমেয়েরা আসে পথের ধারে—আমাদের সেলাম করে। আমরা তাদের আনন্দ অভিবাদন গ্রহণ করি। ওয়ান ছাড়িয়ে এগিয়ে চলি।

ডাকবাংলো থেকে দেড় মাইল এসে রণকধার। ধার মানে পর্বতশ্রেণী আর রণক মানে জমজমাট। মানুষে নয়, প্রাকৃতিক সম্পদে জমজমাট যে পর্বতশ্রেণী তার নাম রণকধার। পর্বতশ্রেণীর প্রাকৃতিক প্রাচুর্যের কথা বলতে পারি না, তবে এ জায়গাটি সত্যই বড সুন্দর। পাহাড়ের গায়ে নানা রকমের ফার্ণ আর ফুল। তারই মাঝে ছোট ছোট গাছে ছাওয়া সবুজ একফালি প্রান্তর। প্রান্তরের প্রায় কেন্দ্রস্থলে ছোট একটি জলাশয়। চড়ুইভাতির আদর্শ স্থান এই রণকধার।

রণকধার ওয়ান উপত্যকার প্রান্তসীমা। এখান থেকে প্রদীপাকৃতি উপত্যকাটি ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে ওয়ান ডাকবাংলোর সামনে দাঁড়িয়ে। তিনদিকে যে পর্বতশ্রেণী দেখতে পেয়েছি তারই একটি পাহাড়ের উপর উঠে এসেছি আমরা। এখানে চড়াই পথ শেষ হয়ে গেল। শুরু হল উৎরাই।

পথ বলতে একটি পায়েচলা পথ-রেখা। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে পথ। ঘন জঙ্গল। এত ঘন যে সামনে বা পেছনের সহযাত্রীকে পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না মাঝে মাঝে। হাঁকডাক করে আমরা একে অন্যের অস্তিত্ব সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হচ্ছি। গাছপালা সরিয়ে পথ চলতে হচ্ছে। ডালপালার ঘষায় গা-হাত-পা ছড়ে যাচ্ছে।

উপেনবাবু কিন্তু ভারী খুশি। তিনি মাঝেমাঝেই দাঁড়িয়ে পড়ছেন। পাতা ছিঁড়ছেন, ফুল তুলছেন, আর ডায়েরী খুলে নোট নিচ্ছেন। উপেনবাবু কাজ করছেন, আমরা গল্প করছি। গল্প করতে করতে বনপথ অতিক্রম করছি।

কিছুক্ষণ বাদে উৎরাই শেষ হল। আমরা গাছে ছাওয়া পাহাডটির পাদদেশে পৌছলাম। দুই পাহাড়ের মাঝে বয়ে যাচ্ছে পাহাড়ী নদী—বৈদিনী গঙ্গা। বৈদিনী বুগিয়ালকে বিগলিত করে বয়ে চলেছে নিচে।

একটি কাঠের পুল পেরিয়ে আর একটি পাহাড়ের পাদদেশে এলাম। একই রকমের বনাবৃত পাহাড়। এবারে এটিকে অতিক্রম করতে হবে। এমনি একটির পর একটি পাহাড় পেরিয়েই দুর্গম গিরি-কান্তারের পথ। এই সব ছোট ছোট পাহাড়গুলি বড় বড় পাহাডকে ঘিরে রয়েছে। এরা তাদের রক্ষী। এই সব রক্ষীকে অতিক্রম করতে পারলেই আমরা রূপকুণ্ড তথা ত্রিশুল পর্বতে পৌছতে পারব।

আবার চড়াই ভাঙতে শুরু করেছি। তবে পথের প্রকৃতি অপরিবর্তিত। তেমনি ঘন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে পথ। গাছের শাখা-প্রশাখার চতুর্দিক

আচ্ছাদিত। আন্দাজে পথ চলতে হচ্ছে।

তবু রক্ষে, পথের পাশে খাদ নেই। নেই কারণ পথ বলে কিছু নেই। পাহাড়ের গায়ে ঘন বন। বনের ভেতর দিয়ে ভেড়ার পাল যাতায়াত করায় একটি সরু রেখার সৃষ্টি হয়েছে। সেই পথ-রেখা ধরে পাহাড়ের ওপরে উঠছি আমরা। একে দু হাতে গাছপালা সরিয়ে চলতে হচ্ছে, তার ওপরে চড়াই। দম ফুরিয়ে আসছে, কিন্তু পথ ফুরোচ্ছে না। বিশ্রাম করতেও ভরসা পাচ্ছি না। যে রকম ঘন জঙ্গল, তাতে হিংস্র জন্তুর আবাস হওয়াই স্বাভাবিক। তারা আশেপাশে যে কোন জায়গায় লুকিয়ে থাকতে পারে এবং যে কোন সময় ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়তে পারে।

উপেনবাবু কিন্তু গাছ আর ফুল দেখে ভয়-ডর ভুলে গেছেন। তিনি যখন-তখন যেখানে-সেখানে জঙ্গলের ভেতর ঢুকে যাচ্ছেন। বাধ্য হয়ে তাঁর সহকারীরা তাঁকে অনুসরণ করছেন। একটু বাদে উপেনবাবু কোন দুর্লভ ফুল কিংবা পাতা হাতে নিয়ে হাসতে হাসতে আমাদের কাছে ফিরে আসছেন। এসেই আগের কথায় ফিরে আসেন, "হ্যাঁ, গত মাসেই গিয়েছিলাম নন্দনকানন। চারদিনের ছুটি নিয়ে বসকে কলকাতায় রেখে ফিরে চললাম দেরাদুন।"

"বস ?" বুঝতে পারে না দাশু।

আমি বুঝেও চুপ করে থাকি। উপেনবাবু মুচকি হেসে বলেন, "হ্যাঁ, বস। অফিসের নয় বাড়ির। অর্থাৎ তোমার বৌদি।"

হো হো করে হেসে ওঠে সবাই। হাসি থামলে উপেনবাবু শুরু করেন, "ফেরার পথে রেলে বসে কেবলই মনে হতে লাগল—নীলগিরি অভিযানের সময় আমরা নন্দনকাননে পৌঁচেছিলাম বর্ষার শেষে—২রা অক্টোবর। অনেক ফুল পেয়েছি। তবু শুনেছি নন্দনকাননের প্রকৃত রূপ দেখতে হলে যেতে হয় বর্ষাকালে—জুলাই-অগাস্টে। যেতে কষ্ট হবে, কিন্তু নন্দনকাননের অনিন্দ্যসুন্দর রূপ নাকি সে কষ্ট দেবে ভুলিয়ে। দেরাদুন ফিরে এসেও বার বার সেই একই কথা মনে পড়তে থাকল। কেবল কল্পনা করতে লাগলাম সেই অদেখা নন্দনকাননকে। মনটা বড়ই ব্যাকুল হয়ে উঠল। তাছাড়া বুঝতেই পারছেন বিয়ের পরে প্রথম বিরহ আর বিরহ থেকেই নাকি ক্ল্যাসিক্যাল প্রেমের জন্ম। তাই একুশ দিনের ছুটি নিয়ে একদিন ঋষিকেশের বাসে চেপে বসলাম। প্রকৃতি ও প্রেয়সীর মধ্যে প্রথমাকে বেছে নিয়ে পাড়ি জমালাম নন্দনকাননের পথে।" একবার থামেন উপেনবাবু। একটু হাসেন, আমরাও হাসি। তারপরে অপেক্ষাকৃত গম্ভীর

স্বরে তিনি বলেন, "বড ভাল লেগেছে বর্ষার নন্দনকানন। সেবারের সঙ্গে এবারের কোন তুলনাই চলে না। স্থযোগ পেলে আপনারাও একবার বর্ষাকালে ঘুরে আসবেন নন্দনকানন থেকে।"

উপেনবাবু থামলে দাশু বলে, "উপেনদা, গোয়ালদাম থেকে এ পর্যন্ত আসতে পথের পাশে যেসব গাছপালা দেখলেন, তাদের সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু বলুন না।"

দাশুর প্রস্তাবটা পছন্দ হয় আমাদের। আমরা সমর্থন করি তাকে, "খুব ভাল হবে, গল্প শুনতে শুনতে পথ ফুরিয়ে যাবে।"

"না, নীরস তথ্য শুনে পথকে দীর্ঘতর বলে মনে হবে।"

"না না, আমাদের খুব ভাল লাগবে উপেনদা।" মোহিত অনুরোধ করে।

দেবকীদা বলেন, "বলুন না, তবু কিছু জানা যাবে হিমালয়ের গাছপালা সম্পর্কে। যে গাছপালার সঙ্গে আমাদের এত নিকট সম্পর্ক, তাদের কথা শুনতে খারাপ লাগবে কেন। আপনি বলুন।"

উপেনবাবু আরম্ভ করেন, "পাহাড়ে পথচলার আনন্দের সাথী হিসেবে বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রকৃতির লীলাসম্ভারের ভেতর গাছপালা আর ফুলের ভূমিকা যে কতটা সেটা সাধারণ মানুষের চাইতে আমাদের অনেক বেশি উপলব্ধি করবার স্থযোগ রয়েছে। পাহাড়ের গঠন, উচ্চতা এমন কি দিক পর্যন্ত নির্ভুলভাবে নির্ণয় করতে গাছপালার সন্নিবেশ অদ্ভুতভাবে সাহায্য করে। এটা খানিকটা অভিজ্ঞতা ও গাছপালার সঙ্গে পরিচয় থেকে জানা যায়। তবে এ সম্বন্ধে বিশেষ ঔৎস্থক্য খুব কম লোকেরই আছে। রূপকুণ্ডের পথের গাছপালাকে ঠিক সর্বাঙ্গস্থন্দর ভাবে আপনাদের দিতে পারব না। কেননা এ যাত্রা মানসিক তৃপ্তি অপেক্ষা কর্তব্য-পালনের রূপ নিয়েই এসেছে। তাই ইচ্ছে আছে আর একবার এই পথে নতুন মন নিয়ে পা বাড়াবো। জানি না অদূর ভবিষ্যতে সে ইচ্ছা পূর্ণ হবে কিনা।

"যাই হোক, গোয়ালদাম থেকেই শুরু করা যাক। চির-পাইনের রাজত্ব গোয়ালদামে কিন্তু রেস্ট-হাউসটি ঘেরা মনোরম দেওদার বা Cedrus Deodara দিয়ে। দেওদার অবশ্য সবই লাগানো এবং বাঁকাপথে বাস গরুড় থেকে ঘন দেওদারের ভেতর দিয়েই গোয়ালদামে এসেছিল। পরে আমাদের তলওয়ারীর পথে নিয়ে গিয়েছিল। পায়েচলা পথ ঘন ওক আর রডোডেনড্রনের

ভেতর দিয়ে এঁকেবেঁকে দ্রুত নামার ব্যবস্থা করে দিয়েছে।

"Viburnum Berberis, Principeaও কিছু রয়েছে কিন্তু খুব কম। নন্দকেশরীর কাছাকাছি এসে আবার পাইনের দেখা পেয়েছি। আর তারা আমাদের সঙ্গে চলেছে প্রায় বগরিগড় পর্যন্ত।

"গোয়ালাম থেকে নন্দাকিনীর উপত্যকা পরিষ্কার দেখা যায়, পথে ছোট গ্রাম, সামান্য ধানক্ষেতও চোখে পড়ে। গোয়ালদামের রজনের গুদামটি নিশ্চয়ই আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ওর কাছেই সেই স্নান করবার কলটি। এতে বেশ বোঝা যায় পাইনের রজন সংগ্রহে গোয়ালদামের গুরুত্ব আছে।

"নন্দকেশরী থেকে দেবলের পথে ওপরের দিকে সবটাই পাইন আর Berberis-এর কাঁটা ঝোপ। কিছু Asparagusও রয়েছে। পাইনের তলায় কিছু বেগুনী Aechmauthera ছাড়া লক্ষ্যণীয় গাছ প্রায় নেই বললেই চলে। পাইনের পাতা যেখানে পড়ে সেখানে অন্য গাছের জীবনধারণ করা অত্যন্ত কঠিন। পাইনের পাতায় রয়েছে প্রচুর তেল। মাটিতে পড়ে decomposed হয়ে অম্লরসের মাটি সৃষ্টি করে অন্য গাছকে বাঁচতে দেয় না। যারা বাঁচে তাদের জন্যে এ ধরনের মাটি অসহ্য নয়। দেবলের পর বগরিগড়ে যাবার পথে উপত্যকার পূবদিকের ঢালে ওকবনের বড়ই দুর্গতি। দেখে মনে হয়েছে বাতাসের রুক্ষ স্পর্শ ও প্রাণহীন পাথরই তাদের দুর্গতির জন্য দায়ী।

"বগরিগড় রেষ্ট-হাউসের গেটের বাইরে চোখে পড়েছে এক ধরনের অদ্ভুত লতা—Dicentra (Dutchman's breeches)। তারা হলদে ফুলের ঝুরি ঝুলিয়ে দিয়েছে মাথার ওপরে। কাছেই দেখতে পেয়েছি গোলাপী Lobelia, লতানো Clematis আর Berberis-এর ঝোপ।

"মান্দোলীর একটু পরে গায়ে গায়ে লাগানো গুটিকতক অস্বাভাবিক উঁচু Cupressus (cypress)-এর তলায় ফুল খুঁজতে শুরু করেছিলাম। কয়েকটা অদ্ভুত Gentiana আর প্রচুর Aster পেলাম গাছের তলায়। তারা সাদা পাপড়ী মেলে দিয়েছিল। অবশ্য ফোটা ফুল বেশী পাই নি। তারপর চড়াই পথ চলল ওক (Quercus Incana) আর Rhododendron Arboriumয়ের বনপথের ভেতর দিয়ে। Q. Incana ও Q. Semecarpifolia-র সঙ্গে Rhododendron Arborium (লাল ফুল) থাকবেই। যেমন V. O. F. Birch-এর সঙ্গে দেখেছেন কাঁঠাল পাতার মত Rhododendron Campa-

nulatumকে। ওদের সাদা সাদা ফুল হয়। ওক রডোডেনড্রনের তলায় বিভিন্ন ধরনের Anaphalis ছাড়া আর উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু পাই নি। ওকের গায়ে অবশ্য প্রচুর ফার্ন (Epiphyte) আর Sedum Trifidum ছিল। হাল্কা সবুজ রঙের এ গাছতলাতে যা ফুল ছিল পাতার রঙের সঙ্গে তাদের আলাদা করা যায় না। হঠাৎ গাছতলায় একটি লোককে তুলোর মত খানিকটা জিনিসে লোহা আর পাথর ঠুকে সহজে আগুন জ্বালিয়ে ধূমপানের মৌজ করতে দেখে কৌতূহল হল। ব্যাপারটা মন্দ লাগল না যখন দেখলাম তুলোর মত বস্তুটি অত্যন্ত দাহ্য আর সংগ্রহ করা হয়েছে Anaphalis Triplinervis-এর পাতার বহিরাবরণ থেকে।

"অত্যন্ত পরিশ্রান্ত মনে হল লোহাজঙের সর্বোচ্চ স্থানটিতে পৌঁছে। বিশ্রাম নিয়ে মন্দিরে ঘণ্টা দুলিয়ে ওয়ানের পথে নেমে এলাম। সেই পরিচিত ওক-রডোডেনড্রনের ঘন সন্নিবেশের ভেতর দিয়ে পথ দ্রুত নিচে নেমে এসেছে।

"লোহাজঙ্গ থেকে ওয়ানের দূরত্ব সম্বন্ধে স্থানীয় লোকের কথায় অবিশ্বাস করে দ্রুতপদে চলতে আরম্ভ করেও দুদিকের ছোট গাছপালার যে সমারোহ দেখেছি তার তুলনা নেই। সবাইকে সমাদর দিতে আরম্ভ করলে কাল কখন যে ওয়ানে পৌঁছতাম জানি না। না দিয়েই রাত ৮টার সময় মৃতপ্রায় অবস্থায় উপস্থিত হয়েছিলাম। তথাপি দেখে মনে হয়েছে সংগ্রহকারীদের ওটা একটা স্বর্গরাজ্য। কেবল ভুইন্দার উপত্যকা তথা নন্দনকানন পথের গুল্মসমৃদ্ধি বা Richness of Herbaceous forest undergrowth-এর সঙ্গেই খানিকটা তুলনা করা চলে। তবে অনেক বেশি প্রকারের গুল্ম রয়েছে এই পথে। পথের পাশে পাহাড়ের মাটির গায়ে Gaultheria, Hemiphragma, Anaphalis-এর ছড়াছড়ি আর ঢালে Geranium-এর বেগুনি ফুল চোখে পড়েছে প্রতি পদে। Boeminghausenia-এর সাদা মুড়ির মত ফুল, Thalictrum, Bupleurum, Corydalis-এর বিভিন্ন প্রজাতি সারাপথে প্রচুর দেখতে দেখতে ওয়ান ডাক-বাংলোর তলায় সেই ঝরণাটির পারে যখন এসেছি, সন্ধ্যে তখন উত্তীর্ণ হয়েছে। বহু পরিচিত সেই হলদে টকফলের গাছ Hippophae Rhamnoides-এর আবির্ভাব দেখেই বুঝতে পেরেছি প্রায় ৮ হাজার ফুটে এসে উপস্থিত হয়েছি।" ·

হঠাৎ থেমে গেলেন উপেনবাবু। আমরা তাঁর দিকে তাকাই। আমাদের সপ্রশ্ন দৃষ্টিকে এড়াতে পারেন না তিনি। বলেন, "এখন এই পর্যন্তই থাক।

ওয়ানের গাছপালার কথা পরে হবে। এখন আসুন ঐ Taxus Baccata গাছটিকে ভাল করে দেখে নেওয়া যাক।" তিনি ব্যগ্রভাবে বনের ভেতরে প্রবেশ করেন। আমরা তাঁকে অনুসরণ করি।

গাছটির গোড়ায় পৌঁছে উপেনবাবু বলেন, "ফলগুলোর ওপরের দিকটা দেখুন কেমন সুন্দর লাল। আপনার বোধ হয় মনে আছে মহারাজ, নীলগিরি অভিযানের সময় গোবিন্দঘাট থেকে ঘাংরিয়া যাবার পথে আমরা এই ফল পেয়েছিলাম। কুলিদের দেখাদেখি আমরা তখন এই ফল খেয়েছিলাম।"

কথাটা মনে পড়ে আমার। বলি, "হ্যাঁ, খেতে খুব মিষ্টি।"

"তাই নাকি?" মোহিত বলে।

"দেখে তো মনে হচ্ছে, এগুলিও গাছপাকা।" দাশু বলে।

"খেলে মন্দ হয় না কিন্তু।" দেবকীদা বলেন।

উপেনবাবু হাসতে হাসতে বলেন, "খেতে ভালই লাগবে কিন্তু খাবার আগে একটি কথা আপনাদের জেনে নেওয়া দরকার, সে কথাটি না জেনেই সেদিন আমরা এই ফল খেয়েছিলাম।"

"কি কথা?" আমরা বিস্মিত।

"খাবার সময় বিশেষ সাবধান হওয়া দরকার। কিছুতেই যেন এর আঁটিতে কামড় না পড়ে।"

"কেন?"

"ফলটি খেতে যতই মিষ্টি হোক, এর বীজটি বিষাক্ত।"

ব্যস্, ফল খাবার সবটুকু উৎসাহ উবে গেল। শুধু তাই নয়, আমার আবার আর একটি ভাবনা দেখা দেয় মনে। আমি ভাবি, ভাগ্যিস আজ উপেনবাবু কথাটা জেনেছেন। না জানলে হয়তো এই নিষিদ্ধ ফল খাবার লোভে অসময়ে এই সুন্দর ভুবন ছেড়ে চলে যেতে হত। কিন্তু সেদিন ঘাংরিয়ার পথে তো না জেনে দিব্যি নির্ভয়ে এই ফল খেয়ে খিদে মিটিয়েছিলাম। আজ তাহলে এত ভয় করছে কেন? এ তো বিষের ভয় নয়, জ্ঞানের ভয়। জ্ঞান হলেই ভয় হয়। অজ্ঞানের ভয় নেই।

সহসা ভাবনার অবসান হয়। একটা শব্দ কানে ভেসে আসে। আমরা সচকিত হয়ে উঠি। মনে হচ্ছে একটা চিৎকার। কিসের চিৎকার? কোন বন্যজন্তু কি? আমরা এক জায়গায় জড়ো হই। কান পেতে শুনি। না জন্তু নয়, মানুষ। মানুষের চিৎকার। এখানে এসময় আমাদের দলের লোক ছাড়া

আর মানুষ আসবে কোথা থেকে। আমরা চিৎকার করে সাড়া দিই। ওদিক থেকেও সাড়া মেলে। আমরা বসে পড়ি।

মিনিট পনেরো বাদে ধুঁকতে ধুঁকতে অসিতবাবু এসে হাজির হন। তিনি ছুটতে ছুটতে এসেছেন। পিঠ থেকে রুকস্যাকটা নামিয়ে তিনিও বসে পড়েন আমাদের পাশে। তারপরে একটু জিরিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করেন, "তোমরা কি কানে তুলো গুঁজে ছিলে?"

"কেন?"

"কখন থেকে চেঁচাচ্ছি। গলা ভেঙ্গে গেছে।"

"ইস্, আপনার এ অবস্থা হবে জানলে, সেদিন দেবল থেকে সেই টক ডালিম গাছের ছাল নিয়ে আসতাম।"

অসিতবাবু কিন্তু পরিহাসের কোন উত্তর না দিয়ে নিজের কথা বলেন, "কিছু খেতেটেতে হবে, না চড়াই ভাঙ্গলেই চলবে?"

তাই তো, কথাটা তো খেয়াল হয় নি এতক্ষণ। সত্যই যে প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে দেখছি। খেয়াল হতেই খিদে পেয়ে গেল? হবেই তো, পেটের সঙ্গে যে মনের মিল রয়েছে। এতক্ষণ পথের সৌন্দর্য মনকে ভুলিয়ে রেখেছিল।

অসিতবাবুর রুকস্যাক থেকে মোহিত খাবার বের করে পরিবেশন শুরু করে দেয়—পরোটা, আলুসিদ্ধ আর হালুয়া।

দেবকীদা খেতে খেতে বলেন, "অমিতাভ আর সুজল কখন আসবে?"

"বলা কঠিন, আমি রওনা দেওয়া পর্যন্ত রামচাঁদ ফিরে আসে নি। সে কুলি নিয়ে এলেই ওরা রওনা হবে।"

"আমাদের ধরতে পারবে কি?"

"রামচাঁদ যদি দুটোর মধ্যেও ফিরে আসে, তাহলেও পারবে। তার বেশি দেরি হলে আমি ওদের আজ রওনা হতে নিষেধ করে এসেছি। কাল খুব সকালে রওনা হবে।"

"কিন্তু ওদের সঙ্গে যে স্লিপিং-ব্যাগ এয়ার-ম্যাট্রেস নেই?"

"আশা তো করছি রামচাঁদ এসে যাবে দুটোর মধ্যে।"

"আমার কিন্তু কেন যেন মনে হচ্ছে, তোমার এ আশা একেবারেই দুরাশা। রামচাঁদ আজ ওয়ানেই থাকবে।" দেবকীদা দৃঢ়কণ্ঠে বলেন।

অসিতবাবু চুপ করে থাকেন। দেবকীদাও আর কিছু বলেন না। একটু বাদে আমরা উঠে দাঁড়াই। বনপথে এগিয়ে চলি।

কিছুক্ষণ থেকেই বনের ঘনত্ব কমে আসছিল। সহসা বন শেষ হয়ে গেল। আমরা চড়াই পথের প্রান্তে পৌঁছেছি। এখানে গাছপালা কিছুই নেই। ওয়ান থেকে রওনা হবার পরে চড়াই বেয়ে আমরা রণকধারে উঠেছি। তারপরে উৎরাই পথ দিয়ে নেমে গেছি বহু নিচে। সেখান থেকে আবার চড়াই ভেঙে উঠে এসেছি এই পাহাড়টির ওপরে। এ পর্যন্ত পথ ছিল গাছপালার ভেতর দিয়ে। এখানে এসে সেই বন শেষ হয়ে গেল। উপেনবাবু বললেন, "আমরা ট্রি-লাইনের ওপরে উঠে এসেছি। প্রকৃতির কার্পণ্যের জন্য এ উচ্চতায় বড় গাছ জন্মাতে পারে না। যারা জন্মায় তাদের ঐ দেখতে পাচ্ছেন সামনে।"

আমরা সামনে তাকাই। সামনে কাঁটাগাছ ও ঘাসবন। বিরাট বিরাট ঘাস। যতদূর দেখা যাচ্ছে কেবল ঘাস। কাঁটা ও ঘাস ছাড়া কিছু নেই এখানে। উপেনবাবু কিন্তু ঐ ঘাসের জন্যই এসেছেন এখানে। ঐ ঘাসবন থেকেই বুগিয়াল শুরু।

বীর বলে, "এ জায়গাটার নাম তিথাক। এটিকে আলি বুগিয়ালের সীমান্ত বলা যেতে পারে। মূল আলি বুগিয়াল এখান থেকে সওয়া দু মাইল। সেখানে বন বিভাগের একখানি বিশ্রাম-গৃহ আছে। কিন্তু কোন চৌকিদার নেই। ওয়ান ডাকবাংলোর চৌকিদারের কাছেই ঘরের চাবি থাকে। আলি বুগিয়ালে তিন ঘর গৃহস্থ ও ভেড়ার পশম কাটার একটা কারখানা আছে। গৃহস্থরা শীতকালেও সেখানে থাকেন। অথচ আলি বুগিয়ালের উচ্চতা ১১,৩৫৮ ফুট। আলি বুগিয়াল থেকে বালান ও ঘেস হয়ে পিণ্ডারী হিমবাহে যাবার একটি পথ আছে। আপনারা ইচ্ছে করলে এ পথেও পিণ্ডারী যেতে পারেন। আমি পথ জানি, আপনাদের নিয়ে যেতে পারি।"

"এ পথে যেতে পারলে ভালই হত, অনেক সময় এবং পরিশ্রম বেঁচে যেত। কিন্তু প্রাণেশ ও মেজর যে অপেক্ষা করবেন বাগেশ্বরে। আমাদের বাগেশ্বর হয়ে যেতে হবে।"

কিছুদূর এগোবার পরই শুরু হল সেই কাঁটাঝোপ আর ঘাসবন। গুগ্গুল ঝোপ আর টাইগার গ্রাসের উঁচুনিচু প্রান্তর। ঘাসের ভেতরে এক রকমের লতা। উপেনবাবু বলেন—ক্লাইম্বার।

বীর বলে—সিমুর।

লতায় লতায় ছোট ছোট বাদামী রং-এর ফল ধরেছে। খেতে নাকি খুব টক।

আর রয়েছে বন-গোলাপ গাছ—অসংখ্য। কিন্তু একটি গাছেও ফুল নেই।

খাড়া পাহাড়ের গা ঘেঁষে ঘাসবনের ভেতর দিয়ে সাবধানে পা ফেলে এগোতে হচ্ছে। পথের বাঁদিকে পাতালপ্রসারী খাদ। তাকাতে ভয় করে। মাথা ঘুরে যায়।

কিছুক্ষণ বাদে বীর বলে, "এ জায়গাটার নাম ডোলিয়া। ইচ্ছে করলে এখানে তাঁবু ফেলতে পারেন। বেশি দূর এগোলে মুখার্জিসাবদের অসুবিধে হবে।"

কথাটা মিথ্যে নয়। তাছাড়া এ জায়গাটা মোটামুটি সমতল। ঘাসগুলি অপেক্ষাকৃত ছোট। কিন্তু জল? চারিদিকে তাকাই। জিজ্ঞেস করি বীর সিংকে, "জল কোথায়?"

ঘাড় চুলকে বীর বলে, "তা একটু নিচে। ঐ যে ওখানে।" সে ইশারা করে।

"এ যে দেখছি, বহু নিচে।"

"তা একটু নিচে। কিন্তু তাতে কি। কুলিরা জল নিয়ে আসবে।"

"কি দরকার এ হাঙ্গামায়। তাছাড়া জায়গাটার দৃশ্য মোটেই ভাল নয়। রাত কাটাবো—চাঁদনীরাত। তার চেয়ে চল না, একটু এগিয়ে দেখা যাক।"

"তাহলে বৈদিনী বুগিয়ালের আগে আর পছন্দমত জায়গা পাবেন না।"

"আমরা তো বৈদিনীতেই তাঁবু ফেলব, বলে এসেছি সুজলদের।" অসিতবাবু বলেন, "বৈদিনী আর কতদূর?"

"মাইল দেড়েক।"

"কতক্ষণ লাগবে?"

"অন্তত ঘণ্টা খানেক।"

"তাহলে চল সেখানেই যাওয়া যাক। শুনেছি জায়গাটা খুবই সুন্দর। চাঁদনী রাত—আজ আকাশটাও পরিষ্কার। মনে হচ্ছে লাটুদেবী আমাদের প্রার্থনা পূরণ করেছেন—রাতেও আকাশ পরিষ্কার থাকবে। বৈদিনী বুগিয়ালেই রাত কাটাবো আজ।"

"কিন্তু মুখার্জিসাবরা কি অতদূর পৌছতে পারবেন?" বীর আবার মনে করিয়ে দেয়। সুজল ও অমিতাভ আমাদের সহযাত্রী। কিন্তু তাদের জন্য আমাদের চেয়ে ওর যেন ভাবনা বেশি। আশ্চর্য মানুষ বীর সিং। সত্যই এমন সঙ্গী পাওয়া ভাগ্যের কথা।

অসিতবাবু বললেন, "ওরা যদি এতদূর আসতে পারে, তাহলে এ দেড় মাইলও যেতে পারবে। চল বৈদিনীতেই যাওয়া যাক।"

আমরা এগিয়ে চললাম।

একটু বাদেই বুঝতে পারি বীর কেন বার বার ডোলিয়াতে তাঁবু ফেলতে বলছিল। আবার সেই মানুষের চেয়ে উঁচু ঘাসবন শুরু হল। তেমনি ঘাস সরিয়ে সারি বেধে পথ চলতে হচ্ছে। বীরের পেছনে এগিয়ে চলেছি। কোন্ দিকে যাচ্ছি কিছুই বুঝতে পারছি না। মাঝে মাঝেই ঘাসে পা আটকে যাচ্ছে। হোঁচট খাচ্ছি—পড়ে যাচ্ছি। পড়ার আগে বুঝতে পারছি না কোথায় পড়ব। তবে জানি খাদ থাকলে বিপদ হবে। খাদ আছে। কিন্তু ভাগ্য ভাল, আমরা কেউই খাদে পড়ি নি এখনও। তবে পাথরের ওপরে পড়ে ব্যথা পেয়েছি। ব্যথায় বিচলিত হই নি। হিমালয়ের প্রেমে পড়েছি। ব্যথাই যে প্রেমিকের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্বল।

হিমালয়কে ভালবাসলে, হিমালয়ও ভালবাসে। হিমালয় যাদের ভালবাসে নন্দাদেবী তাদের করুণা করেন। নন্দাদেবীর অসীম করুণায় আমরা নির্বিঘ্নে এসে পৌঁছলাম সেই ঘাসবনের শেষে। আর সেখানেই সেই সীমাহীন সৌন্দর্য।

আমাদের দু চোখ জুড়িয়ে গেল। মন এক অনির্বচনীয় আনন্দে ভরে উঠল। সামনে সুদূরপ্রসারী শ্যামল কোমল তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তর—বৈদিনী বুগিয়াল। সবুজ সুন্দর হিমালয়। কিন্তু সবুজেই শেষ হয় নি হিমালয়। সবুজের শেষে সাদা—হিমতীর্থ হিমালয়। ত্রিশুল নন্দাঘুন্টি আর চননিয়াকোটের শৃঙ্গমালা। নীলাকাশের গলায় কে যেন মুক্তোর মালা দিয়েছে পড়িয়ে। বৈদিনীও নিরাভরণা নয়। একটি স্বচ্ছ শীর্ণা জলরেখা তার কণ্ঠে জড়িয়ে রয়েছে। ঝিমি-ঝিমি রবে জলতরঙ্গ বাজিয়ে সে আমাদের আবাহন করল। আমরা সেই ঝরণার তীরে তাঁবু ফেললাম। আজ থেকে তাঁবু-জীবন শুরু হল আমাদের। দুর্গম গিরি-কান্তার পরিক্রমার আর একটি দিন ফুরিয়ে গেল।

তুষারাবৃত ত্রিশুলের শিরে সূর্যালোক প্রতিফলিত হয়ে আছাড় খেয়ে পড়েছে বৈদিনীর বুকে। কিন্তু সেই আলোকে কেবল বৈদিনী আলোময় হয়ে ওঠে নি। আলোময় করে তুলেছে আমাদের—আমাদের জীবন ও যৌবনকে। যে জীবন মর্ত্যের সম্পদ হয়েও চিরকাল স্বর্গের প্রত্যাশী। যে যৌবনের সাধ মেটাতেই মানুষের দুর্গম গিরি-কান্তার পরিক্রমা।

একসময় সূর্যের শেষ আলো মিলিয়ে গেল। কালো আঁধার নেমে এল বৈদিনীর বুকে। তারপরে আবার আঁধার ঘুচে গেল। চাঁদ উঠল। তার আলো পড়ল ত্রিশুলের শ্বেতশুভ্র শিখরে। চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙ্গে পড়ল বৈদিনীর বুকে। স্বর্গ ও মর্ত্য এক হয়ে গেল।

॥ ষোল ॥

কাল রাতে আসে নি ওরা। বোধ হয় রওনা হয় নি। হয়তো কুলি যোগাড় করতে পারে নি। অথবা এমন সময় যোগাড় হয়েছে যে রওনা দিতে সাহস পায় নি। তবু রাতে আমরা নিশ্চিন্ত হতে পারি নি। বার বার ওদের কথা ভেবেছি। রামচাঁদের মত মানুষ তিনজন কুলি জোগাড় করতে পারে নি? যে কারণেই ওরা কাল ওয়ানে আটকে থাকুক, বিছানা ও গরম পোশাকের অভাবে অমিতাভ ও সুজল সারারাত কষ্ট পেয়েছে।

দ্বিতীয়বার কফি খেয়ে উপেনবাবু বলেন, "আমি তাহলে একবার বৈদিনী থেকে ঘুরে আসছি।"

প্রস্তাবটা মন্দ নয়। বৈদিনী বুগিয়ালের উদ্ভিদ সমীক্ষা করবার জন্যই উপেনবাবু আমাদের সঙ্গে এসেছেন। অমিতাভ ও সুজলের জন্য এখানে আমাদের অপেক্ষা করতেই হবে। এই অবসরে উপেনবাবু অনায়াসে নিজের কাজ এগিয়ে রাখতে পারেন।

হঠাৎ মোহিত জিজ্ঞেস করে উপেনবাবুকে, "কোথা থেকে ঘুরে আসছেন বললেন?"

"বৈদিনী থেকে।" উপেনবাবু উত্তর দেন।

"কেন এটা কি বৈদিনী নয়?"

"হ্যাঁ, এটাও বৈদিনীর অংশ। তবে মূল বৈদিনী খানিক নিচে। আমি সেখানেই যেতে চাইছি।"

"আমরা সেখানে যাব না?" মোহিত বিচলিত।

"যাব রে যাব, সবাই যাব।" অসিতবাবু ভরসা দেন মোহিতকে, "বৈদিনী দিয়েই আমাদের পথ। যাবার পথে বেশি সময় হাতে থাকবে না বলে উপেনবাবু এখনই সমীক্ষা শেষ করে ফেলতে চান।"

"আমি উপেনদার সঙ্গে যাব অসিতদা ?" মাঝখান থেকে দাশু বলে ওঠে।

মোহিত বলে, "এখানে তো কোন কাজ নেই এখন, আমিও একবার ঘুরে আসি না ?"

"বেশ তো যা। কিন্তু দেরি করিস না। ওরা এলেই আমরা রওনা হব। ওরা সকালেই এসে যাবে।"

"আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমরা রান্না হবার আগেই ফিরে আসছি।"

উপেনবাবু তাঁর দুই সহকারী ও দুই সহযাত্রীর সঙ্গে এগিয়ে চলেন। সহসা পিছু ডাকে বীর, "সাব।"

আমরা বিরক্ত হই। শত হলেও হিমালয়। দুর্গম না হলেও সুগম তো নয়। বিপদ হতে কতক্ষণ। কিন্তু বীর তো এমন করে না। কেন সে পিছু ডাকল ?

বীর বলে, "আপনাদের অচেনা জায়গা। আপনি এই আলম সিংকে সঙ্গে নিয়ে যান।"

সত্যই তো, এ কথাটা কারও খেয়াল হয় নি।

উপেনবাবু বলেন, "আলম সব চেনে ?"

"হ্যাঁ, এককালে ও এই বুগিয়ালে ভেড়া চরাতো।"

"ভালই হবে তাহলে। চল হে আলমগীর, চল আমাদের সঙ্গে।"

আলম এগিয়ে যায়, ওরা তাকে অনুসরণ করে। বীর আবার রান্নার কাজে মনোনিবেশ করে। আমরা মনে মনে ধন্যবাদ দিই তাকে।

অসিতবাবু দেবকীদা ও আমি কেবল রয়েছি এখানে। কয়েকজন কুলির সাহায্যে আমরা ছোট তাঁবুগুলি গুটিয়ে ফেলি। বড় তাঁবু থেকে মালপত্র বের করে নিই। তারপরে অধিকাংশ কুলিদের ছেড়ে দিই পাথরনাচুনির পথে। ওরা অনেকক্ষণ থেকেই ছটফট করছিল। বলছিল—দেরি করলে বৃষ্টিতে ভিজবে। আজ বিকেলে নাকি বৃষ্টি হবে। অনেক বলেকয়ে বড় তাঁবু ও খাবারের কিট্ বইবার জন্য পাঁচজন কুলিকে রাজী করালাম এখানে থাকতে। কানে কানে তাদের বকশিশের প্রতিশ্রুতি দিতে হল।

সাড়ে দশটার সময় বীর বলল—আধঘণ্টায় রান্না হয়ে যাবে।

উপেনবাবুরা হয়তো এসে যাবেন ইতিমধ্যে। কিন্তু যাদের পথ চেয়ে বসে রয়েছি কাল বিকেল থেকে, তাদেরই যে পাত্তা নেই এখন পর্যন্ত। আজকের পথ কালকের থেকে দুর্গমতর। আবহাওয়াও ভাল থাকবে বলে মনে হচ্ছে না।

সকালের রোদটুকু মিলিয়ে গেছে অনেকক্ষণ। আকাশটা আস্তে আস্তে মেঘে ছেয়ে যাচ্ছে। কখন বর্ষণ শুরু হবে বুঝতে পারছি না। বেশি দেরি হলে আজ এখানেই থাকতে হবে। এদিকে কুলিদের ছেড়ে দিয়েছি। কি অদৃষ্টে আছে কে জানে?

ঠাণ্ডা বাড়ছে। আমারা রয়েছি একটা ন্যাড়া পাহাড়ের পেছনে। এখানে একদম হাওয়া নেই। তবু শীত লাগছে। উচ্চতা তো কম নয়, সাড়ে এগারো হাজার ফুট। তাহলেও বাইরে বসে রয়েছি আমরা। বসে বসে কালকের ফেলে আসা পথটিকে দেখছি। পালা করে বাইনোকুলার চোখে লাগাচ্ছি। কিন্তু বৃথা—যত দূর দৃষ্টি যায় কেউ নেই। শুনেছি দুর্গম পথে পেছনে তাকাতে নেই। অথচ আজ সামনে তাকাবার কোন সুযোগই পাচ্ছি না। কেবলই পেছনে তাকাতে হচ্ছে। সহযাত্রীরা যে পড়ে রয়েছে পেছনে।

"এগারোটা বেজে গেল অথচ ওরা এখনও এলো না।" অসিতবাবু বিচলিত।

"তাই তো চিন্তায় ফেললো দেখছি।" আমি বলি।

"চিন্তার বোধ হয় শেষ হল এবারে।" বাইনোকুলার চোখে লাগিয়ে বলে ওঠেন দেবকীদা।

"কেন এসে গেছে নাকি!" আমরা তাঁর কাছে আসি। দূরে তাকাই, দেখতে পাই না।

"হ্যাঁ, আসছে।" দেবকীদা উত্তর দেন।

"দেখি।" দেবকীদার হাত থেকে বাইনোকুলারটা কেড়ে নেন অসিতবাবু। আর সেটা চোখে লাগিয়েই চিৎকার করে ওঠেন, "ঠিকই, এসে গেছে। আগে অমিতাভ, তারপরে রামচাঁদ ও সুজল। ওদের পেছনে কুলিরা—এক দুই তিন চার, চারজন কুলি। না, এ লোকটাকে নিয়ে পারা গেল না দেখছি, তিন কুলির মাল ওজন করে দিয়ে এলাম, আর সে চার-চারজন কুলি জুটিয়েছে।"

"জোটাক গে। এসেছে যে এই আনন্দের। না হয় একজন বেশি কুলি এনেছে। তুমি আবার এ নিয়ে কিছু বলো না অসিত।" দেবকীদা আনন্দিত। তিনি রামচাঁদের অপরাধ মার্জনা করেন।

কিছুক্ষণ বাদে ওদের খালি চোখে দেখতে পাই আমরা। আমরা হাত নাড়ি, চিৎকার করি। ওরা সাড়া দেয়, ওরা এগিয়ে আসে। আমরা এগিয়ে চলি। ওরা ছুটে আসে, আমরা ছুটে চলি। কাছে আরও কাছে। আমরা

মিলিত হই। হাত ধরাধরি করে তাঁবুর কাছে ফিরে আসি।

আসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বীর কফি আর বিস্কুট এনে দেয় ওদের। আমরা বাইনোকুলারে ওদের দেখতে পেয়েছি শুনেই সে নাকি কফির জল চড়িয়ে দিয়েছিল।

কফিতে চুমুক দিয়ে অমিতাভ বলে, "কাল বিকেলেই কুলি যোগাড় করেছে রামচাঁদ, কিন্তু রাত হয়ে যাবে বলে আর রওনা হই নি।"

"ভালই করেছ।" দেবকীদা বলেন, "কিন্তু বিছানার অভাবে রাতে নিশ্চয়ই তোমরা শীতে কষ্ট পেয়েছো।"

"না, না। চৌকিদার আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। নিজেও ছিল আমাদের ঘরে। সারারাত ঘুমায় নি, আগুনের তদারক করেছে। কোন কষ্ট হয়নি আমাদের।" অমিতাভ উত্তর দেয়।

"লোকটি সত্যই বড় ভাল। সকালে আসার সময় পাঁচটা টাকা দিয়েছি। কিছুতেই নেবে না। অনেক বলে-কয়ে নিতে রাজী করিয়েছি শেষ পর্যন্ত।" সুজল বলে।

"কটার সময় রওনা হয়েছ ওয়ান থেকে?" অমিতাভকে জিজ্ঞেস করি।

"ছটার পরে। পাঁচ ঘণ্টার একটু বেশি লাগল। তোমাদের কাল কতক্ষণ লেগেছে?"

"প্রায় সাত ঘণ্টা।" দেবকীদা উত্তর দেন, "এই প্রবীণ পর্বতারোহী যে সঙ্গে ছিল ভাই। ওদের আস্তে চলতে হয়েছে।"

সুজল বলে, "আজ আমরা এগিয়ে যাচ্ছি তো?"

"তোরা পারবি কি? পাথরনাচুনি এখান থেকে ন মাইল।" অসিতবাবু বলেন, "বেশ চড়াই পথ।"

"তাতে কি হয়েছে। পারব না কেন?" সুজল বিস্মিত।

"না, তোরা এই এসে পৌছলি। তাছাড়া সেদিন তুই চোট পেয়েছিলি।"

"ও, সেই কথা। তাহলে জেনে রাখো, ন মাইল যেতে আমার ছ ঘণ্টার বেশি লাগবে না, কারণ আমার শরীর পুরো ঝরঝরে।" সুজল জানিয়ে দেয়।

"উপেনবাবু মোহিত, দাশু—ওরা সবাই কোথায়? ওদের তো দেখছি না। ওরা কি রওনা হয়ে গেছে?"

"না, উপেনবাবু উদ্ভিদ সমীক্ষায় বেরিয়েছেন। মোহিত আর দাশু তাঁর সঙ্গে গেছে। এবারে এসে যাবে ওরা।" দেবকীদা বলেন।

"ওরা এলে, খেয়ে নিয়ে চল বেরিয়ে পড়া যাক।" সুজল বলে।

অসিতবাবু গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞেস করেন, "না খেয়ে বেরুতে পারবি?"

"না," গম্ভীরতর কণ্ঠে জবাব দেয় সুজল।

আমরা হাসতে থাকি ওদের কথায়। শেষদিকে ওরাও আমাদের সঙ্গে যোগ দেয়। আমাদের কলহাস্যে মুখরিত হয়ে ওঠে বৈদিনী বুগিয়াল।

একটার সময় খাওয়ার পাট চুকলো। দেড়টার মধ্যে বেরিয়ে পড়লাম পথে। পথ মানে সবুজ বৈদিনীর বিস্তীর্ণ প্রান্তর। এ তো বৈদিনী নয়, বৈকুণ্ঠ কিংবা বৈজয়ন্ত। বৈতরণী পেরোতে পারলেই পৌঁছনো যায় এই বৈরাগ্য-নিকেতনে।

উপেনবাবু চলেছেন সবার আগে। তাঁর পরিচিত পথ। একটু আগে তিনি তাঁবুতে ফিরেছিলেন এই পথে।

আজ আকাশটা হঠাৎ উদার হয়েছে। সকাল থেকে মেঘের আনাগোনা শুরু হয়েছিল। এখন তারা যেন কোথায় গেছে পালিয়ে। রোদে ঝলমল করছে বৈদিনী। ঝলমল করছে ত্রিশুল আর নন্দাঘুন্টি। ঝলমলিয়ে উঠেছে আমাদের মন। লাটুদেবী আমাদের প্রতি মুখ তুলে চেয়েছেন। আবহাওয়া ভাল হয়েছে।

আধঘণ্টার মধ্যেই আমরা বৈদিনী মন্দিরের সামনে এলাম। এখানে আবার বৈদিনী গঙ্গার দেখা পেলাম—শীর্ণকায়া স্রোতস্বিনী। উঁচু-নিচু সবুজ প্রান্তরের বুক চিড়ে বয়ে চলেছে। সেই প্রান্তরে পাথরের দুটি ছোট ছোট মন্দির। তুলনায় একটি একটু বড়। কোনমতে মাথা নিচু করে ভেতরে ঢোকা যায়। ভেতরটা খুব একটা অন্ধকার নয়। ওপরের দিক থেকে আলো আসার পথ আছে। ভেতরে রয়েছে ভগ্ন দেবীমূর্তি—ওরা বলে মহিষমর্দিনী। আছে একটি ঘণ্টা। তাতে লেখা—বলবন্ত সিং মেহতা, ১৯২৬।

পুণ্যাত্মা বলবন্ত। চল্লিশ বছর আগে গিরি-কান্তারের মন্দিরের জন্য নিয়ে এসেছিলেন এই ঘণ্টা। সশ্রদ্ধ অন্তরে আমরা তাঁকে স্মরণ করি। স্মরণ করি তাঁদের, যাঁরা এই মন্দির আর মূর্তি নির্মাণ করে গেছেন পরবর্তী কালের পুণ্যার্থী মানুষের জন্য। বরণ করি দেবী দশভুজাকে। যাঁর করুণা না হলে মানুষের কোন আশা পূর্ণ হয় না, কোন যাত্রা সফল হয় না—সেই দুর্গতি-নাশিনী দেবী দুর্গাকে। তাঁকে আমরা প্রণাম করি। শক্তিদাত্রীর কাছে শক্তি

প্রার্থনা করে আমরা বেরিয়ে আসি মন্দির থেকে।

পাশেই ছোট মন্দিরটি। খুবই ছোট। হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকতে হল ভেতরে। ভেতরটা বেশ অন্ধকার। এ মন্দিরেও কয়েকটি মূর্তি আছে। আর তারা প্রায় অক্ষত। মহিষমর্দিনী ও সরস্বতীর মূর্তি দুটি দর্শনীয়। মন্দিরটি ছোট আর ভেতরটা অন্ধকার বলেই বোধ করি দেব-দেবীরা এখনও অক্ষত রয়েছেন। বীরপুঙ্গবদের নজরে পড়েন নি।

মনে পড়ছে নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের সেই বিখ্যাত উক্তি—'সত্য সেলুকাস! কি বিচিত্র এই দেশ।' পুণ্যাত্মা ও দুরাত্মার, ধার্মিক ও অধার্মিকের, ভাল ও মন্দের এমন সহাবস্থান আর বোধ হয় নেই কোন দেশে। একদল মানুষ দুঃসহ দুঃখ কষ্ট সহ্য করে দুর্গম গিরি-কান্তারে মূর্তিময় মন্দির ও মঠ গড়েছেন। আর একদল মানুষ তাই ধ্বংস করেছে। স্রষ্টাদের প্রতি শ্রদ্ধায় হৃদয় বিগলিত হয়ে ওঠে আর ধ্বংসকারীদের প্রতি ঘৃণায় অন্তর পূর্ণ হয়। কিন্তু কখনই ভুলে যাই না—ভাল আর মন্দ দুইকে নিয়েই আমাদের ধর্ম, আমাদের সমাজ, আমাদের দেশ—বিচিত্র এই দেশ।

॥ সতেরো ॥

পুজো-শেষে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে আমরা মন্দির প্রদক্ষিণ করি। তারপরে রওনা হই পাথরনাচুনির পথে। দীর্ঘ ও দুর্গম পথ। আর দেরি করা উচিত হবে না। হিমালয়ের আবহাওয়াকে বিশ্বাস নেই।

মন্দিরের পেছনে ধর্মশালা। বেশ বড় একটি পাথরের ঘর। কাল এ পর্যন্ত এলে আর তাঁবু খাটাবার দরকার হত না। ধর্মশালাতেই রাত কাটাতে পারতাম।

ধর্মশালার পাশে পূজারীর ঘর। কাছেই একটি খুঁটির মাথায় নিশান উড়ছে।

বৈদিনী গঙ্গা পেরিয়ে খানিকটা নেমে এলাম আমরা। সামনেই কয়েক-খানি কুটির। কাঠ আর শুকনো ঘাসের চাল, পাথরের দেয়াল। বৈদিনী গঙ্গা থেকে নালা কেটে একটি জলধারা নিয়ে যাওয়া হয়েছে কুটিরগুলির ভেতরে। ঘরে বসেই জল। একেবারে জলের কল।

প্রতিটি কুটিরের ভেতরে খানিকটা অংশ বুক-সমান উঁচু পাথরের দেয়াল দিয়ে ঘেরা। এই অংশে রাতে মেষপালকরা মেষশাবকদের রেখে দেয়। ভালুক ও তুষার-চিতার অবাধ গতিবিধি এ অঞ্চলে। ওরা উভয়েই কচি পাঁঠা ও ভেড়া ভারী ভালবাসে।

মেষপালকদের কুটির কটি দেখে আমরা আবার পথ চলা শুরু করি। চলতে চলতে সহসা দাশু জিজ্ঞেস করে, "এ সব অঞ্চলে ভালুক ও তুষার-চিতা সত্যই আছে কি?"

"ঠিক এ অঞ্চলে ভালুক থাকে বলে মনে হচ্ছে না। কারণ ভালুক গভীর বন ছাড়া বাস করে না। তবে তারা হয়ত নিচের থেকে আসে। কিন্তু চিতা খুবই থাকতে পারে। এইরকম ঝোপঝাড় আর ঘাসবনেই যে চিতার বাস।"

"আচ্ছা মহারাজ," মোহিত বলে, "চিতা বলতে তো আপনি লেপার্ড বা স্নো-লেপার্ড বোঝাতে চাইছেন?"

"হ্যাঁ।"

"তাহলে চিতা বলছেন কেন? এরা তো লেপার্ড। চিতা যে কেবল দক্ষিণ আফ্রিকার উচ্চ তৃণভূমিতেই বাস করে।"

"আমরা লেপার্ডকে বাংলায় চিতা বলে থাকি। কিন্তু তুমি ঠিকই বলেছ মোহিত, চিতা দক্ষিণ-আফ্রিকার এক বিশেষ ধরনের বাঘ। তাদের সঙ্গে আমাদের দেশের লেপার্ডের আকৃতিগত ও প্রকৃতিগত কিছু মিল থাকলেও পার্থক্য প্রচুর।"

"যেমন?" সুজল আমাকে থামতে দিতে চায় না।

"লেপার্ড অত্যন্ত কুট ও হিংস্র। শিকারে তার অসীম ধৈর্য। ওজন প্রায় ২৪০ পাউণ্ডের মত। দৃঢ় পেশীবহুল দেহ। সম আকৃতির কোন পশু দৈহিক শক্তিতে লেপার্ডের সমকক্ষ নয়। সে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে শিকারের অনুসরণ করে। তখন উত্তেজনায় তার লেজটি ঝুলে পড়ে ও নড়তে থাকে। কাছে পৌঁছে পেছন থেকে সে শিকারের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে। তার দৃষ্টিশক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। প্রায় দু ফার্লং দূর থেকে সে আত্মগোপনকারী প্রাণীকে নজরে রাখতে পারে। ছোট শিকার হলে লেপার্ড অকুস্থলেই ভোজ শেষ করে। বড় শিকার মানে অন্তত মণখানেক ওজন হলে, সে গাছের ওপরে নিয়ে যায়। যাতে যখন ইচ্ছা খেতে পারে আর তার খাবারে কেউ ভাগ না বসাতে পারে।

"লেপার্ড যৌথ-জীবনের চেয়ে একক-জীবন বেশি পছন্দ করে। সামান্য সময়ের জন্যই সে সঙ্গিনীর সান্নিধ্য উপভোগ করে থাকে। সন্তানদের প্রতি তার কোন আকর্ষণ নেই।"

আমাকে থামতে দেখে দাশু বলে, "এবারে চিতার কথা বলুন।"

"কি হবে তাদের কথা শুনে, তারা তো আর এখানে আমাদের আক্রমণ করতে আসছে না!"

"না আসুক, তবু বল না হে, গল্প শুনতে শুনতে বেশ সহজে পথ চলা যাচ্ছে।" দেবকীদাও ওদের দলে যোগদান করেন।

অতএব আমাকে শুরু করতে হয়, "চিতার স্বভাব অন্যরকম। সে শান্ত ও নির্লিপ্ত প্রকৃতির। সাধারণতঃ চিতারা একটু ভীরু হয়। এরা মোটেই হিংস্র নয়। এদের ভঙ্গিমা ভারী শ্রী-সম্পন্ন ও চাল-চলন অত্যন্ত আভিজাত্য-মণ্ডিত। চিতার কণ্ঠস্বরও সৌজন্যময় প্রকৃতির পরিচায়ক। গর্জনের পরিবর্তে এরা পাখীর মত কলকূজনে আলাপন সমাপন করে।

"চিতার ওজন প্রায় ১০০ পাউণ্ড। তাদের দেহের দৈর্ঘ্য প্রায় সাত ফুট। দেহের অস্থি কঠিন। মাথাটি ছোট, চোয়াল দুর্বল। কিন্তু পা চারখানি বেশ বড়। ফলে এরা খুব তাড়াতাড়ি ছুটতে পারে। এদের গতিবেগ ঘণ্টায় ষাট মাইলেরও বেশি হয়। ক্ষিপ্রতায় এরা শ্রেষ্ঠ বন্যজন্তু। পায়ের আকার ছাড়াও এদের ক্ষিপ্রতার আর দুটি কারণ আছে। চিতার হৃদস্পন্দন অত্যন্ত ধীর। অর্থাৎ পেশী সংকোচন ও সম্প্রাসরণ দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে হয়ে থাকে। ফলে চিতার হৃদপিণ্ডের পক্ষে অতিরিক্ত পরিশ্রমের চাপ সহ্য করা সম্ভব হয়। ক্ষিপ্রতার অপর কারণটি হল চিতার পায়ের নিচের নরম মাংস। এর ফলে তারা ঘণ্টায় ষাট মাইল গতিবেগের মধ্যেও মোড় ফিরতে পারে। বুদ্ধি ও শক্তিতে অপেক্ষাকৃত হীন হয়েও সে কেবল ক্ষিপ্রতার গুণেই অনায়াসে শিকার করে। শিকারের সময় চিতা দৃষ্টির চেয়ে ঘ্রাণশক্তির ওপর বেশি নির্ভর করে থাকে।

"পরিশ্রমী হলেও চিতা মোটেই একাগ্রচিত্ত নয়। কয়েক শ গজ দৌড়ে যদি সে শিকার ধরতে না পারে, তা হলে সে শিকার ছেড়ে দিয়ে বসে পড়ে। সুযোগ বুঝে বাঘ বা লেপার্ড তার শ্রান্ত শিকার ধরে নেয়। আর চিতা নির্বিকার চিত্তে চেয়ে চেয়ে তাদের শিকার ধরা দেখে। অনেক সময় নির্লিপ্ত-তার জন্য চিতা নিজেই বাঘের শিকার হয়।

"চিতা পারিবারিক জীবন পছন্দ করে। সে সঙ্গিনীর সঙ্গে বছরের কয়েক মাস কাটায়। সন্তানদের সম্পর্কে পিতা একটু উদাসীন হলেও, মাতা দু বছর পর্যন্ত তাদের নিজের কাছে রাখে। দু বছর বয়সে তারা আকৃতিতে মায়ের মতই হয়।

"বাঘ নেকড়ে লেপার্ড ও চিতা সবই বিড়াল জাতীয় প্রাণী। চিতাও বিড়ালের মতই দৃষ্টিহীন হয়ে জন্মায়। জন্মের সময় চিতার গায়ে কোন পশম থাকে না। কিছুদিনের মধ্যেই চিতা-শিশুর গায়ে বড় বড় পশম গজায়—সম্ভবতঃ শিশুদেহ রক্ষার জন্যই প্রকৃতির এই ব্যবস্থা। কারণ এই পশম চিরস্থায়ী নয়। একটু বড় হলে, অর্থাৎ কৈশোরে এই পশম ঝড়ে পড়ে।"

থামা মাত্র দাশু আমাকে প্রশ্ন করে, "বাঘ যে বিড়াল জাতীয় প্রাণী তাতে কোন সন্দেহ নেই, না মহারাজ?"

"না, কারণ চার্লস ডারুইন তাঁর ক্রমবিকাশের মতবাদে বলেছেন, জগতে কোন প্রজাতি সুনির্দিষ্ট ও স্থায়ী নয়। এক প্রজাতি থেকে যদি আর এক প্রজাতির জন্ম হতে পারে, তা হলে বাঘ ও বিড়ালই বা এক জাতীয় প্রাণী হবে না কেন? আকৃতি ও প্রকৃতিতে পার্থক্য থাকলেও চেহারা ও চরিত্রে এদের প্রচুর সাদৃশ্য আছে।"

"আপনি তা হলে ডারুইনতত্ত্বে বিশ্বাসী?"

"নিশ্চয়ই। ডারুইনের অরিজিন অব স্পিসিস বা প্রজাতির জন্মকথা বইখানি বাজারে বের হয় ১৮৫৯ সালের ২৪শে নভেম্বর। সেকালের প্রচলিত ধারণা ও ধর্মমতের বিরুদ্ধে লেখা হলেও, বের হবার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে প্রথম সংস্করণের সাড়ে বারো শ বই বিক্রি হয়ে যায়। সেদিন অবশ্য বহু বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক বইখানি পড়ে খুশি হতে পারেন নি। কিন্তু বইখানির মধ্যে যে সব যুক্তি ও প্রমাণ ছিল, তাকে কিন্তু তাঁরা অবহেলা করতে পারেন নি। কিছুকাল ডারুইনের মতবাদের বিরুদ্ধে সমালোচনার ঝড বয়েছিল বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত জগৎ তাঁর মতবাদকে সত্য বলে মেনে নিয়েছে।"

"খুব গভীরভাবে চিন্তা করলে কিন্তু কোথাও কোথাও এই মতবাদের একটু আধটু গলদ চোখে পড়ে।" মোহিত বলে।

"যেমন?" জিজ্ঞেস করি।

"ডারুইন বলেছেন প্রাণী মাত্রই স্বার্থসর্বস্ব। তাই যদি হবে, তবে মানুষের সভ্যতা আজ বর্তমান পর্যায়ে উন্নীত হল কেমন করে? সংখ্যাতীত মানুষের

সাধনা ও স্বার্থত্যাগের ফলেই নয় কি ?”

“এই স্বার্থত্যাগের পেছনেও কিন্তু স্বার্থ আছে—নাম যশ ও প্রতিষ্ঠার স্বার্থ। তা ছাড়া সভ্যতার উচ্চতম সোপানে সুপ্রতিষ্ঠিত মানুষের নীচতা দেখে আজও তোমার চার্লস ডারুইনের বিবর্তনবাদকে সত্য বলে মেনে নিতে হবে।” দেবকীদা বলেন।

মোহিত জিজ্ঞেস করে, “কি রকম ?”

“ইদানীং ইথোলিজির চর্চা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে মানুষ ও পশুর নৈতিক মানের মধ্যে তেমন কোন বিরাট ব্যবধান নেই। এ সম্পর্কে তিনটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। প্রথমতঃ পাখিদের যৌথ-জীবনের মূলনীতি মানুষেরই মত। দ্বিতীয়তঃ মানুষের হিংসা পশুর চেয়ে কম ভয়ঙ্কর নয়। তৃতীয়তঃ যৌন-প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে আজও মানুষ পশুর মতই আচরণ করে থাকে।”

থামতে হয় দেবকীদাকে। কথায় কথায় কখন যে প্রান্তরটি পেরিয়ে এসেছি, কেউ খেয়াল করি নি। খেয়াল হতেই দেখি দূর থেকে যে ন্যাড়া পাহাড়টা দেখা যাচ্ছিল আমরা তারই পাদদেশে দাঁড়িয়ে আছি। থরে থরে পাঁচটি গিরিশিরা আছে এ পাহাড়ে, তাই এর নাম পঞ্চকোটি।

এবারে শুরু হল চড়াই। গিরিশিরা বেয়ে শিখরে উঠতে হবে আমাদের। কাজেই আর গল্প নয়। এখন কেবলই পথ চলা। গিরি-কান্তারের পথ।

নিচে দাঁড়িয়ে গিরিশিরাদের চেহারা দেখে বুক শুকিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ওদের যখন অতিক্রম করতেই হবে, তখন নন্দাদেবী ও লাটুদেবীর নাম করে চড়াই ভাঙ্গতে শুরু করে দিয়েছি। আর তাঁদের করুণায় অনেকটা ওপরেও উঠে এসেছি। নিচের থেকে কাজটাকে যত কঠিন বলে মনে হয়েছিল, এখন দেখছি ঠিক ততটা কঠিন নয়। মানুষের অসাধ্য কিছু নেই—কথাটা অন্য সব কিছুর মত পর্বতারোহণেও সমান সত্য।

পঞ্চকোটির তৃতীয় ধাপে এসেছি আমরা। হঠাৎ থামে রামচাঁদ। এগিয়ে যায় খাদের ধারে। হাত বাড়িয়ে বলে, “ঐ দেখুন একটি হ্রদ।”

বহু নিচে, বহু দূরে—সূর্যালোকে ঝক্‌ঝক্ করছে একটি সুবৃহৎ জলাশয়। ভারী ভাল লাগছে দেখতে। কিন্তু এখন ভাল করে দেখার সময় নেই আমাদের হাতে। তাই একটু বাদে রামচাঁদ চলতে শুরু করে। আর আমরাও সচল হই।

অবশেষে পঞ্চকোটির শিখরে এসে পৌঁছনো গেল। দূর থেকে এ জায়গাটাকে একটি তোরণের মত দেখাচ্ছিল। ভেবেছিলাম এখানে এলে চড়াই শেষ হবে। কিন্তু এবিং কাণ্ড! আমাদের সামনে পথ আগলে দাঁড়িয়ে রয়েছে আর একটি উচ্চতর পাহাড। তবে সেটি পঞ্চকোটির মত বৃক্ষলতাহীন নয়। ঘাসে ছাওয়া সবুজ পাহাড়। মনে হচ্ছে যেন শ্যামল কোমল গালিচা বিছিয়ে আমাদেরই অপেক্ষায় বসে আছে সে।

কিন্তু আমাদের কি এই পাহাড়ে উঠতে হবে নাকি?

"জী হ্যাঁ,।" রামচাঁদ বলে, "এ পাহাড়টির নাম আন্নালোরিয়া। কুমায়ুনী ভাষায় আন্না বা আনিয়াল শব্দের অর্থ ভেড়ার পাল। আর লোরিয়া মানে পা ফসকে যাওয়া।"

"মোদ্দা কথাটা দাঁড়ালো, যে পাহাড়ে চড়তে গেলে ভেড়ার পা ফসকে যায়, সেই পাহাড়ে এখন চড়তে হবে আমাদের।" সুজল যোগ করে।

ঘাস ধরে ধরে ধীরে ধীরে ওপরে উঠছি আমরা। মাঝে মাঝে জিরিয়ে নিতে হচ্ছে। তবু যতটা কষ্ট হবে ভেবেছিলাম, ততটা কষ্ট হচ্ছে না। কিন্তু কষ্টের সবটুকুই যে এখনও অজানা। কারণ হিমালয়ের অনুচরবৃন্দ এখনও আমাদের আগমন সংবাদ জানতে পারে নি।

পারল একটু বাদেই। আর সংবাদ পাওয়া মাত্রই একযোগে আক্রমণ করে বসল। দলে দলে মেঘ ছুটে এসে ঢেকে ফেলল আমাদের। মেঘের মাঝে হারিয়ে গেলাম আমরা। কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি! রামচাঁদের সতর্কবাণী কানে আসে, "হুঁশিয়ার, যে যার পাশে আছেন, তাঁর হাত ধরুন। তারপরে পা ঘষে ঘষে পথ চলুন।"

জনৈক সহযাত্রীর হাত ধরে বলে উঠি, "কার হাত?"

"আমার,।" দাশুর সাড়া পাই।

"তোমার সামনে কে?" জিজ্ঞেস করি।

দাশু প্রশ্ন করে, "আমার সামনে কে?"

"আমি।" মোহিত সাড়া দেয়।

বিচিত্র অবস্থা। এত কাছাকাছি রয়েছি সবাই অথচ কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছি না, কেবল কথা শুনছি। পা ঘষে ঘষে পথ চলছি। রামচাঁদেরও একই অবস্থা। কিন্তু তার অতি পরিচিত পথ, তাই সে চিৎকার করে নির্দেশ দিচ্ছে, "সোজা ওপরে উঠে আসুন। খুব সাবধান, পা ফসকে পড়ে

যাবেন না যেন।"

কিছুক্ষণ চলার পরে রামচাঁদ আবার বলে, "এবারে বাঁয়ে যেতে হবে আমাদের।"

আমরা এক জায়গায় নেই। বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে চলছি। এ ক্ষেত্রে বাঁয়ে বাক নেওয়া···। তবু রামচাঁদের নির্দেশ অমান্য করি না। মেঘের আবরণ ভেদ করে বাঁদিকে অগ্রসর হলাম।

কিন্তু আমি যেন নিচের দিকে নেমে যাচ্ছি! তাহলে কি পথ ভুল হয়েছে? থমকে দাঁড়াই। দাশুকে কথাটা বলি। সে চিৎকার করে বলে রামচাঁদকে।

রামচাঁদ নির্দেশ দেয়, "না না, নিচে নয়, ওপরে। যেখান দিয়ে হোক, যেভাবে হোক, ওপরে উঠে আসুন। সাবধানে পা ফেলবেন।"

সহসা মেঘের আবরণ অপসৃত হল। হিমালয়ের অনুচরবৃন্দকে অতিক্রম করে আমরা আন্নালোরিয়ার ওপরে উঠে এলাম। বহুক্ষণ বাদে আবার আমাদের দেখতে পাচ্ছি আমরা। আনন্দে আলিঙ্গনাবদ্ধ হলাম।

সামনের দূর্বা-ছাওয়া পাহাড়টিকে দেখিয়ে রামচাঁদ বলে, "এবারে ঐ পাহাড়টিতে চড়তে হবে।"

"এর নাম কি?" দেবকীদা জিজ্ঞেস করেন।

"এখন ঘোড়া-ধবল, আগে ছিল ঘোড়া-ধাঁপিয়ো।"

ধবল শব্দের অর্থ বুঝতে পারছি। যদিও পাহাড়টি ধবল নয়, শ্যামল। কিন্তু ধাঁপিয়ো?

রামচাঁদ বলে, "ধাঁপিয়ো মানে ছোটানো। নন্দা ভাগবতী মাঈ এই পাহাড়ে একবার ঘোড়া ছুটিয়েছিলেন বলে এর নাম ঘোড়া-ধাঁপিয়ো।"

যাক এতক্ষণে একটি সুসংবাদ পরিবেশন করল রামচাঁদ। আগের পাহাড়টিতে ভেড়ার পা ফসকে যায়। আর এটিতে তবু যা হোক ঘোড়া ছুটতে পারে।

পরক্ষণেই খেয়াল হয়, সে ঘোড়াটি যে দেবী নন্দার ঘোড়া। পক্ষীরাজ হওয়াই স্বাভাবিক। না হলেও সে যে মর্ত্যের প্রাণী নয়, তাতে কোন সন্দেহ নেই। স্বর্গের ঘোড়া যেখানে ছুটতে পারে, মর্ত্যের মানুষ সেখানে হাঁটতে পারবে কি? পারতেই হবে। মানুষের অসাধ্য বলে যে কিছু নেই এ জগতে।

নন্দাদেবীর ঘোড়া শূন্যে ছুটতে পারে, আমাদের অবস্থাও প্রায় শূন্যে পদচারণারই শামিল হয়ে উঠেছে। আগের পাহাড়টিতে তবু যা হোক দূর্বা ছিল। পা ফসকালে চার হাত-পায়ে যেমন করে হোক সামলে নিয়েছি। অনেক সময় দূর্বা ধরে ওপরে উঠেছি। এখানে দূর্বা এত অল্প যে ধরা যাচ্ছে না। অথচ অত্যন্ত পিচ্ছিল। কেবলই পা ফস্‌কে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে গড়িয়ে পড়ছি, আছাড় খাচ্ছি। তবু পথ চলতে হচ্ছে।

কিন্তু নন্দাদেবী এতো পাহাড় থাকতে এখানে ঘোড়া ছুটিয়েছিলেন কেন? চারিদিকে তাকাই। না, জায়গাটা সত্যই বড় সুন্দর। সীমাহীন সৌন্দর্যই তাঁকে এখানে আকর্ষণ করেছিল।

কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের। এই সীমাহীন সৌন্দর্য দর্শনের অবসর নেই এখন। অবকাশও নেই। মুহূর্তের অসাবধান তায় অক্ষয় স্বর্গলাভ হয়ে যেতে পারে। স্বর্গে যেতে পারলে নন্দাদেবীর দর্শন পাব, কিন্তু রূপকুণ্ড যে দেখা হবে না আমার। রূপকুণ্ড না দেখে স্বর্গ দেখতে চাই না। এখন কেবল দেবী নন্দার অসীম করুণাকে পাথেয় করে এই গিরি-কান্তার পেরিয়ে পৌছতে চাই রূপময় রূপকুণ্ডে। তাই কোনদিকে না তাকিয়ে সাবধানে ওপরে উঠছি। ওপরে আরও ওপরে—ঐ ঘোড়া-ধবলের শিখরে।

কিন্তু শিখরে আরোহণ করা কি অতই সহজ! আর ঘোড়া-ধবলে কি মেঘ নেই বলে কিছুই নেই। বলা নেই কওয়া নেই, হঠাৎ অজস্রধারায় সাবুদানার মত বরফ পড়তে শুরু করে দিল। কাঁধে ঝোলানো টুপিটা মাথায় পড়ে নিতে হল। ধীরে ধীরে পতনোন্মুখ ধারার রূপ পালটাচ্ছে। একটু বাদে জল পড়তে আরম্ভ করল, বেশ বড় বড় ফোঁটা। তাড়াতাড়ি একে অন্যের রুকস্যাক থেকে বর্ষাতি বের করে দিলাম।

বর্ষার জন্য বর্ষাতির যত না প্রয়োজন ছিল, তার থেকে ঢের বেশি প্রয়োজন শীতের জন্য। আমাদের বর্ষাতির ভেতরে গরম কাপড়ের লাইনিং দেওয়া আছে। কাজেই এ বর্ষাতি বর্ষা ও শীতে সমান সাহায্য করে।

বর্ষাতি পরলে বর্ষা ও শীত বাঁচে কিন্তু সময় বাঁচে না। বর্ষাতি পরে চড়াই পথে তাড়াতাড়ি চলা যায় না। তাই আমরা আস্তে আস্তে পথ চলেছি। তবে চলতে চলতে একসময় দেখি সত্যি আমরা ঘোড়া-ধবলের শিখরে এসে গেছি।

রামচাঁদ বলে, "সেদিন রণকধার থেকে যে গিরিশ্রেণী আরম্ভ হয়েছিল, এখানে

তা শেষ হয়ে গেল। এর পরে আমাদের আর একটি গিরিশ্রেণী পেরোতে হবে।"

আশা করেছিলাম এখানে এলে এই বিরক্তিকর বর্ষণের হাত থেকে পরিত্রাণ পাব। কিন্তু সে আশা অপূর্ণ রইল। এখনও বেশ বৃষ্টি হচ্ছে।

ঘোড়া-ধবলের শিখরটি প্রায় সমতল। তবে এখানে কোন গাছপালা নেই। এমন কি ঘাস পর্যন্ত নেই। সেই বৃক্ষলতাহীন সমতল প্রান্তরটুকু পেরিয়ে আমরা পরের পাহাড়টির পাদদেশে পৌছলাম।

রামচাঁদ বলে, "এ পাহাড়টা আগের পাহাড়গুলির চেয়ে বড়। এর নাম তেচুলিয়া। তিনটি গিরিশিরা আছে এ পাহাড়ে। তারা শিখর থেকে তিন-দিকে বিস্তৃত হয়েছে—বৈদিনী, পাথরনাচুনি ও শুকৃরি। আমরা এই বৈদিনী গিরিশিরা দিয়ে ওপরে উঠে পাথরনাচুনির গিরিশিরাটি ধরব।"

"তার মানে তেচুলিয়া শিখরটি হচ্ছে রূপকুণ্ড পথের জংশন। আর আমাদের শিখরে উঠতে হবে।" দেবকীদা বলেন।

"শিখরটি তিনটি গিরিশিরার মিলন-বিন্দু হলেও পাথরনাচুনি গিরিশিরাটি ধরার জন্য আমাদের শিখর পর্যন্ত ওঠার দরকার হবে না। আমরা আড়াআড়ি ভাবে পাহাড়টিকে পেরিয়ে যাব।" একবার থামে রামচাঁদ। তারপরে আবার বলে, "আর কোন গাইডের সঙ্গে এলে অবশ্য আপনাদের শিখরে উঠতে হত। কারণ আমি ছাড়া আর কেউ এ পথ চেনে না।···কিরে বীর, চিনিস নাকি এ পথ?"

"জী না।" বীর সবিনয়ে নিবেদন করে।

"তাহলে···" রামচাঁদ হাসে।

আমরাও হাসি। আর হেসে অসিতবাবু বলেন, "তাই তো তোমাকে নিয়ে এসেছি আমরা।"

রামচাঁদ বিগলিত হয়। বলে, "সে আমার জানা আছে। আর ব্যাপারটা কি জানেন?"

"কী?" মোহিত প্রশ্ন করে।

"এ পথটা কেউ দেখলেও মনে রাখতে পারে না। কিরে বীর, পারবি মনে রাখতে?"

"জী না।" একই উত্তর দেয় বীর। ভদ্রলোকের এক কথা।

কিন্তু রামচাঁদ কিছু বলতে পারার আগেই সুজল বলে ওঠে, "আরে ওর

সঙ্গে তোমার···কোন তুলনা হয় নাকি।"

এর পরে আর কি বলবে রামচাঁদ। সে নিঃশব্দে হাঁটতে থাকে। তবে ওর পদশব্দটা যেন একটু বেশি হচ্ছে। পায়া-ভারি কথাটা দেখছি মিথ্যে নয়।

ওয়ান থেকে রূপকুণ্ডের তিনটি পথ। একটি ভূণা হয়ে, একটি শুকৃরি হয়ে, আর একটি আমাদের এই পথ, বৈদিনী হয়ে। ভূণার পথটি গিয়ে পড়েছে কৈলু বিনায়কে আর শুকৃরি ও বৈদিনীর পথ দুটি এসে মিলেছে পাথরনাচুনিতে। তিনটি পথেরই প্রকৃতি একরকম। দূরত্বও প্রায় সমান।

আড়াআড়িভাবে পাহাড়টিকে অতিক্রম করছি বলে আমাদের তেমন চড়াই উৎরাই করতে হচ্ছে না। তেচুলিয়া বৃক্ষলতাহীন নয়। ঝোপঝাড ও ঘাস রয়েছে। ঘাসগুলি খুব বড নয়, তবে বেশ ঘন। কাজেই আমাদের দু-হাতে ঘাস সরিয়ে পথ চলতে হচ্ছে।

সামনে একটা জায়গার ঘাসগুলো খুব নড়ছে। কি ব্যাপার? থমকে দাঁড়াই। রামচাঁদও চলা বন্ধ করেছে।

তার মুখের দিকে তাকাই। সে গম্ভীর। সে তাকিয়ে আছে ওদিকে। ঘাসগুলি নড়ছে। নিশ্চয়ই কোন বন্যজন্তু। বাঘ ভালুক কিংবা তুষার-চিতা?

আইস এক্স নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াই। আমরা প্রস্তুত। যে কোন সময়ে আক্রান্ত হতে পারি। রামচাঁদ কিন্তু লাঠিটা মাটিতে রেখে একখানা পাথর হাতে তুলে নেয়। তারপরে সহসা সেই পাথরখানিকে ছুঁড়ে মারে দোদুল্যমান ঘাসবনে আর চিৎকার করতে থাকে। কুলিরা গলা মেলায় তার সঙ্গে। আমরাও ওদের সঙ্গে যোগ দিই। রামচাঁদ আর একখানি পাথর তুলে নেয়, আবার ছুঁড়ে মারে। তারপরে আবার। শব্দহীন তেচুলিয়া শব্দময় হয়ে ওঠে।

একটু বাদে একটি হরিণ ত্রস্ত পদক্ষেপে বেরিয়ে আসে অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার জায়গায়, আর তাই তাকে আমরা দেখতে পাই। কিন্তু সে এক পলকের জন্য। আমাদের দেখতে পেয়েই সে ছুটে পালায় পাশের ঘাসবনে। অদৃশ্য হয়ে যায় দৃষ্টির বাইরে।

রামচাঁদ হৈ হৈ করে তাকে ধরবার জন্য কিছুক্ষণ বৃথা চেষ্টা করে। তারপরে পরিশ্রান্ত হয়ে ফিরে আসে আমাদের কাছে। দুঃখের সঙ্গে বলে, "ইস্, একটু আগে যদি টের পেতাম।"

"কি করতে তাহলে ?"

"চারদিক থেকে ঘিরে ফেলতাম।"

"ধরতে পারতে ?"

"না পারলে মেরে ফেলতাম।"

"কাজটা কি ভাল হত ?"

"তাছাড়া কি করব, এটা যে সাধারণ হরিণ নয়, কস্তুরীমৃগ।"

ভয়ার্ত হরিণটির মুখখানি আবার আমার মানসপটে ভেসে ওঠে। বদ্রীনাথের পথে পাওয়া সেই কস্তুরীমৃগটির কথাও মনে পড়ে। তাই চুপ করে থাকতে পারি না। বলি, "এই সব প্রাণীরা হিমালয়ের সম্পদ। আমাদের দেশের ঐশ্বর্য! এই ভাবে অকারণে তোমরা কেন এদের হত্যা কর? এরা যে ক্রমেই কমে যাচ্ছে…"

কিন্তু এসব কথা তাকে বলা বৃথা। হিতোপদেশ ভাল লাগে না তার। তাই রামচাঁদ শেষ করতে দেয় না আমাকে। বলে ওঠে, "জোরে বৃষ্টি আসছে, চলুন এবারে তাড়াতাড়ি পা চালানো যাক।"

অগত্যা রামচাঁদের সঙ্গে নীরবে চলা শুরু করি। কিছুক্ষণ বাদেই আড়া-আড়িভাবে পাহাড়টিকে অতিক্রম করে পাথরনাচুনির দিকে প্রসারিত গিরি-শিরাটির ওপরে এসে পৌঁছই আমরা।

গিরিশিরাটি ফুট তিনেক চওড়া। পথের একটা দিক খাড়া নেমে গেছে নিচে, কম করেও হাজার দুয়েক ফুট। তাকাতে ভয় করে। আর একদিকে পাহাড়ের গা বেয়ে এই সংকীর্ণ চড়াই পথ। সেও কম ভয়াবহ নয়।

আবহাওয়া সম্পর্কে রামচাঁদের ভবিষ্যৎবাণী সত্য হয় নি। বৃষ্টি বাড়ে নি, বরং একেবারে কমে গেছে। তাই চারিদিককে এখন বড়ই সুন্দর দেখাচ্ছে। দূরদিগন্তে আকাশছোঁওয়া বৃষ্টি-ভেজা নানা রঙের পাহাড়গুলি যেন পটে আঁকা ছবি।

কিছুদিন বাদেই ওরা বরফে ঢেকে যাবে। তখন নানা রঙের বৈচিত্র্য যাবে মুছে, সবাই সাদা হবে। কিন্তু সেই শুচিশুভ্র রূপ দর্শন করতে কেউ আসবে না এখানে।

পথ যে আর ফুরোয় না—চড়াই পথ। সেই কখন চলা শুরু করেছি, এখনও শেষ হয় নি। কখন হবে কে জানে? অমিতাভ আর সুজনের কথা তো ভাবতে পারছি না। ওরা আজ সকালে হাঁটা শুরু করেছে, বিকেল গড়িয়ে

এল। এখনও হাঁটছে। তবে ওদের দেখে কিন্তু মনে হচ্ছে না যে ওদের কোন কষ্ট হচ্ছে। বেশ বহাল তবিয়তে আছে। আমাদের সঙ্গে সমানতালে চড়াই ভাঙছে।

কোথা থেকে একটা দমকা হাওয়া এসে আমার টুপিটাকে উড়িয়ে নিয়ে চলল। ধরবার কোন রকম ফুরসতই পেলাম না। টুপিটা প্রথমে পাশের পাহাড়ের গায়ে গিয়ে আছাড় খেল। তারপরে ঘুরপাক খেতে খেতে নিচে গড়াতে থাকল। যত নামছে, তত বেগ বাড়ছে। অবশেষে শ'তিনেক ফুট নিচে গড়িয়ে একটা পাথরে আটকে গেল।

হিমালয়ের পথে মাথা থেকে টুপি উড়ে যাওয়া, এই আমার প্রথম নয়। মনে পড়ছে এক যুগ আগের সেই প্রথম হিমালয়-যাত্রার কথা। করুণাময় কেদারনাথ দর্শনে চলেছিলাম। এমনিভাবে একদিন বিকেলে টুপিটা উড়ে গিয়েছিল। তার পরদিনই আমাদের কেদারনাথ পৌঁছবার কথা। ভাবলাম কেদারনাথে গিয়ে টুপি কিনে নেব। কিন্তু হায়, পরদিনই পথে শুরু হল তুষারপাত। মাথাটাকে নিয়ে সেদিন কি মুশকিলেই না পড়েছিলাম! ভেবে-ছিলাম ঘোড়ার জন্য রাজার রাজ্য গিয়েছিল, আর টুপির জন্য তীর্থযাত্রীর জীবন যাবে। সে ভাবনা সত্য হয় নি। করুণাময় কেদারনাথের অসীম করুণায় সেবারে পৈতৃক প্রাণটা রক্ষা পেয়েছিল। তবে হিমালয়ের পথে টুপির প্রয়োজনীয়তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলাম।

তাই রামচাঁদকে বলি, "কাউকে পাঠিয়ে টুপিটা তুলে আনার ব্যবস্থা কর। যে আনতে পারবে, তাকে এক টাকা দেব।"

রামচাঁদ একজন কুলিকে কথাটা বলতেই সে পাথরের সঙ্গে ঠেস দিয়ে পিঠ থেকে মালটা নামায়। তারপরে সেই খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে প্রায় ছুটতে ছুটতে নামতে থাকে নিচে। দেখে ভয় হচ্ছে পড়ে না যায়। টুপির জন্য আমার প্রাণ যেত কিনা জানি না, কিন্তু এক টাকার জন্য বুঝি ঐ লোকটার জীবন যায়।

একাধিক আছাড় খেলেও শেষ পর্যন্ত লোকটির প্রাণ রয়ে গেল। সে আমার টুপি নিয়ে উঠে এল ওপরে। কিন্তু হাত বাড়িয়ে টুপিটা আমাকে দিয়েই পথে বসে পড়ল। খানিকক্ষণ চোখ বুজে রইল। বেচারী খুবই পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছে।

কিছুক্ষণ বিশ্রামের পরে সে একটু হেসে উঠে দাঁড়ায়। টাকাটা নিয়ে

নিজের মালের কাছে এগিয়ে যায়। আমরাও এগিয়ে চলি পাথরনাচুনির পথে।

॥ আঠারো ॥

বিকেল ছটার সময় থামল রামচাঁদ। কাজেই থামতে হল আমাদের। পাহাড়ী পথের নিয়ম তাই। আগের মানুষ থামলে, পেছনের মানুষকে থামতে হয়।

রামচাঁদ বলে, "এখানেই তাঁবু ফেলব আজ।"

সংবাদটা শুভ। আমরা সবাই অত্যন্ত পরিশ্রান্ত। তার ওপর আবার জোরে বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু জায়গাটির অবস্থান দেখে রামচাঁদের সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট হতে পারলাম না। সংকীর্ণ গিরিশিরা। একপাশে খাদের ওপারে পাহাড়, একটি নয়, দুটি নয়—অগণিত। একটির পর একটি। ঢেউয়ের পর ঢেউ। সবুজ কালো ধূসর আর সাদার ঢেউ। নানা আকারের পাহাড় মিলে এক-একটি ঢেউ। কিন্তু ঢেউগুলির ঢং প্রায় একই রকম। অন্তত অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ্য না করলে তাই মনে হয়। অথচ জানি, হিমালয়ে এক রকমের দুটি পাহাড় খুঁজে পাওয়া ভার।

আর একপাশেও খাদ। গভীর খাদ। খাদের নিচে বন—বাগচো বন। বনের ধার দিয়ে বয়ে যাচ্ছে একটি নদী—নদীর তীরে তারতোর গ্রাম। তারতোর থেকে শুকুরি হয়ে ওয়ান যাবার পথ। তারতোর গ্রামে মেষ-পালকদের কয়েকটি কুটির আছে। কুটির কটি এখানকার পান্থনিবাস।

ওপরে পাহাড়, নিচে জঙ্গল। তারই মাঝে এই অপ্রশস্ত গিরিশিরা—পাথর-নাচুনি। পাথরনাচুনিতে তাঁবু পড়ল। গিরিশিরাটি সংকীর্ণ বলে একই সারিতে তাঁবু ফেলতে হল আমাদের।

ছোট বড় রঙীন তাঁবুগুলি দেখতে মন্দ লাগছে না। অমিতাভ ও সুজলকে একটি তাঁবু দেওয়া হয়েছে। ওরা আমাদের চেয়ে বেশি পরিশ্রান্ত। ওরা আজ ওয়ান থেকে পাথরনাচুনি এসেছে। একদিনে পাঁচ হাজার ফুট দুর্গম চড়াই ভেঙেছে। ওয়ানের উচ্চতা ৮,০০০ ফুট আর পাথরনাচুনি ১৩,০০০ ফুট উঁচু। কাজেই ওদের একটু বিশ্রাম করা উচিত। কিন্তু উচিত কর্ম কজন করে এ সংসারে। যাদের জন্য তাঁবু নির্দিষ্ট হল, তারা কফি খেয়ে আমাদেরই সঙ্গে

সমানে আড্ডা দিতে শুরু করে দিয়েছে।

একে তো জায়গাটা তেরো হাজার ফুট উঁচু। তার ওপর বৃষ্টির সঙ্গে দমকা হাওয়া বইছে। বেশ শীত শীত করছে। আমরা সমস্ত গরম পোশাক পরেও ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছি। মনে হচ্ছে কিছুক্ষণের মধ্যেই রক্ত জমে যাবে। একটু আগুন পোহাতে পারলে হত। কয়েকজন কুলি নিচে গেছে, কাঠ ও জল আনতে। তারা কখন আসবে কে জানে। বীর জনতায় খিচুড়ি চড়িয়েছে। জনতা স্টোভে গরম খিচুড়ি রান্না হতে পারে, কিন্তু শরীর গরম হয় না।

এখানে সর্বদাই বোধ হয় মেঘ আর কুয়াশার মেলা। মেঘমালা মাঝে মাঝে ঢেকে ফেলছে আমাদের। আমরা মেঘাবৃত হয়ে কাঠের প্রতীক্ষা করছি। কুলিদের প্রত্যাবর্তনের প্রত্যাশায় পল গুণছি। ভাবছি—ঐ আসে, ঐ আসে।

কিছুক্ষণ বাদে ওরা এলো। আর ওরা কাঠ নিয়ে এলো। আগুন জ্বালানো হল। হুতাশনের উষ্ণ স্পর্শে আমাদের সকল অবসাদের অবসান হল। ধন্য তুমি হে অগ্নি! হে ধর্মপুত্র, হে বৈশ্বানর, তোমাকে প্রণাম করি।

একটু বাদে রামচাঁদ এসে বলে, "কুলিরা এখানে থাকতে চাচ্ছে না।"

"কেন?" বিস্মিত হই।

"এখানে শীত বেশি।"

"কোথায় কম!" অসিতবাবু বলেন।

"বাগচোতে। সেখানে ঘর আছে। সেই ঘরে রাত কাটাতে চায় ওরা।"

ঘর পেলে কেই বা তাঁবুতে থাকে। তাছাড়া বাগচো এখান থেকে হাজার খানেক ফুট নিচে। ওখানে শীত কম। ওদের তেমন জামা-কাপড় নেই। কিন্তু ওরা যদি কাল সময়মত না আসে?

"আসবে না মানে, আমি ঘাড় ধরে নিয়ে আসব না?"

"তুমি আবার যাবে কাল সকালে?"

"কাল সকালে কেন, আমি তো আজই যাচ্ছি ওদের সঙ্গে।"

এইবারে বোঝা গেল ব্যাপারটা। কুলিরা যাচ্ছে না, রামচাঁদই ওদের নিয়ে যাচ্ছে নিচে। নিচে ঘর আছে, জল আছে। আর নিচে আমরা থাকব না। কাজেই নিশ্চিন্তে কালকের অভিনয়ের মহড়া দিতে পারবে।

আমরা চুপ করে আছি। রামচাঁদ আবার বলে, "তা ছাড়া কাল সকালে তো এমনি বাগচো যেতে হত।"

"কেন?" দেবকীদা জিজ্ঞেস করেন।

"কাঠ আনতে। এর পরে আর কোথাও কাঠ পাওয়া যাবে না। তাই আমরা আজ রাতেই বাগচো চলে যাচ্ছি। কাল সকাল আটটার মধ্যে একেবারে কাঠ নিয়ে চলে আসব এখানে, আপনারা তৈরি থাকবেন।"

অগত্যা অসিতবাবু অনুমতি দেন। কিন্তু রামচাঁদ তবু চলে যায় না। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

মোহিত জিজ্ঞেস করে, "আর কিছু বলবে নাকি?"

"জী সাব।"

"বেশ বল।" অসিতবাবু বলেন।

"সাব এর নাম আলম সিং, আমাদের কুলি। খুব কাজের লোক।" রামচাঁদ তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটিকে দেখিয়ে দেয়। "একে একটু শরাব দিতে হবে। এর রোটি না হলে চলে, কিন্তু সন্ধ্যার সময় শরাব না হলে চলে না।"

"শরাব?" হেসে দেয় দাশু, "শরাব পাব কোথায়? আমাদের সঙ্গে তো শরাব নেই।"

"সে কি, আপনারা পাহাড়ে এসেছেন আর শরাব আনেন নি সঙ্গে?" রামচাঁদ বিস্মিত।

"এনেছি।" দেবকীদা বলে ওঠেন।

আমরা সবাই তাঁর দিকে তাকাই। রামচাঁদ অনুনয় করে, "দিন না তা হলে একটু।"

"কিন্তু তাতে কি আলমের কাজ চলবে?"

"খুব চলবে।" রামচাঁদ দেবকীদার প্রশ্নের উত্তর দেয়।

"বেশ, অসিত একটু ব্র্যাণ্ডি দিয়ে দেও ওকে।"

"ব্র্যাণ্ডি?" যেন মর্মাহত হয় রামচাঁদ।

"হ্যাঁ, এক শিশি ব্র্যাণ্ডি ওষুধ হিসেবে সঙ্গে নিয়ে এসেছি আমরা।" দেবকীদা বলেন, "তাই থেকেই একটু দিচ্ছি ওকে।"

"না না, ব্র্যাণ্ডিতে কি হবে আলমের? ওর দেশী শরাবের অভ্যেস।" একটু থেমে রামচাঁদ আবার বলে, "মুশকিলে পড়া গেল দেখছি। অথচ শরাব না পেলে আলম কাল সকালেই ওয়ান চলে যাবে।"

সত্যই সমূহ বিপদ। এই উচ্চতায় একজন কুলি কমে গেলে চলবে কেমন করে। ভাবনায় পড়া গেল দেখছি।

সহসা অমিতাভ কথা বলে, "ওহে আলম, এদিকে এসো তো।"

আলম নতমস্তকে নিঃশব্দে এগিয়ে আসে। চোখ দুটি কোটরাগত। মুখে খোঁচাখোঁচা দাড়ি। পরনে সরু পায়জামা ও গলাবন্ধ কোট। মাথায় পাহাড়ী টুপি। সে সেলাম করে সবাইকে। ভাব দেখে মনে হচ্ছে যেন ভক্তি উছলে পড়ছে।

তার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে অমিতাভ গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করে, "কতদিনের নেশা ?"

"বিশ বছরের।" লজ্জা-জড়িত-স্বরে জবাব দেয় আলম।

"তাহলে তো শরাব না হলে তোমার খুবই মুশকিল।"

"জী সাব।" আলম আশান্বিত হয়।

"কিন্তু আমাদের সঙ্গে তো শরাব নেই ভাই।" অমিতাভ থামে। আমরা আলমকে লক্ষ্য করি। তার মুখের মৃদু হাসি উবে গেছে। অমিতাভ আবার বলতে থাকে, "তবে তোমার তো নেশা হলেই চলবে।"

"সাব···" আলম ঠিক বুঝতে পারে না ব্যাপারটা।

"শরাব না খেয়ে অন্য কিছু খেয়ে যদি তোমার নেশা হয়, তাহলেই তো তোমার চলবে ?"

"তা হ্যাঁ, তা হলে চলে যাবে। সে রকম কিছু আছে নাকি আপনার কাছে ?" আবার আশার আলো জলে ওঠে আলমের মুখে।

"এ কথা আর কাউকে বলতে পারবে না ?"

"না সাব। কাউকে বলব না।" আলম অঙ্গীকার করে।

"আমার কাছে একটা নেশার ওষুধ আছে।"

"আমাকে একটু দিন না সাব, আমি বেঁচে যাই। আমি কাউকে বলব না। আমাকে বাঁচান সাব।" আলম মিনতি করে।

অমিতাভ তার তাঁবু থেকে হোমিওপ্যাথির বাক্সটা নিয়ে আসে। আলম উৎসাহিত। আমরা উদ্‌গ্রীব।

খোঁজাখুঁজির পরে একটা শিশি বের করে অমিতাভ। সাধারণ হোমিওপ্যাথি ওষুধের মতই দেখতে। অমিতাভ কয়েকটি বড়ি কাগজে ঢালে। আলমকে বলে, "হাঁ কর।"

আলম নির্দেশ পালন করে। অমিতাভ বড়ি কটি তার গলায় ঢেলে দিয়ে বলে, "এবারে একটু জল খেয়ে এখানে একটু বসো, দেখবে পাঁচমিনিটে কি রকম নেশা হয়।"

রামচাঁদ এতক্ষণ চুপ করে ছিল। এবারে বলে, "আমি তা হলে নিচে চলে যাই। কুলিরা অনেকেই চলে গেছে।"

"না না, তুমি গেলে চলবে কেমন করে? আলমকে নিয়ে যাবে কে? তার যে নেশা হয়ে এলো বলে।" অমিতাভ রামচাঁদকে বাধা দেয়।

কিছুক্ষণ বাদে আলম জল খেয়ে ফিরে আসে। আমরা তার দিকে তাকাই। অমিতাভ জিজ্ঞেস করে, "কি কেমন?"

"আচ···ছা·· আ।" আলম উত্তর দেয়।

"কাম হুয়া?"

"হো···র···হা।

আলম যেন খুশিতে উপচে পড়ে। মানুষ মাতাল হতে কত ভালবাসে।

সত্যই মাতাল হয় আলম। সে টলতে শুরু করে। সে অমিতাভকে সেলাম করে। অর্ধজড়িত স্বরে বলে, "অপনে হমকো ব·· চা দীয়া সাব।······বহৎ কড়্···ড়া চীজ দী···য়া···"

"এবার তাহলে তুমি রামচাঁদের সঙ্গে নিচে চলে যাও।" অমিতাভ রামচাঁদকে ইশারা করে। রামচাঁদ তাকে ধরে ধরে নিয়ে চলে। আর টলতে টলতে চলতে থাকে আলম। চলতে চলতে বার বার সেলাম করে আমাদের। আর বলে, "হমকো···বচা দীয়া। বহৎ কড়্···ড়া চীজ···"

বিস্ময়ের ঘোরটা কেটে যাবার পরে অমিতাভকে জিজ্ঞেস করি, "কি ওষুধ দিলে?"

"Koch Lymph-30, সংক্ষেপে কক্ থারটি।"

"খেলে কি নেশা হয় নাকি?"

"সবার সব সময় হয় না। তবে কখনও কারো কারো হয়।"

"তার মানে?"

"মানে তোমাদের হবে না। এখন আলমের হয়েছে। কিন্তু কাল সকালে হবে না।" অমিতাভ হাসতে হাসতে জবাব দেয়।

"আলমের এখন নেশা হল কেন?"

"সে নেশা করতে চাইছিল বলে।" অমিতাভ হাসছে।

"হেঁয়ালি রেখে পরিষ্কার করে বল তো।"

"অভাববোধ যেমনি পীড়াদায়ক, প্রাপ্তি তেমনি আনন্দদায়ক। নেশা করার নেশায় ভুগছিল আলম। নেশার ওষুধ পেয়ে তার অভাব ঘুচেছে, সে আনন্দের

নেশায় মশগুল হয়েছে।"

"তা হলে ব্যাপারটা কি দাঁড়াল ?"

"মানসিক।" উত্তর দেয় অমিতাভ। "মনের আশা পূর্ণ হবার নেশায় মাতাল হয়ে টলতে টলতে চলে গেল আলম।"

"ব্রেভো ব্রাদার!" বলে আবেগে অমিতাভকে জড়িয়ে ধরেন অসিতবাবু।

॥ উনিশ ॥

জাগরণ ও সুপ্তির সংমিশ্রণে রাতটা কাবার হল কোনমতে। গতকাল ক্লান্ত ও অবসন্ন শরীরে এসেছিলাম পাথরনাচুনি। বরফ ও বৃষ্টি মাথায় করে চড়াই ভেঙে সবাই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। রাতে যদি একটু ভাল খাবার ও গরম বিছানা পেতাম, তাহলে হয়ত ঘুমোতে পারতাম। কিন্তু নানা কারণে কাল কোনটাই পাই নি আমরা। তার ওপরে মাঝে মাঝেই তুষারপাত হয়েছে আর তুষারাবৃত হিমালয়ের হিমেল হাওয়া তাঁবুর ভেতরে ঢোকার চেষ্টা চালিয়ে গেছে।

এখন শুক্লপক্ষ চলেছে। আমরা তুষারতীর্থ ত্রিশূল ও নন্দকান্ত নন্দাঘুন্টির কত কাছে। কত আশা ছিল, এখান থেকে চাঁদের আলোয় ওদের দেখব। দেখে ধন্য হব। সে আশা সফল হয় নি। শীত ও তুষারকে উপেক্ষা করে কতবার বাইরে এসেছি। কিন্তু হায়, কোথায় কৌমুদী! আকাশ শশাঙ্ক-শূন্য, নিশাকরহীন নিশা।

অমিতাভর ওষুধ খেয়ে টলতে টলতে চলে গিয়েছিল আলম। কিছুক্ষণ বাদে বীর এক গ্লাস পরিজ আর কয়েকখানি বিস্কুট নিয়ে এসেছিল। সেই বিস্বাদ পানীয় গলাধঃকরণ করে শুয়ে পড়েছিলাম। জাগরণ ও সুপ্তির সংমিশ্রণে রাতটা কোনমতে কাবার হয়েছে।

তাঁবুর মধ্যে স্লিপিং ব্যাগের ভেতরে শুয়ে থাকতেই শীত লাগছে। বাইরে বেরুলে শীতে কষ্ট পাব। তবু আর শুয়ে থাকতে পারি না। বাইরে বেরিয়ে আসি।

কাল রাতে বেশ বরফ পড়েছে চারিদিকে। কুয়াশা আর মেঘের আনাগোনা চলেছে। আকাশের অবস্থা ভাল নয়। যে কোন সময় তুষারপাত

শুরু হতে পারে। আবহাওয়াই ভাবিয়ে তুলেছে আমাদের। অথচ কয়েকদিন আগেও নাকি আবহাওয়া খুব ভাল ছিল। তখনও আমরা কুমায়ুনেরই পথে পথে টহল মারছি—তার গহন-গিরি-কন্দরে ঘুরে বেড়াচ্ছি। তখন অনায়াসে এই গিরি-কান্তার পরিক্রমা করে নিতে পারতাম। ভুল হয়ে গেছে। আর সেই ভুলের না জানি কি খেসারত দিতে হবে।

মনে পড়ছে অনিমাদির কথা। কয়েক বছর আগে তিনি এসেছিলেন এ পথে। বাগুয়াবাসার পৌঁছবার পরে প্রচণ্ড প্রাকৃতিক দুর্যোগ আরম্ভ হয়। তিনদিন তিনরাত তাঁরা বন্দী থাকেন সেখানে। সেবারে রূপকুণ্ড দর্শন না করেই অনিমাদিকে ফিরে আসতে হয়। কিন্তু এ পরাজয় মেনে নেন নি তিনি। পরের বছর অনিমাদি আবার এসেছেন এখানে। দর্শন করেছেন রহস্যময় রূপকুণ্ড। তিনিই বোধ করি সেই রহস্যের প্রথম মহিলা সাক্ষী। তার আগে কোন মহিলা পৌঁছতে পারেন নি রূপকুণ্ডে।

তার পরের বছরও অনিমাদি এসেছিলেন কুমায়ুনে। আর সেই তাঁর শেষ হিমালয় যাত্রা। কিন্তু সে অগস্ত্যযাত্রার কথা এখন নয়। এখন নিজেদের কথায় ফিরে আসা যাক।

অনিমাদির প্রথম রূপকুণ্ড অভিযানের মত আমাদের এ অভিযানও যদি বিফল হয়? আমরা যদি রূপকুণ্ড পর্যন্ত পৌঁছতে না পারি? দুঃখ করব না। পরাজয়ে বিচলিত হব না। অনিমাদির মতই আমরা আবার আসব। যেমন করেই হোক আমাদের যে যেতে হবে সেই অপরূপ রহস্যালোকে। সে যাত্রা যদি আমার অগস্ত্যযাত্রা হয়, তাহলেও দুঃখ করব না। বরং শেষ নিঃশ্বাস নেবার আগে প্রাণভরে হিমালয়কে দেখব আর ভাবব—আমার এই ক্ষুদ্র জীবন ধন্য হল।

হিমালয় চিরকাল এমনি করে কাছে ডেকেছে মানুষকে। কেউ সে ডাকে সাড়া দিয়েছেন, কেউ দেন নি। যাঁরা সাড়া দিয়ে কাছে এসেছেন, হিমালয় তাঁদের দিয়েছে বাধা। সে বাধাকে অতিক্রম করে সবাই পৌঁছতে পারেন নি তাঁদের লক্ষ্যে। যাঁরা পারেন নি তাঁদের যাত্রাও বিফল হয় নি, ব্যর্থ হয় নি তাঁদের তপস্যা। তাঁদের সাধনা পরবর্তী কালের পর্বতারোহীদের সাফল্যের শিখরে পৌঁছে দিয়েছে। তাই তাঁদের কথাও লেখা থাকবে পর্বতারোহণের ইতিহাসে। লেখা থাকবে অনিমা সেন ও গৌরাঙ্গ চৌধুরীর কথা, যেমন লেখা আছে মৃত্যুঞ্জয়ী ম্যালোরী আর আরভিণের অবিস্মরণীয় ইতিহাস—

শ্রীরাধানাথ শিকদার ১৮৫২ সালে এভারেস্ট আবিষ্কার করেন। কিন্তু প্রথম এভারেস্ট অভিযান পরিচালিত হয় ১৯২১ সালে কর্নেল হাওয়ার্ড বিউরীর নেতৃত্বে। ডক্টর এ. এম. কেলাস্ ও জর্জ এল. ম্যালোরী এই অভিযানের সদস্য ছিলেন। অভিযানকালে ১৭,২০০ ফুট উঁচুতে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ডক্টর কেলাস্ মারা যান। তিনিই এভারেস্ট অভিযানের প্রথম শহীদ।

১৯২২ সালে জেনারেল চার্লস জি. ব্রুসের নেতৃত্বে দ্বিতীয় এভারেস্ট অভিযান পরিচালিত হয়। ম্যালোরী এই অভিযানের সদস্য ছিলেন।

তৃতীয় অভিযান পরিচালিত হয় ১৯২৪ সালে জেনারেল ই. এফ. নর্টনের নেতৃত্বে। এই অভিযানের সদস্য ছিলেন ম্যালোরী, ডাঃ টি. হাওয়ার্ড সমারভেল, জে. জিওফ্রে ব্রুস এবং নবাগত এন. ই. ওডেল্ ও এ্যানড্রু আর্ভিন। প্রাণপণ করে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ অভিযাত্রীরা বিশ্বের উচ্চতম স্থানে পৌঁছতে চাইলেন। প্রচণ্ড প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যেও তারা দুর্বার বেগে এগিয়ে চললেন। তাপাঙ্ক তখন মাইনাস কুড়ি ডিগ্রি ফ্যারেনহাইট। তাহলেও নর্টন ও সমারভেল ২৬,৮০০ ফুট উঁচুতে শিবির স্থাপন করলেন। তাঁরা সেই-খানেই থামলেন না। শিখরের দিকে এগিয়ে চললেন। কিন্তু সামারভেলের তুষারক্ষত ও গলাব্যথার জন্য ২৮,০০০ ফুট পর্যন্ত আরোহণ করেও তাঁরা নেমে আসতে বাধ্য হন। শুকনো হিমেল হাওয়ায় ঘন ঘন নিশ্বাস নেবার ফলেই সমারভেল অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর অসুস্থতার জন্যই শিখর অভিযান স্থগিত রইল।

কয়েকদিন বাদে অভিজ্ঞ ম্যালোরী ও তরুণ আর্ভিন (২২) অক্সিজেন সঙ্গে নিয়ে শিখর অভিযান আরম্ভ করেন। তারপর…ফ্রাঙ্ক স্মাইথের ভাষায়—On the day they left the highest camp to make their attempt on the summit, he (N. E, Odell) saw them "going strong" along the broken crest of the north-east ridge. It was only a fragmentary glimpse between swirling mists and it was the last ever seen of them for they failed to return. In Mallory, Everest lost its most formidable opponent and mountaineering one of its most brilliant figures. Of him Norton wrote, "It was the spirit of the man that made him the great mountaineer he was : a fire burnt in him and caused his willing spirit to rise

superior to the weakness of the flesh" He was indeed "a knight 'sans peur et sans reproche' amongst mountaineers."

নয় বছর বাদে ১৯৩৩ সালে পরবর্তী এভারেস্ট অভিযান সংগঠিত হয় হিউ রাটলেজের নেতৃত্বে। অভিযাত্রীদের মধ্যে ছিলেন ফ্র্যাঙ্ক স্মাইথ, এরিক শিপটন, জে. এল. লংল্যাণ্ড, এল. আর ওয়েজার ও পি. উইনহ্যারিস।

এই অভিযান প্রসঙ্গে স্মাইথ বলেছেন—

Camp Six was pitched at 27,400 feet, and from it two attempts were launched on the summit.···During the course of their attempt Wyn Harris and Wager discovered an ice-axe which can only have belonged to either Mallory or Irvine. It is thought that one of them slipped. The other put down his axe the better to hold the rope in both hands and check the fall of his sliding companion. He failed to do so and the ice-axe was left there, sole testimony of the disaster.

"কি হে ঘুম ভাঙল ?" দেবকীদা আমার ভাবনা ভেঙে দেন।

তিনি পায়চারি করছিলেন বাইরে। তেরো হাজার ফুট উঁচুতে এসেও কলকাতার অভ্যেসটি বজায় রাখছেন। আমাকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে আসেন কাছে। হাসতে হাসতে আবার জিজ্ঞেস করেন, "ঘুম ভাঙল ?"

"ভাঙবে কি, শীতে সারারাত ঘুমোতে পারি নি।"

"আমারও একই অবস্থা। কেউ বোধ হয় ভাল ঘুমোতে পারে নি। তোমরা তবু শুয়ে ছিলে। আমি কিন্তু ফর্সা হতেই বেরিয়ে এসেছি বাইরে। আর এসেই একটা মস্ত লাভ হয়েছে আমার।"

"কী ?"

"সূর্যোদয় দেখেছি। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। সূর্যোদয় বলা অবশ্য ভুল। সূর্য এখনও মেঘে ঢাকা, তখনও তাই ছিল। আমি দেখছি আলোর উদয়। আলো এসে কেমন করে কালোকে গ্রাস করে ফেলে। দূরের ঐ অগণিত পর্বতশ্রেণী ছিল আঁধারে ঘেরা। একটির পর একটি আলোর ঢেউ এসে সেই অসীম কালো আঁধারকে কোথায় যেন ভাসিয়ে নিয়ে গেল।"

"কতক্ষণ আগে ?"

"তা প্রায় ঘণ্টাখানেক হল।" ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেবকীদা বলেন, "ঠিক পৌনে সাতটায় সূর্যোদয় হয়েছে।" বলেই কথাটা খেয়াল হয় দেবকীদার। উচ্চকণ্ঠে বলে ওঠেন, "আরে তাই তো, এ যে দেখছি আটটা বাজে। বাবুদের তো বেড-টি না হলে ঘুম ভাঙ্গবে না। এসো, চায়ের জল বসিয়ে দেওয়া যাক। জল বোধ হয় জমে গেছে।"

চা-পর্ব শেষ হতে নটা বাজল। বীর রান্না চাপিয়ে দিল। কুলিরা এখনও আসে নি এখানে। তাই বীরকে গিয়েই নিচের ঝরণা থেকে জল নিয়ে আসতে হয়েছে। কিন্তু ওরা দেরি করছে কেন? রামচাঁদ বলে গিয়েছিল, আটটার মধ্যে এসে যাবে।

খবর নিতে হলে নিজেদেরই যেতে হয়। হিমেল হাওয়াকে উপেক্ষা করে আমরা তাঁবু ছাড়িয়ে কিছুদূর নেমে আসি। সামনেই তারতোর গাঁয়ে যাবার পথ। খাড়া নেমে গেছে নিচে। এত খাড়া যে পথের প্রথমাংশ দেখা যায় না। তবে অনেক নিচে পথের শেষাংশ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। আমরা একটা বড় পাথরের আড়ালে আশ্রয় নিই। হাওয়াটা কম লাগছে এখানে। কাছেই কয়েকখানি ছোট পাথর পড়ে আছে। পাথরের ওপরই বসলাম আমরা।

জায়গাটির অবস্থান বড়ই সুন্দর। সামনেই নন্দাঘুন্টির শ্বেতশুভ্র শিখর। তারতোর গাঁয়ের পায়েচলা পথটি যেন তারই গা থেকে উঠে এসেছে। নিচে বাগচোর গহন বন। নন্দাঘুন্টির পেছনে সুনীল আকাশ। মনে হচ্ছে সুবিরাট এক রঙ্গমঞ্চের সামনে বসে আছি। পেছনে টানানো রয়েছে অসীম হিমালয়ের জীবন্ত ছবি। এই সংকীর্ণ গিরিশিরা আর ঐ পায়েচলা উৎরাই পথটিকে নিয়ে রঙ্গমঞ্চ। এখন মঞ্চ অভিনেতাশূন্য। আমরা দর্শক পাথরের আসনে বসে অভিনেতাদের প্রতীক্ষারত। পরিচালক অসিতবাবু হুইসিল দিয়ে চলেছেন।

বাঁশি বিফল হয় নি কোনকালে। সেকালে শ্যামের বাঁশির সুরে রাই ছুটে এসেছে। একালে অসিতবাবুর বাঁশির টানে রাম ছুটে আসছে।

রামচাঁদ একা নয়। রামচাঁদের পেছনে কয়েকজন কুলি। তারা চড়াই পথ বেয়ে ওপরে উঠেছে। রামচাঁদ আসছে আগে আগে, কুলিরা তার পেছনে। কিন্তু রামচাঁদের সঙ্গে ওদের দূরত্ব ক্রমেই যাচ্ছে বেড়ে। ওরা অমন টলতে টলতে পথ চলছে কেন? ওরা কি নেশা করেছে নাকি? কিন্তু অমিতাভ তো নেশার ওষুধ খাইয়েছে কেবল আলমকে। তার সঙ্গে রাত্রিবাস করেই কি

ওদের নেশা হয়ে গেল ? না, ওদের সঙ্গে দিশী জিনিস ছিল ? হিমালয়ের মানুষ ওরা। মদ না হলে যে মন ভরে না ওদের।

রামচাঁদ উঠে এলো ওপরে। সুপ্রভাত জানালো আমাদের।

জিজ্ঞেস করি, "এত দেরি করলে কেন ?"

"কি হবে আগে এসে। আজ যে আমাদের এখানেই থাকতে হচ্ছে।"

"এখানেই থাকতে হচ্ছে ?" আঁতকে উঠি।

"হাঁ, কুলিদের অবস্থা কাহিল। তারা কেউ বোঝা নিয়ে ওপরে যেতে পারবে না।"

"কেন কি হয়েছে ?"

"কারও মাথাব্যথা, কারও দাঁতব্যথা, কারও পেট, কারও পিট, কারও কোমর, কারও বা পা-ব্যথা।"

"ব্যথাহীন কেউ নেই ?" সুজল গম্ভীর স্বরে বলে ওঠে।

রামচাঁদ কিন্তু বুঝতে পারে তার রসিকতা। সে হেসে জবাব দেয়, "ওদেরই জিজ্ঞেস করুন, ঐ যে ওরা আসছে।"

ব্যথিতরা একে একে উঠে আসছে ওপরে।

অভিনেতারা রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হচ্ছে।

প্রথম অভিনেতা টলতে টলতে অসিতবাবুর সামনে আসে। তিনি জিজ্ঞেস করেন, "কেয়া হুয়া ?"

"শির দরদ।"

ইতিমধ্যে দ্বিতীয় ব্যক্তি এসে গেছে সামনে। আমাদের নেতা একই প্রশ্ন করেন তাকে। সে উত্তর দেয়, "দাঁত দরদ।"

তারপরের জন, "কোমর দরদ।"

তারপরে, "পিঠ দরদ।"

"পেট দরদ।"

"পায়ের দরদ।"

দরদীর দল সারি বেঁধে অসিতবাবুর দু পাশে দাঁড়ায়। বিরক্ত নেতা বলেন, "বাকি দরদী আদমী কিধর হ্যায় ?"

"লেট গিয়া। উঠনেকা কাবিল নহী রহা।" রামচাঁদ জবাব দেয়।

এতক্ষণ বাদে সুজল আবার মুখ খোলে, "কোই বে-দরদী নহী হ্যায় ?"

"জরুর হ্যায়, হম্ হ্যায়।"

তাকিয়ে দেখি বীরপুঙ্গব আর কেউ নয়, শ্রীমান আলম সিং। সে অমিতাভর দিকে তাকিয়ে একবার একটু হাসে। তারপরে এক-পা দু-পা করে তার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়।

অসিতবাবু কিন্তু আশ্চর্য ধৈর্য দেখালেন আজ। শান্ত স্বরে রামচাঁদকে প্রশ্ন করেন, "তাহলে এরা আজ কি করবে ঠিক করেছ? এখানেই থাকবে, না কিছু কিছু করে কাঠ রেখে আসবে ওপরে?"

"তা..." একবার থামে রামচাঁদ। কি যেন একটু ভাবে। তারপরে বলে, "তা আসতে পারে। তাই তো, কথাটা যে মনে পড়ে নি এতক্ষণ।"

"এবার যখন পড়ল, ব্যবস্থা করে ফেল। যতটা করে সম্ভব শুকনো কাঠ রেখে এসো হুনিয়াথরে।"

"হুনিয়াথর?" রামচাঁদ বিস্মিত হয়।

"হ্যাঁ। আমরা আর বাগুয়াবাসায় থামব না। কাল হুনিয়াথরে রাত কাটাবো।" নেতা বলেন।

"আচ্ছা দেখছি কি করা যায়।" রামচাঁদ কুলিদের ইশারা করে বাগচোর উৎরাই পথে নেমে যায়। যেতে যেতে বলে, "আপনারা আর বাইরে থাকবেন না। সর্দি লেগে যাবে।"

আমরা ফিরে আসি তাঁবুতে। কিছুক্ষণ বাদে কুলিরা কাঠ নিয়ে উঠে আসে ওপরে। আমাদের সেলাম জানিয়ে রওনা হয় হুনিয়াথরের পথে। এখন কিন্তু ওদের দেহের কোন এলাকায় কোন দরদের লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি না।

খাওয়া সেরে আমরা এসে জড়ো হলাম উপেনবাবুর তাঁবুতে। এ তাবুটি অপেক্ষাকৃত বড়। কিছুক্ষণ কথাবার্তার পরে হঠাৎ দাশু বলে উপেনবাবুকে, "আপনি কিন্তু ওয়ানে কি কি গাছপালা দেখলেন, কিছুই বললেন না আর।"

"আবার সেই নীরস আলোচনার বৈঠক বসাবে?"

"দোষ কি?" দেবকীদা বলেন।

"দোষ আছে বৈকি, আপনাদের সময় নষ্ট হবে।"

"হোক্ গে, আপনি আরম্ভ করুন।" মোহিত বলে।

নিরুপায় উপেনবাবু আরম্ভ করেন:

"কয়েকটা Fir ছাড়া ওয়ানের চতুর্দিকে সুউচ্চ Coniferগুলো সবই Cupressus (cypress). ওরা ওয়ানের পরিবেশকে অপূর্ব করে তুলেছে। ওয়ান থেকে বৈদিনীর পথে প্রথম দিকে Pyracautta, Princepia ও Berberis-এর

কাঁটাঝোপ দুধারে দেখতে দেখতে আমরা রণকধারের গিরিশিরা অতিক্রম করেছি। এগিয়ে এসেছি সেই রুক্ষ ঢালের গা বেয়ে। অর্ধবৃত্তাকার সে ঢালের মুখ ছিল দক্ষিণ ও পূর্বদিকে। কাজেই রিক্ততার ছাপ প্রকট হয়ে রয়েছে তার সর্বাঙ্গে। অত্যন্ত কষ্টসহিষ্ণু বলে ক্ষুদে Berberis Kumaoneusis কাঁটাসর্বস্ব হয়ে ঢেকে রেখেছিল অনেকটা জায়গাকে। কিন্তু তাদের গাঢ় রক্তবর্ণের ছোট ছোট গোলাকার ফল আমাদের চোখে পড়েছে। রণকধারের মাথার উপরে বেখাপ্পা অবস্থায় ছড়িয়েছিল Quercus Semecarpifolia। সেখান থেকে নামার সময় যে বিরাট অর্ধচক্রাকার ঘন বনপথ ধরেছিলাম, তার আবার অধিকাংশ গাছই Q. Semecarpifolias. তাদের সঙ্গে আমাদের পরিচিত Rhododendron Arboreum তো ছিলই, আর মাঝে মাঝে দেখতে পাওয়া গেছে Taxus Baccata. যাদের কথা সেদিন তোমাদের বলেছি। সেদিন পথে Hydrangea, Cornus ইত্যাদি মোটামুটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণেই ছিল। আর ছিল Schisandra. আবার অনেকটা নামার পর ছোট সেতুটি অতিক্রম করার সময় নদীর ধারে লালফুলওয়ালা Polygonum Amplexicanle আর Epilopium-য়ের প্রাচুর্য দেখেছিলাম। এর পরে চড়াই পথের শেষ ধাপের আগেই বুগিয়ালের খানিকটা স্বরূপ দেখতে পেয়েছি। আপাতদৃষ্টিতে বুগিয়ালকে তৃণসর্বস্ব মনে হলেও সেখানে রঙীন ফুলের লুকোচুরি চোখে পড়েছে। এর বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে পরে বলব। আগে বৈদিনীতে ওঠার আগে একক Rhododendron Arboreum-এর যে সমাবেশ দেখেছিলাম তার কথা বলে নিই। হিমালয়ের যে সব জায়গা এ পর্যন্ত দেখেছি এরকম সাথী (Quercus) বিহীন একক Rhododendron-এর রাজত্ব আর কোথাও দেখতে পাই নি। জুন মাসে এদের আগুন ধরানো রূপ না দেখা পর্যন্ত আমি পৃথিবী ছাড়তে পারব বলে মনে হয় না। জুন মাসে আবার আমাকে আসতে হবে এ অঞ্চলে। আসতে হবে ফুল দেখতে।

"এই গিরিশিরার শেষপ্রান্তে বাঁদিকে বৈদিনী ও ডানদিকে আলি—এই দুটি বিস্তীর্ণ বুগিয়াল। নীলগিরি অভিযানের সময় বীরেন আমাকে এই বৈদিনীর Orchid সম্বন্ধে এমন একটা রঙীন চিত্র দিয়েছিল যে, ফুলের সমারোহ সম্বন্ধে একটা স্বপ্নরাজ্য মনে মনে সৃষ্টি করেছিলাম। কিন্তু বৈদিনীকে আমার ধ্যানগম্ভীর নগ্ন সন্ন্যাসীর প্রতিমূর্তি ছাড়া আর কিছুই মনে হয় নি। সে সৌন্দর্যে জৌলুস নেই এবং বরফবিহীন এই নিস্তব্ধতা ও নির্মম রূপ উপলব্ধি

ছাড়া বর্ণনা করা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য ব্যাপার। জল হচ্ছে প্রাণের উৎস, সে বোধ হয় বলা নিষ্প্রয়োজন। ঠিক একইভাবে পাহাড়ের গায়ে প্রাকৃতিক উদ্যানই বল, গহন অরণ্যই বল, সবটুকুই জলের প্রাপ্যতার ওপর নির্ভরশীল। সেজন্যই নন্দনবন, নন্দনকানন, ক্ষীর উপত্যকায় ফুলের সমারোহে এত সমৃদ্ধ। পাহাড়ের গঠনপ্রকৃতির ওপর ও জলের সান্নিধ্যের অভাবেই যে বিশেষ Alpine Pasture Land, তাকেই বলা হয়ে থাকে বুগিয়াল। এর বৈশিষ্ট্য ও গঠনপ্রকৃতি ইউরোপীয় আলপসের তৃণক্ষেত্রের সমতুল্য।

"বৈদিনীকে দেখে হঠাৎ কলকাতার গলফগ্রাউণ্ডের কথা মনে এসে যায়। যাক সে কথা, এখন বুগিয়ালের স্বরূপ সম্বন্ধে বলি। সৃষ্টির আদি থেকে সীমিত জলে প্রয়োজন মেটাতে পারে, এই ধরনের বিভিন্ন প্রকারের Alpine Herbs-এর ভেতর টিকে থাকবার প্রতিযোগিতায়, কয়েকটি বিশেষ জাতীয় ঘাস প্রতিষ্ঠা লাভ করে সৃষ্টি করেছে এই বুগিয়াল। বৃক্ষসীমার (১২-১৩,০০০´) ঊর্ধ্বে বলে এবং অত্যন্ত জলাভাবের জন্যে বড়গাছ এখানে আসতে পারে নি। Danthonia আর Stipa এই দুটি ঘাসকেই বুগিয়ালে প্রাধান্য লাভ করতে দেখা যায়। মাইলের পর মাইল পাহাড়ের গায়ে স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে গুচ্ছাকারে (Clump) দেখতে পাওয়া গেছে Danthonia-য়ের রাজত্ব। বছরে প্রায় ছ'মাস তুষারাবৃত থেকেও এদের দীর্ঘস্থায়ী (perennial) মূল (rootstock) অনায়াসে বেঁচে থাকতে পারে। জুনের মাঝামাঝি থেকে প্রায় নভেম্বার পর্যন্ত তুষারগলা জল ও বৃষ্টি যতটুকু পায় তাতেই তাদের নতুন প্রাণের সঞ্চার হয়ে যায়। কয়েকটি কস্তুরীমৃগ এই অনন্ত তৃণভূমির আর কতটুকুই বা সদ্ব্যবহার করতে পারে। নিম্নাঞ্চলের অধিবাসীরা নিয়ে আসে তাদের মেষপাল— পরিতৃপ্তিতে চলে এদের বিচরণ আর সেই সঙ্গে সংগ্রহ হতে থাকে আমাদের শীতবস্ত্রের উপকরণ।

"দূর থেকে শুধুমাত্র ঘাসের রাজত্ব মনে হলেও, কাছে এলে বুগিয়ালে ঘাসের সঙ্গে দেখতে পাওয়া যায় হলদে Saxifraga, আর নীল Gentiana আর বিভিন্ন প্রজাতি। সাদা Anaphalis, হলদে Tanacetum, কিছু হলদে Cerydalis ও বেগুনি Potentilla. ঘাসের আশ্রয়ে বেঁচে থাকে এরা। মাঝে মাঝে দেখা গেছে ধূপ Jurinea macrocephala গাছ। এরা কোথা থেকে এসে এদের কাছে আশ্রয় ভিক্ষা করছে। আর নীল Swertia Cuneata তো অনেক জায়গাতেই ছড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু বৈদিনীর রুক্ষ উঁচুনিচু নিরাভরণ

রূপটি যে প্রকৃত বুগিয়ালের চেহারা নয়, সে আমরা ভাল করে উপলব্ধি করতে পেরেছি, এই পাথরনাচুনির পথে। তবে সে কথা আজ নয়, আর একদিন হবে।”

॥ কুড়ি ॥

পরিশ্রম করতে হিমালয়ে আসা, বিশ্রাম নিতে নয়। পরিশ্রান্ত যাত্রীও তাই বিশ্রামের প্রত্যাশী নয়। তবু যদি অযাচিত ভাবে বিশ্রামের সুযোগ পায়। সে খুশি হয় বৈকি।

মালবাহকদের অন্যায় আবদার রক্ষা করতে গিয়ে কাল আমাদের বিশ্রাম নিতে হয়েছে পাথরনাচুনিতে। কিন্তু বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করতে পারি নি। কাল আবহাওয়া অত্যন্ত খারাপ ছিল। বাতাস আর বরফ সারাদিন সমানে হামলা চালিয়েছে। তাঁবুর ভেতরে বন্দী রয়েছি আমরা।

নিরুপায় নেতা বাধ্য হয়ে মালবাহকদের অন্যায় আবদার মেনে নিয়েছিলেন। আমরা কর্মহীন হয়ে বার বার আলোচনা করেছি—রামচাঁদের দরদী শিষ্যরা কিট্ বইতে পারে নি, কিন্তু কাঠ বইতে কোন কষ্ট হয় নি ওদের। ওয়ানে ওরা চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করেছে, কাজেই মজুরী বাড়াতে পারে না। কিন্তু দিন বাড়াতে নেই কোন বাধা। অথচ দিন বাড়ালে, মজুরী বাড়ে।

সব বুঝেও ওদের জুলুম মেনে নিয়েছি কারণ আমরা নিরুপায়।

কাল রাতেও ভাল ঘুমোতে পারি নি। তেমনি জাগরণ ও সুপ্তির সংমিশ্রণে নিশি যাপন করেছি। সকালে তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে খুশি হলাম। বৃষ্টি বা বরফ পড়ছে না। তবে কুয়াশায় ছেয়ে আছে চারিদিক। তাঁবুর ওপরে আর আশেপাশে বরফ মুক্তোর মত ঝলমল করছে।

প্রকৃতি কিন্তু পরাজিত করতে পারে নি বীর সিংকে। সে ইতিমধ্যে উনোন জ্বালিয়েছে। জল নিয়ে এসেছে। কফি হয়ে এল বলে। কাল রাতেও বীর তাঁবুতে তাঁবুতে গরম কফি ও খাবার দিয়ে এসেছে। নইলে আরও বেশি কষ্ট হত আমাদের। এখানে গরম পানীয় জীবনের শ্রেষ্ঠ সহায় আর আমাদের শ্রেষ্ঠ সহায় বীর। বীর কফির কেট্‌লী নিয়ে এল।

কাল কুলিরা কাঠ রেখে সন্ধ্যের আগেই ফিরে এসেছে। তবে ওদের

সবাই পৌছতে পারে নি ছুনিয়াথর। তারা বাগুয়াবাসায় কাঠ রেখে এসেছে। বাগুয়াবাসা থেকে ছুনিয়াথর এক মাইল। আমরা আজ বাগুয়াবাসায় না থেমে এগিয়ে যাব। ছুনিয়াথরে তাঁবু ফেলে রাত কাটাবো। শুনেছি জায়গাটি চমৎকার। তা ছাড়া আজ এই এক মাইল এগিয়ে থাকার জন্য কাল অনেক সুবিধে হবে। কাল আমরা চূড়ান্ত সংগ্রামে অবতীর্ণ হব। মরণ-হ্রদের তীরে পৌছব—পারব কী?

ন'টা নাগাদ বেরিয়ে পড়লাম পথে। পথ মানে তেচুলিয়ার তৃতীয় গিরিশিরা—সংকীর্ণ ও কঠিন চড়াই এই গিরিশিরা বেয়ে সোজা সামনের পাহাড়টার ওপরে উঠে যেতে হবে। পাহাড়টা পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের।

গিরিশিরার দু'দিকেই গভীর খাদ। খুব সাবধানে চড়াই ভাঙছি।

মিনিট পনেরো বাদেই পৌছলাম সেখানে। সেই রূপকথার রাজ্যে, যে রূপকথা শুনেছি বীরেনের কাছে—

সে এক স্বেচ্ছাচারী শৌখিন রাজার কাহিনী। রাজার শখ হল তীর্থদর্শন করবেন। সৈন্যসামন্ত ও তিনজন সুন্দরী নর্তকী নিয়ে রাজা এলেন এখানে। পড়ল তাঁবু। শুরু হল নাচ গান আর মদ্যপান। নারীর মোহে ও মদের নেশায় রাজা তীর্থের কথা বিস্মৃত হলেন।

সহসা এক সন্ধ্যায় নন্দাদেবী রুষ্টা হলেন। প্রচণ্ড প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘনিয়ে এলো। গভীর রাতে স্বপ্ন দেখলেন রাজা, লাটুদেবী তাঁকে বলছেন—তীর্থের পথে নারীর স্থান নেই। নর্তকীদের হত্যা করে এগিয়ে যা তীর্থপথে। নইলে—ধ্বংস অনিবার্য।

পরদিন প্রত্যুষে রাজা সৈন্যদের বললেন সেই স্বপ্নের কথা। আদেশ করলেন, ওদের জীবন্ত কবর দিতে।

নিজের ভোগবাসনা চরিতার্থ করবার জন্য রাজা যাদের সঙ্গে নিয়ে এসে-ছিলেন, সেই নিরপরাধী অসহায়াদের পাথর চাপা দেওয়া হল এখানে। রাজরোষে নাচুনিরা পাথর হয়ে গেছে বলে এই বধ্যভূমির নাম পাথরনাচুনি।

পাশাপাশি তিনটি গর্ত। একই রকম দেখতে—ফুট তিনেক দীর্ঘ ও ফুট পনেরো গভীর। নির্জন নিশীথে কান পাতলে আজও নাকি এখানে সেই হতভাগিনীদের কান্না শুনতে পাওয়া যায়। যৌবনের বিনিময়ে যারা জীবন চেয়ে পেয়েছে বঞ্চনা, তাদের অতৃপ্ত আত্মা বোধ করি কবরের কোণে কোণে

অনন্ত কাল ধরে কাতর কণ্ঠে সুবিচার প্রার্থনা করছে। কিন্তু কার কাছে তারা এই অবিচারের কথা বলছে? মানুষের কাছে কি?

পাথরনাচুনি পড়ে রয়েছে পেছনে, আমরা এগিয়ে এসেছি সামনে। সেই গিরিশিরা বেয়ে ওপরে উঠছি—উত্তরে এগোচ্ছি। চড়াই পথ। চড়াই সর্বত্র সমান নয়—কোথায় কম, কোথাও বেশি। কিন্তু আবহাওয়া অপরিবর্তিত। তেমনি মেঘে ঢাকা আকাশ আর কুয়াশা ছাওয়া পথ। তবে তুষারপাত শুরু হয় নি।

এখন আর পথের পাশে খাদ নেই। পাথুরে পাহাড়ের গা বেয়ে পথ। এই পাহাড়টির নাম চিরার। গাছপালা দূরের কথা লতাপাতা পর্যন্ত নেই। উপেনবাবু বেকার। তিনি কেবল মাঝে মাঝে ওপরে তাকাচ্ছেন—তোলিধার গিরিশ্রেণীকে দেখছেন। মাঝখানে একটু টোল খেয়েছে। ঐটি সেই গিরিবর্ত্ম—কৈলু বিনায়ক। ১৪,১১৭ ফুট উঁচু। আপাতত ওখানে উঠতে হবে আমাদের।

মাঝে মাঝে মেঘের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে পথ। পাথরে পা ফসকে যাচ্ছে। খুব সাবধানে ধীরে ধীরে পথ চলতে হচ্ছে।

এইভাবে পথ চলে, প্রায় দু ঘণ্টা পরে পৌঁছলাম কৈলু বিনায়ক। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। প্রাণান্তকর চড়াই শেষ হয়েছে।

দুদিকের পাহাড় থেকে দুটি গিরিশিরা নেমে এসে মিলিত হয়েছে এখানে। সৃষ্ট হয়েছে গিরিবর্ত্ম—গিরি-কান্তারের শেষ তোরণ।

কৈলু বিনায়ক গণেশতীর্থ। সিদ্ধিদাতার আর এক নাম বিনায়ক। কৈলু শব্দটি সম্ভবতঃ কৈলাস থেকে এসেছে। তার মানে এটি শিবপুত্র বিনায়কের কৈলাস।

গিরিবর্ত্মের ওপরেই গণেশ প্রতিষ্ঠিত—অপূর্ব সুন্দর পাষাণ প্রতিমূর্তি। প্রচলিত নিয়মমত আমরা প্রত্যেকে মূর্তিকে কোলে তুলে নিলাম। কাজটি মোটেই সহজ নয়। মাঝারি আকারের মূর্তি—বেশ ভারী। এতদূর চড়াই ভেঙ্গে এসে, এত উঁচুতে নিরেট পাথরের প্রতিমূর্তিকে কোলে নেওয়া কষ্টকর বৈকি। কিন্তু কষ্ট করতেই তো এখানে আসা। কষ্ট না করলে তীর্থের ফল লাভ হয় না। যে দুর্বল যাত্রী বিনায়ককে কোলে তুলতে সক্ষম হয় না, সে অক্ষমকে এখান থেকে যেতে হয় ফিরে। দুর্বলের জন্য রূপকুণ্ড-হোমকুণ্ডের পথ নয়।

শেষ পর্যন্ত শক্তি পরীক্ষা শুরু হয়ে গেল অসিতবাবু মোহিত ও সুজলের

মধ্যে। বিনায়ককে কোলে নিয়ে নাচানাচি। বলা বাহুল্য সে নৃত্য প্রতিযোগিতায় প্রথম হলেন অসিতবাবু। তাঁর সঙ্গে ওরা পারবে কেন? তিনি যে কুস্তিগীর।'

কাল কুলিরা হুনিয়াথর থেকে ব্রহ্মকমল নিয়ে এসেছিল। সেই পারিজাত দিয়ে আমরা গণপতির পুজো দিলাম। পার্বতী-তনয় গণনায়কের কৃপা না হলে মানুষের মঙ্গল সাধিত হয় না।

পুজো-শেষে সশ্রদ্ধচিত্তে প্রণাম করি বিনায়ককে। গণপতির পায়ের কাছে একটি করে টাকা দক্ষিণা রেখে দিই। তারপরে গুঁড়ো বরফ ও লজেন্সের প্রসাদ নিয়ে উঠে দাঁড়াই।

এবারে ফিরে তাকাই গিরিবর্ত্মের বিপরীত দিকে। এ যেন এক আলাদা জগৎ। পাহাড়ের প্রাচীর দিয়ে ঘেরা দুর্গম গিরিশ্রেণীর অন্তরালে গিরি-কান্তার। এজন্যই বোধ করি দীর্ঘকাল লুকিয়েছিল রূপকুণ্ড। এখানে না এলে ধারণাই হয় না এর পরেও এত আছে। দূর থেকে মনে হয় এখানেই শেষ। এখানে এলে জানা যায়—শেষ নয়, শুরু। মনে হয়, এর বুঝি আর শেষ নেই।

পাহাড়টা আস্তে আস্তে নেমে গেছে নিচে। ওপরে সাদা আর কালো, নিচে সবুজ। ওপরে বরফ আর পাথর, নিচে সবুজ প্রান্তর। পাহাড় গিয়ে প্রান্তরে শেষ হয়েছে। চারিপাশের পাহাড়ের বরফ-বিগলিত ধারায় সিক্ত হচ্ছে প্রান্তর, তাই সে এমন সবুজ। গিরি-কান্তারের অন্তরে এমন একটি রমণীয় প্রান্তর সত্যই বিস্ময়কর—ধারণাতীত। রূপকুণ্ড আবিষ্কারের আগে তাই সবার ধারণা ছিল—পাথরনাচুনির পরেই ত্রিশুল। মাঝখানে কিছু নেই।

কিন্তু এ ভুল ধারণাটি হালআমলের। যে আমলে আত্মকলহে লিপ্ত হয়ে বিদেশী আক্রমণকারীকে আমরা আবাহন করে এনেছি। যে আমলে আমরা জননী-জন্মভূমিকে বহিরাগত বণিকদের হাতে তুলে দিয়েছি। যে আমল থেকে আমরা শ্রমবিমুখ ও পরশ্রীকাতর হয়েছি, সৎসাহসকে বিসর্জন দিয়েছি। তার আগের আমলে হিমালয় আমাদের অপরিচিত ছিল না। মহাভারত বা কেদারখণ্ডের কথা ছেড়েই দিলাম। কিন্তু মহাকবি কালিদাস যে হিমালয়ের পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছেন তাতে তো আর কারও কোন সন্দেহ নেই। অথচ কোথায় উজ্জয়িনী আর কোথায় পাণ্ডুকেশ্বর। এগারো বছরের বালক শঙ্করাচার্য যে দাক্ষিণাত্য থেকে জোশীমঠ এসেছিলেন, সে কথাও ইতিহাস শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করে। তেমনি ইতিহাস স্বীকার করে সুদূর অতীত থেকে চলে আসছে

নন্দাযাত। দেবী নন্দার মূর্তি নিয়ে শোভাযাত্রা। দুঃসহ শীত সহ্য করে, ঝড় বৃষ্টি আর তুষারপাতকে উপেক্ষা করে, দুর্গম ও দুস্তরকে অতিক্রম করে তাঁরা যাত্রা করতেন হোমকুণ্ডে—নন্দাদেবীর পদপ্রান্তে প্রাণের প্রণতি জানাতে, জীবনের নৈবেদ্য নিবেদন করতে।

এমনি এক যাত্রীদলই পৌছতে পারেন নি হোমকুণ্ডে। পথে রূপকুণ্ডের তীরে এসেই তাঁরা প্রাণ উৎসর্গ করেছেন নন্দাদেবীকে। আজ তাঁদের মৃতদেহ চাপা পড়ে আছে তুষারের তলে। বছরের একটা বিশেষ সময়ে কেবল এই তুষার গলে। তখন সেই পুণ্যকামী মানুষদের দেহাবশেষ দর্শন করা যায়—তুষারতীর্থ রূপকুণ্ডের তীরে দাঁড়িয়ে ভারতের ধর্মকে উপলব্ধি করা যায়।

দীর্ঘকাল এরা লুকিয়েছিল লোকচক্ষুর অন্তরালে। মানুষ ভুলে গিয়েছিল সেই পুণ্যার্থীদের কথা। কবে কি ভাবে কে প্রথম রূপকুণ্ডকে আবিষ্কার করে, তা জানা নেই আমার। তবে উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে এদের সম্বন্ধে একটা জনশ্রুতি ছড়িয়ে পড়ে গাড়োয়াল ও কুমায়ুনের ঘরে ঘরে। ১৯০৫ সালে ডাঃ লংস্টাফ নাকি আকস্মিকভাবে উপস্থিত হয়েছিলেন রূপকুণ্ডে। কিন্তু তিনি তাঁর কোন বইয়ে রূপকুণ্ডের কথা লিখে যান নি।

রূপকুণ্ডের কথা প্রথম বিশদভাবে বলেন জনৈক ফরেস্টার। তিনি ১৯২৫ সালে নন্দাযাতের সঙ্গে রূপকুণ্ডের তীরে পৌছেছিলেন। সেই কথা শুনে ১৯৪২ সালে কৌতূহলী মাধোয়াল সিং এলেন রূপকুণ্ডে। তিনিও একজন ফরেস্টার ছিলেন।

ফিরে গিয়ে মাধোয়াল সিং রূপকুণ্ডের বিবরণ দিলেন কুমায়ুনের ডেপুটি কমিশনার মিঃ ভার্নিডকে। তিনি স্কটল্যাণ্ড থেকে নিয়ে এলেন মিঃ হ্যামিল্টনকে —বিখ্যাত রক-ক্লাইম্বার। হ্যামিল্টন সাজ-সরঞ্জাম, শেরপা ও কুলি নিয়ে রূপকুণ্ড অভিযানে এলেন। কিছু নিদর্শন সহ ফিরে গিয়ে রূপকুণ্ডের কথা প্রচার করলেন দেশে-বিদেশে। জগৎ জানতে পারল এই মরণ-হ্রদের কথা।

তারপরে ১৯৫৫ সাল। সরকারী সাহায্যে মাধোয়াল সিং আবার এলেন রূপকুণ্ডে। এবারে তিনি কিছু নিদর্শন নিয়ে ফিরলেন। নিদর্শনগুলি তিনি দিলেন লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডক্টর ডি. এন. মজুমদারকে। শুরু হল গবেষণা। ১৯৫৫ সালের ৭ই অক্টোবর রিপোর্ট বের হয়। ১৯৫৬ সালের মে জুন ও সেপ্টেম্বরে ভারত সরকারের নৃবিদ্যা সমীক্ষা বিভাগ ডাঃ নগেন্দ্র দত্ত মজুমদারের নেতৃত্বে দুটি রূপকুণ্ড অভিযানের আয়োজন

করেছিলেন। অভিযাত্রীরা মাংস সমেত একটি দেহের (নারী) কিছু অংশ, কয়েকটি মাথার খুলি, মেয়েদের চুল ও গয়না, জুতো, ছড়ি প্রভৃতি বহু নিদর্শন নিয়ে যান। ঐ সব নিদর্শন পরীক্ষার পরে রিপোর্ট বের হয়—

(1) Radio Carbon dating shows that the bones are 650 years old with the range of 150 years on either side.

(2) The bones indicate that the Rupkund victims were of a homogeneous ethnic stock and similar to the people of North Western India and to the people of Swat and Hunza Valley.

(3) The majority of the finds do not show any similarity of origin with local people, Bhotias and Garhwalis.

(4) The few skulls that show unusual development of the occipital crest, probably belonged to porters, may be Bhotias in origin.

(5) Some of the people received injuries on their skulls but lived some time before they died......

অধ্যাপক মজুমদারের মতে রূপকুণ্ডের মৃতদেহগুলি মহম্মদ বিন তোগলকের চীন অভিযাত্রী সেনাদলের। কিন্তু স্বামী প্রণবানন্দ সমর্থন করেন নি এই মত। এ সম্পর্কে স্বামীজী বলেছেন—

"Rudrakshas, birch bark umbrellas, iron bell stuffed with birch bark and conch pieces collected from here are all articles of worship used by Hindu pilgrims and since conch bangles and toe rings are used only by Hindu women and no arms,···or any other war materials whatsoever have so far been recovered from Rupkund and···no historical evidence is forthcoming···to prove Mohammed Tuglaque's armies entered the Almora or Garhwal Himalayas·"

স্বামীজীর মতে এই মৃতদেহগুলি প্রাকৃতিক দুর্যোগে নিহত তীর্থযাত্রীদের। কনৌজরাজ যশোদয়াল সপরিবারে যোগদান করেছিলেন নন্দাযাতে। কিন্তু পৌঁছতে পারেন নি লক্ষ্যস্থল হোমকুণ্ডে। পথিমধ্যে গিয়তলি ও রূপকুণ্ডের তীরে তাঁরা মৃত্যুবরণ করেন।

বীরেন তার 'রহস্যময় রূপকুণ্ড' বইতে এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করে স্বামীজীর মতকেই মেনে নিয়েছে। আমরাও তার সঙ্গে একমত।

পাথরনাচুনি থেকে কৈলু বিনায়ক দেড় মাইল। এইটুকু পথ আসতে প্রায় ঘণ্টা দেড়েক লেগেছে। তারপরে পুজো-পার্বণে আধ ঘণ্টা কেটে গেছে। কাজেই এবার চলা শুরু করা উচিত। কিন্তু যাকে নিয়ে চলা, সে এখনও সঙ্গীদের সঙ্গে বসে আছে বাবা বিনায়কের সামনে। রামচাঁদ ও কুলিরা কি ধ্যানে বসল নাকি? ওরা দেখছি সত্যই ভক্তি করে সিদ্ধিদাতা গণেশকে। হিমালয়ের অন্যান্য অঞ্চলের, বিশেষ করে হিমাচল প্রদেশের অধিবাসীদেরও অশেষ গণেশভক্তির পরিচয় পেয়েছি। প্রায় সমস্ত তীর্থে অন্যান্য দেবদেবীদের মত পৃথক গণেশমন্দির আছে। কোথাও কোথাও কেবল গণপতিকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে তীর্থক্ষেত্র। কাজেই রামচাঁদ ও তার সঙ্গীদের আচরণে বিস্মিত হই না। বিস্মিত হই বীর সিং-এর মন্তব্যে, "বিনায়ক-ভক্তি নয়, রূপেয়াপ্রীতি।"

"মানে?" আমরা বুঝতে পারি না।

"পুজোর পরে আপনারা দক্ষিণার যে টাকা কটি রেখে এসেছেন বাবা বিনায়কের পদতলে, তা নেবার জন্যই ওরা ওভাবে বসে আছে ওখানে। আপনারা সরে না গেলে ওদের মনস্কামনা পূর্ণ হচ্ছে না।"

বিস্মিত হলেও বীরের সঙ্গে আমরা একটু নিচে নেমে আসি। এখান থেকে আর দেখা যাচ্ছে না ওদের।

বোধ হয় পাঁচ মিনিটও হয় নি। সদলবলে রামচাঁদ এসে হাজির হয়। এসেই বলে, "আপনারা এখনও এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন?"

চুপ করে থাকি। রামচাঁদ এগিয়ে চলে। আমরা তাকে অনুসরণ করি।

কৈলু বিনায়ক গিরিবর্ত্ম পেরিয়ে আমরা চলেছি এগিয়ে—সেই সীমাহীন সৌন্দর্যের লীলাভূমিতে। কিন্তু ওখানে পৌঁছলে যে আর এমন করে দেখতে পাব না গিরি-কান্তারের এই অনন্ত সৌন্দর্যকে। সুন্দর দূর থেকে সুন্দরতর।

তাই আমি চলতে চলতে চেয়ে চেয়ে দেখি। দেখি প্রান্তরের শেষে তিনটি আকাশ-ছোঁওয়া শিখর—ত্রিশূল। স্বর্গ মর্ত্য পাতাল জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে। ত্রিলোকের রক্ষক ও সংহারক বলে সে মর্ত্যের মানুষের কাছে এমন দুর্লভ। পাছে মানুষের মায়ায় সে কর্তব্যজ্ঞান বিস্মৃত হয়, তাই সে চারিদিকে রক্ষাপ্রাচীর গড়ে তুলেছে। আর সেই রক্ষাপ্রাচীরের পরপারে ত্রিশূলের সামনে

সৃষ্ট হয়েছে একটি রমণীয় উপত্যকা। ত্রিশুল থেকে গিরিশিরা নেমে এসে বেষ্টন করেছে এই মনোহর ময়দানকে। এ যেন বাড়ির বাইরে বাগান কিংবা দেবালয়ের অঙ্গন।

কৈলু বিনায়ক এই রক্ষাপ্রাচীর পেরোবার একমাত্র পথ। তুষার-তীর্থ ত্রিশুলের পাদদেশে পৌঁছবার সকল বাধা অপসারিত হয়েছে। তবু সেখানে পৌঁছবার পথটি মোটেই সহজ নয়। দুটি পথ আছে। একটি রক্ষাপ্রাচীরের ওপর দিয়ে আর একটি একটু নেমে গিয়ে। ওপরের পথটি তৃণাচ্ছাদিত কিন্তু পিচ্ছিল। পা ফসকে গড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা প্রতি পদে। নিচের পথটি পাথর আর বরফ ভেদ করে। দুর্গম হলেও পিচ্ছিল নয়। তা ছাড়া এ পথটিতে তেমন ওঠা-নামা করতে হবে না। তাই রামচাঁদ এই পথটি পছন্দ করল। আর পথপ্রদর্শকের পছন্দে পথিকের পছন্দ। আমরা রামচাঁদের পেছনে আস্তে আস্তে সেই বরফ আর পাথর পেরিয়ে এগিয়ে চলেছি।

সহসা দাশুর হাত থেকে আইস এক্সটা ফসকে গেল। পাহাড়ের গা বেয়ে সেটা পড়ে যাচ্ছে নিচে। হায় হায় করে উঠলাম আমরা। দাশু কেবল দার্শনিকের দৃষ্টিতে চেয়ে আছে দুর্গম পথের শ্রেষ্ঠ সহায়ের দিকে।

আইস এক্সটা পাহাড়ের গা বেয়ে কেবলই গড়াচ্ছে। গড়াচ্ছে তো গড়াচ্ছেই। কিন্তু জগতে সব কিছুরই শেষ আছে। আইস এক্সের ডিগবাজী খাওয়াও একসময় শেষ হল। শ'খানেক ফুট নিচে গিয়ে আইস এক্সটা একখানি পাথরে আটকে গেল। আমরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। দাশুর মুখে হাসি ফুটল।

হাসতে হাসতে বীর নেমে গেল নিচে। কিছুক্ষণ বাদে আইস এক্স নিয়ে এসে দাশুর হাতে দিল। আর সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর স্বরে রামচাঁদ বলে উঠল, "এবার থেকে একটু শক্ত করে ধরবেন, যাতে আর পড়ে না যায়।"

লজ্জিত দাশু কোন জবাব দিতে পারে না। সে নীরবে রামচাঁদের পেছনে পথ চলতে থাকে।

মাঝে মাঝেই আছাড় খাচ্ছি আমরা। কিন্তু উপেনবাবু তাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হচ্ছেন না। পাথরের ফাঁকে ফাঁকে ফুটে আছে অসংখ্য সাদা ও রঙীন ছোট-বড় ফুল। ফুল পেলেই প্রজাপতির মত ছুটোছুটি করতে থাকেন উপেনবাবু। তখন আর তাঁর দিক্‌বিদিক জ্ঞান থাকে না। দুর্গম পথের সকল বিপদ উপেক্ষা করে ফুল তুলছেন উপেনবাবু। বাধ্য হয়ে তাঁর সহকারীদেরও

ছুটতে হচ্ছে সঙ্গে। কি করবে! চাকরির মায়া যে প্রাণের মায়ার চেয়ে বড়।

সহসা উপেনবাবু বলে ওঠেন, "মহারাজ, এদিকে আসুন।"

তাড়াতাড়ি তাঁর কাছে এসে বলি, "কি ব্যাপার?"

"বলুন তো এটা কি ফুল?"

"ব্রহ্মকমল।"

"হ্যাঁ, Saussurea Obvallata, বলুন তো কোথায় এ ফুল এমনি ফুটে থাকতে দেখেছেন?"

"কেন ঘাংরিয়া থেকে লোকপাল-হেমকুণ্ড যাবার পথে।"

"একটু লক্ষ্য করলেই দেখবেন," উপেনবাবু বলতে থাকেন, "এ জায়গাটার অবস্থান ও পরিবেশ অবিকল হেমকুণ্ড পথের সেই ব্রহ্মকমল বনের মত। দু জায়গারই উচ্চতা চোদ্দ হাজার ফুটের মত। এখানেও দেখুন তেমনি তুষারের রাজত্ব। এইরকম প্রাকৃতিক পরিবেশেই দেবদুর্লভ পারিজাত জন্মে থাকে।"

উপেনবাবুর সঙ্গে আবার ফিরে আসি পথে। আস্তে আস্তে চলতে থাকি।

কিছুক্ষণ চলার পরে রামচাঁদ বলে, "ঐ দেখুন বাগুয়াবাসা ধর্মশালা দেখা যাচ্ছে।" সে হাত দিয়ে দেখিয়ে দেয়।

বহুদূরে বিন্দুর মত। রূপকুণ্ড পথযাত্রীদের প্রয়োজনে স্বামী প্রণবানন্দ তৈরি করেছেন ঐ ধর্মশালা। ১৯৬০ সালের ৮ই সেপ্টেম্বার এর নির্মাণকার্য শেষ করেছেন। বীরেন ও রথীন এই ধর্মশালার প্রথম অতিথি।

মনে পড়ছে অনিমাদির কথা। পর পর দু বছর তিনি এসেছিলেন এ পথে, বাস করে গেছেন ঐ ধর্মশালাতে। তিনি রূপকুণ্ডে এসেছিলেন কারণ সবাই তাঁকে বলেছিল, রূপকুণ্ডের পথ মেয়েদের জন্য নয়। নারী সঙ্গে নিয়ে এসে কেউ নাকি ফিরে যেতে পারে না এখান থেকে। তাই সেই স্বেচ্ছাচারী শৌখিন রাজা সুন্দরী নর্তকীদের হত্যা করেছেন পাথরনাচুনিতে। কনৌজরাজ যশোদয়াল তাঁর গাড়োয়ালী রাণী বল্লভাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। অমান্য করেছিলেন এ পথের নিয়ম। তাই তাঁকে সপরিবারে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে। রূপকুণ্ড পরিণত হয়েছে মরণহ্রদে।

এই ধারণাকে মিথ্যা প্রমাণ করার জন্যই এসেছিলেন অনিমাদি। তাঁর প্রথম অভিযান বিফল হয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য তাঁকে কয়েকদিন কাটাতে হয়েছিল বাগুয়াবাসা ধর্মশালায়। সেবারে ফিরে যেতে বাধ্য

হয়েছিলেন। কিন্তু পরের বছর তিনি উপস্থিত হয়েছিলেন রূপকুণ্ডের তীরে। প্রমাণ করেছিলেন, রূপকুণ্ড মেয়েদের পার্থিব পদক্ষেপের বাইরে নয়।

ভেবে চলি অনিমাদির কথা। তাঁর সেই অগস্ত্যযাত্রার কথা—

'তুমি আমাদের জন্য অনেক পরিশ্রম করেছ।' বলেই অনিমাদি তাকালেন আমার মুখের দিকে। তাঁর চোখেমুখে কৃতজ্ঞতার পরশ।

আমি লজ্জা পেয়ে বললাম, 'আপনারা নিরাপদে ফিরে আসুন। আমার সকল শ্রম সার্থক হবে।'

হাসতে হাসতে জবাব দিলেন তিনি, 'আসব বৈকি। ট্রেলস্ পাস পেরিয়ে নিশ্চয়ই ফিরে আসব তোমাদের মাঝে। নিরাপদেই ফিরব। বিপদসংকুল পথে যাচ্ছি বলেই বিপদের ভয় করো না। এখন বিপদই আমাকে ভয় করে।'

খুশি হলাম তাঁর কথায়। এমন আত্মপ্রত্যয় না থাকলে কি দুর্গম পথপরিক্রমার সঙ্গী হওয়া যায়? ওঁরা যাচ্ছেন কুমায়ুন হিমালয়ের দুর্গমতম গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করার উদ্দেশে। যে গিরিবর্ত্ম আবিষ্কৃত হয়েছে আজ থেকে একশ' সাঁইত্রিশ বছর আগে, যখন পর্বতারোহণের কোন সাজ-সরঞ্জাম আবিষ্কৃত হয় নি।

গুর্খা আক্রমণের সুযোগ নিয়ে ইংরেজরা গাড়োয়াল ও কুমায়ুনে কায়েম হয়ে বসেছে। জি. ডাবলু. ট্রেল কুমায়ুনের দ্বিতীয় ডেপুটি কমিশনার হয়ে এলেন। শাসনকার্য ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধার জন্য তিনি পিণ্ডারী উপত্যকা ও গৌরীগঙ্গা উপত্যকার মাঝে একটি সংক্ষিপ্ত পথ আবিষ্কার করতে প্রয়াসী হলেন। দানপুর পরগণার সুপি গাঁয়ের মালক সিং বুদা তাঁকে ভরসা দিলেন যে, নন্দাদেবী-পূর্ব ও নন্দাকোট শৃঙ্গদ্বয়ের মধ্যবর্তী অঞ্চলে এরকম একটি পথ পাওয়া যাবে। কয়েকজন স্থানীয় মালবাহককে নিয়ে মিঃ ট্রেল মালক সিংয়ের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লেন।

কুমায়ুন-হিমালয়ের সেই প্রথম অভিযান সফল হল। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে তাঁরা পিণ্ডারী হিমবাহের দিক থেকে রওনা হয়ে নন্দাদেবী-পূর্ব পর্বতের রক্ষা-প্রাচীর পেরিয়ে গৌরীগঙ্গা উপত্যকার মিলাম গাঁয়ে পৌছলেন।

অভিযান সফল হল কিন্তু মিঃ ট্রেলের উদ্দেশ্য সফল হল না। কারণ ১৭,৭০০ ফুট উঁচু সেই দুর্গম গিরিখাতের ওপর দিয়ে মনুষ্য চলাচলের উপযোগী পথ তৈরি করা সম্ভব নয়। স্বাভাবিকভাবেই তিনি তুষারক্ষতে আক্রান্ত হলেন। স্থানীয়রা বললেন, তাঁর আচরণে নন্দাদেবী রুষ্টা হয়েছেন বলেই তাঁর এই দুর্ভোগ।

আলমোড়ার নন্দাদেবীর মন্দিরে পুজো দিলেই তিনি রোগমুক্ত হবেন। জাঁদরেল ইংরেজ হয়েও মিঃ ট্রেল তাদের কথা বিশ্বাস করলেন। বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর।

নন্দাদেবীর পুজো দিয়ে সত্যিই তিনি রোগমুক্ত হয়েছিলেন।

উদ্দেশ্য সফল হল না। কিন্তু মিঃ ট্রেল অমর হলেন। তাঁর আবিষ্কৃত সেই গিরিখাত এখন ট্রেল্‌স পাস নামে বিখ্যাত।

তারপর বহু বছর কেটে গেছে। কিন্তু আজও ট্রেল্‌স পাস কুমায়ুন হিমালয়ের দুর্গমতম গিরিখাত। একদিকে পিণ্ডারী হিমবাহ আর একদিকে মিলাম। পিণ্ডারীর দিকে ভয়াবহ ফাটল ও মারাত্মক বরফের দেয়াল। আর মিলামের দিকে পিচ্ছিল বরফাবৃত অসমতল প্রান্তর। যে গিরিশিরাটি নন্দাদেবী-পূর্ব ও নন্দাকোট পর্বতকে সংযুক্ত করেছে, তারই সর্বোচ্চ বিন্দু থেকে মাত্র সাড়ে তিনশ ফুট নিচে অবস্থিত। স্বভাবতই অতিক্রম করা পরের কথা, এই গিরিখাতকে খুঁজে পাওয়াই কঠিন। বছরের অধিকাংশ সময়েই সে মেঘাবৃত থাকে। কেবল জ্যৈষ্ঠ (মে-জুন) ও আশ্বিন (সেপ্টেম্বার-অক্টোবর) এই দুমাস, ভাগ্য ভাল থাকলে, খুঁজে পাওয়া যায়।

তাহলেও কয়েকবার এই গিরিখাত লঙ্ঘিত হয়েছে। দ্বিতীয়বার অতিক্রম করেন এডলফ্‌ স্লাগিনওয়েটস ১৮৫৫ সালে। সেবারও তাঁকে নন্দাদেবীর পুজো মানত করে রওনা হতে হয়েছিল।

তারপরে ১৮৬১ সালে মালক সিং-য়ের ছেলে দরবান সিং-য়ের সঙ্গে কর্ণেল এডমাণ্ড স্মাইথ এবং ১৮৯৮ সালে জার্মাণ অভিযাত্রী বুথ এই গিরিখাত অতিক্রম করেন।

মার্তোলি গাঁয়ের দেওয়ান সিং উত্তর অর্থাৎ মিলামের দিক থেকে প্রথম এই গিরিখাত অতিক্রম করেন ১৯১৩ সালে। তিনি খুবই সুদক্ষ পর্বতারোহী ছিলেন।

১৯২৬ সালে কুমায়ুনের ডেপুটি কমিশনার হিউ রাট্‌লেজ তাঁর স্ত্রী ও কর্ণেল আর. সি. উইলসনের সঙ্গে যখন কৈলাস ও মানসসরোবর থেকে ফিরছিলেন, তখন দেওয়ান সিং তাঁদের নিয়ে মিলামের দিক থেকে দ্বিতীয়বার এই গিরিখাত লঙ্ঘন করেন।

দেওয়ান সিং তৃতীয়বার এই গিরিখাত অতিক্রম করেন ১৯৩৬ সালে। সুইস পরিব্রাজক গান্‌সার ও দুজন শেরপাকে নিয়ে ২৫শে আগস্ট মার্তোলি

থেকে রওনা হয়ে, ২৮শে আগস্ট পিণ্ডারী উপত্যকায় উপনীত হন।

কিন্তু কয়েকদিন পরে এইচ. ডাবলু. টিলম্যান নন্দাদেবী শিখরে আরোহণ করে ফেরার পথে বহু চেষ্টা করেও ট্রেলস্ পাস খুঁজে পান নি। তিনি পথ সংক্ষেপ করে তাড়াতাড়ি আলমোরায় ফিরে আসতে চেয়েছিলেন।

অথচ ঐ বছরই অক্টোবর মাসে অলিম্পিক স্কি-দৌড়বীর সকুতা তাকেবুশীর নেতৃত্বে জাপানের রিকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল অভিযাত্রী নন্দাকোট পর্বতশৃঙ্গ জয় করার পর দেওয়ান সিংয়ের সঙ্গে ট্রেলস্ পাস অতিক্রম করে পথ সংক্ষেপ করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

পরবর্তীকালে দেওয়ান সিং আলমোরার ডেপুটি কমিশনার ডি. ভোরাকে নিয়ে আরেকবার উত্তর দিক থেকে ট্রেলস্ পাস অতিক্রম করেছিলেন। দেওয়ান সিং আর ইহলোকে নেই। কিন্তু তাঁর সহকারী রাম সিং আজও বেঁচে আছেন। দেওয়ান সিংয়ের সঙ্গে তিনি তিন-চারবার ট্রেলস্ পাস অতিক্রম করেছেন। তিনিও সুদক্ষ পর্বতারোহী। এখন তিনি মার্তোলি গাঁয়ে ভগবতী মন্দিরের পূজারী।

স্বাধীনোত্তর যুগেও কয়েকবার এই গিরিখাত লঙ্ঘিত হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশ থেকে তখন পর্যন্ত এই গিরিখাতে কোন অভিযান পরিচালিত হয় নি। হয় নি বলেই আমরা হিমালয়ান এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সেবারে এই গিরিখাতের উদ্দেশ্যে একটি পদযাত্রার আয়োজন করেছিলাম। দুজন মহিলাসহ নজন যাত্রী এই যাত্রায় অংশগ্রহণ করেছিলেন—সর্বশ্রী শৈলেশ চক্রবর্তী (নেতা), অমূল্য সেন, অসিত বসু, রণেশ চট্টোপাধ্যায়, দাশরথি সরকার, কৃপাণ দাশগুপ্ত, জ্যোৎস্নাময় মুখোপাধ্যায়, রেবা মুখোপাধ্যায় ও অনিমা সেনগুপ্তা।

১২ই সেপ্টেম্বর (১৯৫৫) অমৃতসর মেলে অভিযাত্রীরা যাত্রা করলেন এই দুরতিক্রম্য গিরিবর্ত্মের উদ্দেশে।

সেদিনই প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে অনিমাদির সঙ্গে কথা হচ্ছিল। কথায় কথায় খেয়াল করি নি যে গাড়ি ছাড়ার সময় সমাগত। হঠাৎ ঘড়ির দিকে নজর পড়ে। ব্যস্তভাবে তাঁকে প্রণাম করে বললাম, 'সময় হয়ে গেছে। এবারে গাড়িতে গিয়ে উঠুন।'

তখন বুঝতে পারি নি, সেই আমার শেষ প্রণাম। সেযাত্রা অগস্ত্যযাত্রা।

তারপরে বহু ভেবেছি, কেন এমন হল? আমরা তো কতবার কত দুর্গম

অভিযানে অংশগ্রহণ করেছি। তিনি নিজেও তো এর চেয়ে দুর্গমতর পথ-পরিক্রমা পূর্ণ করে নির্বিঘ্নে ফিরে এসেছেন আমাদের মাঝে। ১৯৫৩ সালে গিয়েছিলেন কৈলাস ও মানসসরোবর, ১৯৫৫ সালে গিয়েছিলেন গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রী ও কেদার-বদ্রী, ১৯৫৯ সালে অমরনাথ, ১৯৫৫ সালে গঙ্গোত্রী ও গোমুখী, ১৯৫৯ সালে পিণ্ডারী হিমবাহ ও ১৯৬৩ সালে রূপকুণ্ড। তাহলে সেবারে কেন এমন হল ?

অনিমাদি জন্মেছিলেন ১৯২০ সালে, পরাধীন ভারতের অন্যতম মুক্তিযজ্ঞ-ভূমি বরিশালের মাটিতে—গৈলা গ্রামে। পিতা বিমলেন্দু সেন সে যুগের স্বদেশী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে শিক্ষার সাধনায় জীবন উৎসর্গ করেছেন। পিতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন অনিমাদি। ১৯৪০ সালে তিনি বরিশালের ব্রজমোহন কলেজ থেকে বি. এ. ও ১৯৪৩ সালে কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে ইতিহাস নিয়ে এম. এ. পাস করেন। পরবর্তী কালে তিনি বি. টি. ও এম. এড্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ছাত্রীজীবনে তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনে ও কর্মজীবনে প্রগতিশীল নারী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছেন।

১৯৫০ সালে পাকিস্তানী জেহাদের কবলে পড়ে, সর্বস্ব হারিয়ে বৃদ্ধ পিতা মাতা, ছোট দুটি ভাই ও একটি বোনকে নিয়ে কলকাতায় পালিয়ে আসেন। জীবনসংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন। জয়লাভ করেছিলেন অনিমাদি। শেষ পর্যন্ত তিনি উত্তর কলকাতার শশীমুখী বসু বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী হয়েছিলেন।

নিজে সংসারী হবার অবকাশ পান নি, কিন্তু সংসারের তিনি ছিলেন সর্বময়ী কর্ত্রী। ছোট ভাই-বোনদের মানুষ করেছেন, বিয়ে দিয়েছেন। তাঁদের ছেলেমেয়েরাই ছিল তাঁর চোখের মণি।

২০শে সেপ্টেম্বর অভিযাত্রীরা মুনসিয়ারী পৌঁছলেন। মালক সিং পিণ্ডারী হিমবাহের দিক থেকে প্রথম ট্রেল্‌স গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করলেও, এই গিরিপথ বেশিবার অতিক্রান্ত হয়েছে মার্তোলী তথা মুনসিয়ারীর দিক থেকে। তাই অনিমাদিরাও গিয়েছিলেন এই পথে। ওঁরা মুনসিয়ারীর রাতি ডাকবাংলোয় রাত কাটান।

পরদিন মাত্র চার মাইল হেঁটেছিলেন অভিযাত্রীরা। পৌঁছেছিলেন লিলাম। লিলামে কোন ডাকবাংলো নেই, আছে একটি পুলিস ব্যারাক। সেখানেই আশ্রয় নিয়েছিলেন ওঁরা। ফেরার পথেও সেখানে আশ্রয় নেবার

জন্যেই ছুটে আসছিলেন অনিমাদি, কিন্তু আসতে পারেন নি। চিরকালের মতই লিলাম রয়ে গেছে তাঁর পার্থিব পদক্ষেপের বাইরে।

ফেরার পথে যাই হয়ে থাক, যাবার পথে পরদিন ওঁরা খুব সকালে লিলাম ছেড়েছিলেন। পথ ভাল নয়। ডানদিকে গৌরীগঙ্গা, বাঁদিকে পাহাড়। মাঝে মাঝেই ধস নেমেছে।

অবশেষে ওঁরা পৌছলেন একটা কাঁচা পাহাড়ের পাশে। পাহাডটা প্রায়ই ভাঙ্গছে। অনবরত পাথর পডছে গডিয়ে, কখনও পথে, কখনও তীরে, কখনও বা নদীতে। পাহাডটা যেন গৌরীগঙ্গার প্রেমে পডেছে। নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিতে চাইছে গৌরীগঙ্গার বুকে। ভেঙ্গে পডার কোন সময়-অসময়, নিয়ম-অনিময় নেই। ভালবাসার কি সময় আছে, প্রেমের কি নিয়ম আছে?

পথ-রেখা প্রায় নিশ্চিহ্ন। অভিযাত্রীরা অতি সন্তর্পণে পেরিয়ে এলেন সেই ভয়ঙ্কর স্থান—অভিশপ্ত স্থানও বলতে পারি। এপারে পৌছে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। পথের ওপরই পডলেন বসে। তখন লিলাম থেকে ওঁরা মাইল দেড়েক হেঁটেছেন।

বোধ করি মিনিট পাঁচেক বাদে—ওঁদের সামনে শুরু হল প্রকৃতির সেই বিচিত্র লীলা। করুণা বলাই ঠিক হবে। সহসা একটু আগে পেরিয়ে আসা পথের অনেকটা অংশ ধসে পড়ল গৌরীগঙ্গায়। আশ্চর্যজনক ভাবে বেঁচে গেলেন ওঁরা।

আর জীবন-মৃত্যুর সেই সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে অভিযাত্রীরা দেখলেন এক অপূর্ব দৃশ্য। বিরাট বিরাট পাথর পড়ছে গড়িয়ে—পাহাড় থেকে পথে, পথ থেকে নদীতে। পতনকালে পরিবর্তিত হচ্ছে তাদের রূপ। বড় থেকে মাঝারি, মাঝারি থেকে ছোট, ছোট থেকে নুড়ি, নুড়ি থেকে গুঁড়ি—ধোঁয়ায় ঢেকে ফেলছে চারিদিক। চারিদিক থর থর করে কাঁপছে। প্রকম্পিত হচ্ছে ডমরুর গম্ভীর গর্জনে। ওঁদের চোখের সামনে রুদ্রের প্রলয় হয়ে গেল। এই ভয়ঙ্কর সুন্দর দৃশ্যকে কোনদিন বিস্মৃত হবেন না অভিযাত্রীরা।

প্রলয় শেষে ওঁরা করজোড়ে প্রণাম জানালেন জীবন-দেবতাকে। ধন্যবাদ দিলেন দেবতাত্মা হিমালয়কে। একবারও ভাবলেন না, তখনও পদযাত্রার প্রথম পর্যায় চলেছে। ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। অভিযান বিফল হলে তাঁদের আবার এই পথে আসতে হবে ফিরে। যে বিপদ এখন কাটল, সে

বিপদ তখন তাঁদের অদৃষ্টে আসতে পারে নেমে।

অভিযাত্রীরা যাত্রাপথের কথা ভাবতে পারে। কিন্তু পথের ভাবনার চেয়ে তাদের কাছে যাত্রার ভাবনাটা বড়। তাই ওঁদের একসময় গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াতে হয়। আবার চলতে হয় এগিয়ে।

মাইল আধেক এগিয়ে ওঁরা পৌঁছলেন পালতিগড়। দেখলেন একটি অনিন্দ্যসুন্দর ঝরণা। অনেক উঁচুতে পাহাড়ের ওপরে সৃষ্ট হয়ে গৌরীগঙ্গায় পড়ছে। একে অবশ্য ঝরণা না বলে জলপ্রপাত বলাই উচিত হবে।

একটা পুল পেরিয়ে মাইল খানেক এগিয়ে ওঁরা পৌঁছলেন বুগডিয়ার (৮৬০০´)। স্থানীয় স্কুলে আশ্রয় নিলেন। স্কুলের সামনেই রাস্তা। রাস্তার ওপরে কয়েকটা ঘোড়ার মৃতদেহ আছে পড়ে। শীত এসে পড়েছে বলে গ্রাম-বাসীরা নেমে যাচ্ছিলেন নিচে। ঘোড়াগুলো বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল তাঁদের মাল-পত্র। সহসা পথের পাশের খাড়া পাহাড়ের ওপর থেকে পাথর পড়েছে গড়িয়ে। ঘোড়াগুলোর ভবলীলা সাঙ্গ হয়েছে। ঘোড়া না থেকে সেখানে যদি মানুষ থাকত, তাহলে?

পরদিন সকালে নব উদ্যমে ওঁরা আবার যাত্রা করলেন চড়াই পথে। চার মাইল এগিয়ে পথের পাশে পেলেন একটি সুবিরাট গুহা। চারজন মানুষ বহাল তবিয়তে বিশ্রাম করতে পারে সেখানে। পাশেই প্রবাহিত হচ্ছে একটি স্বচ্ছ-শীতল সুমিষ্ট ঝরণা। এমন চমৎকার চড়ুইভাতির জায়গা সচরাচর চোখে পড়ে না।

অভিযাত্রীরা এলেন রিলকোট—ছোট একটি পাহাড়ী গ্রাম। দোকান-পাট, বাড়ি-ঘর সবই আছে। কেবল মানুষ নেই। গাঁয়ের মানুষরা কয়েকদিন আগে নেমে গেছে নিচে।

হিমালয়ের ওপরের দিকে সমস্ত পার্বত্য গ্রামের অধিবাসীরাই শীতের আগে তাদের ঘর-বাড়ি বন্ধ করে নেমে যায় নিচে। গরু-ঘোড়া, কুকুর-ভেড়া সবই সঙ্গে নিয়ে যায়। গ্রীষ্মের প্রথমে বরফ গলা শুরু হলে ফিরে আসে গ্রামে। সাধারণত এরা অক্টোবরের শেষে কিংবা নভেম্বরের প্রথমে গ্রাম ছাড়ে। কিন্তু সেবার শীত তাড়াতাড়ি আসায় সেপ্টেম্বারের শেষেই গ্রামগুলো জনশূন্য হয়ে পড়েছিল। এ খবরটা জানা ছিল না অভিযাত্রীদের।

রিলকোটের বন্ধ বাড়ি-ঘর পেরিয়ে অভিযাত্রীরা চললেন এগিয়ে। পথে দু জায়গায় গৌরীগঙ্গা একেবারে সমতল দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। গৌরীগঙ্গার

ওপারে টোলা গ্রাম। আরও দু মাইল এগিয়ে মার্তোলী—এ অঞ্চলের বৃহত্তম গ্রাম।

বুগডিয়ার থেকে ন মাইল চড়াই ভেঙে মার্তোলী। উচ্চতা ১২,২২২ ফুট। প্রায় পাঁচশ ঘর বাসিন্দার বাস। কিন্তু বাসিন্দাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল না অভিযাত্রীদের। তাঁরা তখন নেমে এসেছে নিচে। ফলে মহাবিপদে পড়লেন ওঁরা। কুলিভাড়া বাঁচাতে গিয়ে নেতা মুনসিয়ারী থেকে রেশন নিয়ে যান নি। মার্তোলীতে রেশন কেনার পরিকল্পনা ছিল তাঁর। কাজেই জনশূন্য মার্তোলী ওঁদের কাছে হতাশার বাণী বহন করে আনল। দিন সাতেকের রেশন ছিল সঙ্গে। হয় এই খাবার সম্বল করে এগিয়ে যেতে হবে, নয় অভিযান বন্ধ করে দিতে হবে। সদস্যরা কেউ কিন্তু অভিযান বন্ধ করে দেবার পক্ষপাতী নন, যেভাবেই হোক অভিযান চালাতে চাইলেন।

কিন্তু চাইলেই তো পাওয়া যায় না। চাওয়ার সঙ্গে পাওয়ার যে চিরকাল বিবাদ। প্রকৃতি বাদ সাধলেন। প্রচণ্ড ঝড় আর প্রবল বৃষ্টি আরম্ভ হল। সেই সঙ্গে আবার ভূমিকম্প। অনির্দিষ্ট কাল ধরে প্রতীক্ষা করা ছাড়া আর কোন উপায় রইল না। নিরুপায় অভিযাত্রীরা আধপেটা খেয়ে আশায় বুক বেঁধে দুর্যোগ কমে যাবার জন্য প্রতীক্ষা করতে থাকলেন।

দু'দিন দুর্যোগ চলার পরে তৃতীয় দিন সকালে প্রকৃতি অপেক্ষাকৃত শান্ত হলেন। ঝড় কমে গেল, তবে বৃষ্টি বন্ধ হল না। বৃষ্টি মাথায় করেই অভিযাত্রীরা চললেন নন্দাদেবীর মন্দিরে—যাঁর করুণা না হলে কুমায়ুন-হিমালয়ের কোন অভিযান সফল হয় না। যিনি কৃপা না করলে কোন অভিযাত্রী প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে পারেন না কুমায়ুন থেকে, সেই পরমারাধ্যা চিরজাগ্রতা নন্দাদেবীর কাছে।

নন্দাদেবীর মন্দির আছে কুমায়ুনের সর্বত্র। মার্তোলীর নন্দাদেবী-মন্দির গ্রামের প্রান্তসীমায় একটু উঁচুতে অবস্থিত। বিচিত্র তার অবস্থান—যেন সদাই তাকিয়ে আছে গ্রামের দিকে চিরজাগ্রত প্রহরীর ন্যায়। নিদ্রাহীনা মাতা সন্তানের শিয়রে রয়েছেন জেগে। স্নেহময়ী মঙ্গলদায়িনী জননী সর্বদা সন্তানকে রক্ষা করছেন।

কয়েকটি ভূর্জগাছ রয়েছে মন্দিরের চারিপাশে। অথচ চারিদিকে তুষারাবৃত শৃঙ্গরাজি ও হিমবাহের মধ্যে অবস্থিত মালভূমি সদৃশ মার্তোলীর আর কোথাও ভূর্জগাছ নেই।

আবহাওয়া ভাল থাকলে এই মন্দিরচত্বরে দাঁড়িয়ে দেখতে পাওয়া যায় ত্রিশুলী শিখরকে—তিনটি পর্বতশৃঙ্গের সেই দুর্ভেদ্য দুর্গকে। কেবল ত্রিশুলী নয়—মার্তোলীর চারিদিকেই তুষারাবৃত শৈলশিখর। কিন্তু শ্বেত-শুভ্র শৈলশিখরই মার্তোলীর একমাত্র প্রাকৃতিক পরিচয় নয়। মার্তোলীর উপকণ্ঠে লওয়ান নদী এসে মিলিত হয়েছে পিথোগড়ের প্রাণধারা গৌরীগঙ্গার সঙ্গে। সঙ্গমটি সুন্দর।

মুনসিয়ারীর পথটি কিন্তু মার্তোলী পৌঁছে শেষ হয়ে যায় নি। বারফু ও মিলাম হয়ে গেছে এগিয়ে। উন্টা (১৭,৯৫০´), জয়ন্তী (১৮,৫০০) ও কাংরী-বিংরী (১৮,৩০০´) গিরিবর্ত্ম পেরিয়ে পৌঁছেছে তিব্বতে। থাজাং হয়ে চলে গেছে তারছেন তথা কৈলাস পর্বতের পাদদেশে। মার্তোলী থেকে তারছেন মাত্র ১১০ মাইল। মার্তোলী থেকে মুনসিয়ারী ২৫ ও আলমোরা ৭৫ মাইল।

প্রকৃতির নির্দয় আচরণে অধীর অভিযাত্রীরা যখন মার্তোলীর মন্দিরে এলেন তখনও মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। তাঁরা পুজো দিয়ে কায়মনোবাক্যে নন্দাদেবীর করুণা ভিক্ষা করলেন। প্রার্থনা শেষে বাইরে বেরিয়ে করুণাময়ী নন্দাদেবীর করুণা দেখে বিস্মিত হলেন। বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেছে, রোদের রেখা দেখা দিয়েছে পশ্চিমাচলের বুকে। দয়াময়ী দেবী-নন্দার উদ্দেশ্যে আর একবার সকৃতজ্ঞ প্রণাম জানিয়ে অভিযাত্রীরা ফিরে এলেন আস্তানায়।

পরদিন আলো-ঝলমল সকালে ওঁরা রওনা হলেন ওপরে—ট্রেল্‌স পাসের পথে। পথ বলে কিছু নেই। পথ শেষ হয়ে গেছে মার্তোলীতে। ভেড়া চলাচলের দুর্গম পাকদাণ্ডি বেয়ে তাঁরা ওপরে উঠতে থাকলেন।

কিছুদূর এসে সালাং ও লওয়ান নদীর সঙ্গম। এখান থেকে একটি পাকদাণ্ডি গেছে ফুরকিয়া—গিরিশ্রেণীর অপর পারে পিণ্ডারী নদীর তীরে খানিকটা সমতল জায়গা। পিণ্ডারী হিমবাহ দর্শনার্থীদের শেষ আশ্রয় ফুরকিয়া ডাক-বাংলো।

সে যাই হোক, সেই পাকদাণ্ডি দিয়ে গেলে ট্রেল্‌স পাস না পেরিয়েই পৌঁছনো যায় পিণ্ডারী উপত্যকায়। কিন্তু ওঁরা তো পিণ্ডারী উপত্যকায় পৌঁছবার জন্য পথে বের হন নি, ওঁরা গিয়েছিলেন ট্রেল্‌স পাস অতিক্রম করতে। কাজেই ওঁরা জোর কদমে এগিয়ে যেতে চাইলেন।

পারলেন না। পিণ্ডারী উপত্যকার পাকদাণ্ডি দিয়ে পালাতে চাইল

কয়েকজন কুলি। অনিমাদি বাধা দিলেন তাদের। বললেন, 'তোমরা না পাহাড়ী নওজওয়ান্'? বরফ আর ধসের সঙ্গে তোমাদের না জন্মগত পরিচয়? তোমরা ভয় পেয়ে পালিয়ে যেতে চাইছো? অথচ আমাদের কথা ভাবো, আমার কথা ভাবো। আমি মেয়েমানুষ হয়ে এগিয়ে যেতে চাইছি। আর তোমরা……'

শেষ করলেন না অনিমাদি। কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য সফল হল। কুলিরা উঠে দাঁড়ালো, নতমস্তকে এগিয়ে চলল।

মার্তোলী থেকে চার মাইল এগিয়ে তাঁরা পৌছলেন প্রায় জনশূন্য লোয়াঁ (১৩,৫০০´) গাঁয়ে। শীতের ভয়ে নিচে পালিয়ে যাবার সময় গাঁয়ের লোকেরা সব আলু তুলে নিয়ে যেতে পারে নি। অনিমাদি মহানন্দে ক্ষেতে নেমে আলু তুলতে আরম্ভ করলেন।

কিছুক্ষণ জিরিয়ে নিয়ে আবার পদযাত্রা আরম্ভ হল। আরও দু' মাইল এগিয়ে রতগংগাল—মেষপালকদের সাময়িক বিশ্রামস্থল। সেখানেই তুষারের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হল ওঁদের। বরফ দেখে অনিমাদির আর আনন্দ ধরে না। শিশুর মত ছুটোছুটি শুরু করলেন। বরফের বল বানিয়ে সকলের গায়ে ছুঁড়তে লাগলেন। তারপরে একসময় বসে পড়লেন বরফের ওপর। বটুয়া থেকে ডায়েরী ও পেনসিল বের করে ছবি আঁকতে লাগলেন।

চমৎকার ছবি আঁকতেন অনিমাদি। প্রতিবারই পাহাড়ে গিয়ে তিনি বহু স্কেচ করে নিয়ে আসতেন। পরে ঘরে বসে রং আর তুলি দিয়ে ক্যানভাসের ওপর হিমালয়ের শাশ্বত সৌন্দর্যকে সজীব করে তুলতেন। তিনি নিজেই বলতেন, 'পাহাড়ী পথের ফার্ণ পাতা এবং রং-বেরংয়ের নানা নুড়ি-পাথর আর ছবিতে ঘর ভরিয়েছি—অবসরে এরাই আনন্দ—এরাই সঙ্গী। এদের স্মৃতি রোমন্থনই আমার বৃদ্ধ বয়সের সঙ্গী হবে।'

পরদিন (২৮শে সেপ্টেম্বর) সকালে রতগংগাল থেকে বেরিয়ে দুপুরের একটু পরে অভিযাত্রীরা নাসপানপট্টিতে পৌছলেন। সেখানে কিছুক্ষণ জিড়িয়ে নিয়ে আবার যাত্রা করলেন। তাঁরা সন্ধ্যের একটু আগে ট্রেলস পাসের পাদদেশে ১৬,৩০০ ফুট উচু বিঠলগোয়ারে তাঁবু ফেললেন। অভিযাত্রীরা সকলেই আনন্দিত। প্রায় লক্ষ্যস্থলে এসে পৌছেছেন। সাফল্য সুনিশ্চিত। কাল সকালেই তাঁরা কুমায়ুন হিমালয়ের দুর্গমতম গিরিখাত ট্রেলস্ পাস অতিক্রম করে পিণ্ডারী উপত্যকায় উপনীত হবেন। দর্শন করবেন নন্দাদেবী-

পূর্ব ও নন্দাকোট পর্বতের পূর্ণরূপ। কিন্তু অন্তর্যামী বোধ করি তখন অলক্ষ্যে দাঁড়িয়ে নীরবে হাসছিলেন।

মধ্যরাত্রিতে অকস্মাৎ মত্ত পবনের আবির্ভাব ঘটল। শুরু হল তুষারঝড়। রুদ্র প্রকৃতি প্রচণ্ড আঘাত হানলেন অসহায় অভিযাত্রীদের। অবিরাম তুষার-পাতের মধ্যে বসে নন্দাদেবীর কৃপা প্রার্থনা করলেন তাঁরা। হিমানি সম্প্রপাতের ভয়ঙ্কর গর্জনে থেকে থেকে চমকে উঠলেন। উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার মধ্যে নিদ্রাহীন রাত্রি অতিবাহিত হল।

২৯শে সেপ্টেম্বার সারাদিন ধরেই তুষারঝড চলল। দুপুররাতে দুর্যোগ কমে এল। অভিযাত্রীরা আবার আশায় বুক বাঁধলেন। ঠিক হল আবহাওয়া আর খারাপ না হলে তাঁরা শেষরাতেই চূড়ান্ত সংগ্রাম শুরু করবেন। রাত আড়াইটার সময় সবাই স্লিপিং ব্যাগের বাইরে বেরিয়ে এলেন। পোষাক পরে তৈরি হয়ে নিলেন। ভোরের আলো ফুটবার আগেই তাঁরা যাত্রা করবেন ট্রেলস পাসের দিকে।

কিছুক্ষণ চলার পর ভোর হল—৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৫৯। তখনও বেশ বাতাস বইছে। মাঝে মাঝে তুষারপাতও হচ্ছে। তারই মাঝে এগিয়ে চললেন তাঁরা। ক্রমেই পারিপার্শ্বিক অবস্থা তাঁদের বিচলিত করে তুলল। কোথাও বা হাঁটু সমান নরম বরফ, কোথাও বা প্রায় কোমড় সমান। চারদিকে হিমানি সম্প্রপাতের চিহ্ন। তবু তাঁরা ধীরে ধীরে এগিয়ে চললেন। এইভাবে কিছুক্ষণ চলার পর আবার মুষলধারে তুষারপাত আরম্ভ হল। সবাই নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

খানিকক্ষণ বাদে তুষারপাত একটু স্তিমিত হলে কুলিরা অসহযোগ ঘোষণা করল। তারা নেমে যেতে চাইল। অনন্যোপায় হয়ে নেতা সকলের মতামত জানতে চাইলেন। অনিমাদি বললেন, 'প্রকৃতির কাছে এত সহজে হার মানবো না। আমরা এগিয়ে যাব।' তিনি কুলিদের ভয় ভাঙাবার অনেক চেষ্টা করলেন।

কিন্তু আজ অনিমাদিকেই হার মানতে হল—প্রকৃতির কাছে নয়, কুলিদের কাছে। কুলিরা কিছুতেই আর এগোতে রাজী হল না। তাদের দৃঢ়বিশ্বাস নন্দাদেবী রুষ্টা হয়েছেন। আর এগোলে সবাইকেই শেষ শয্যা পাততে হবে নন্দাদেবীর পদতলে।

অগত্যা গভীর দুঃখের সঙ্গে প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। মাত্র হাজার

খানেক ফুট উঠতে পারলেই তাঁরা পৌছতে পারতেন লক্ষ্যস্থলে। এত কাছে এসেও এত দূরে রয়ে গেল ট্রেলস্ পাস। অন্ততঃ অনিমাদির কাছে চিরজীবনের মত। কিন্তু সে কথা এখন থাক। কারণ সেদিন অনিমাদি মুহূর্তের তরেও সে কথা ভাবেন নি। বরং বলেছেন, 'আজ ফিরে যাচ্ছি। তবে আবার আসব। সেদিন কিন্তু তোমার কোন বাধাই মানব না ট্রেলস্ পাস।'

অভিযাত্রীরা সেদিন নাসপানপট্টি ছাড়িয়ে অপেক্ষাকৃত কম বরফাবৃত একটি প্রান্তরে রাতের মত আস্তানা গাড়লেন। পরদিন (১লা অক্টোবর) নেমে এলেন মার্তোলীতে। রাতে খেতে বসে অনিমাদি বললেন, 'বিচিত্র আকর্ষণ হিমালয়ের। এত কষ্ট করি তবু শ্রান্ত হই না। ফিরে যেতে মন চায় না। যাবার সময় কেবলই মনে হয়, আবার কবে আসব ? আচ্ছা, আমরা যেমন হিমালয়কে ভালবাসি, হিমালয়ও কি আমাদের তেমনি ভালবাসে ?'

'বাসে বই কি।' কৃপাণবাবু বললেন, 'হিমালয়কে ভালবেসে বার বার যারা তার কাছে আসে, একবার হিমালয় তাদের বুকে টেনে নেয়।'

কেউ কল্পনাও করতে পারে নি যে সেদিন নেহাৎ কথাচ্ছলে কৃপাণবাবু যে কথা বলেছিলেন, পরদিনই অনিমাদির জীবনে সে কথা নির্মম সত্য হয়ে দেখা দেবে।

২রা অক্টোবর ১৯৬৪—গান্ধীজীর জন্মতিথি। মার্তোলীর পাট চুকিয়ে অভিযাত্রীরা সকালেই রওনা হলেন বুগডিয়ারের পথে। চলতে চলতে অমূল্য বলল, 'দু বছর আগে আজকের দিনে আমরা নীলগিরি অভিযানের মূল শিবির স্থাপিত করেছিলাম।'

'আর আজ ?' অনিমাদি বললেন, 'পরাজিত হয়ে পালিয়ে চলেছি হিমালয় থেকে।'

দুপুরের পরে ওঁরা এসে পৌছলেন বুগডিয়ার। কুলিরা আগেই এসে রান্না খাওয়া সেরে নিয়েছে। কৃপাণবাবুর সঙ্গে অনিমাদিও পৌছেছিলেন প্রায় ঘণ্টা-খানেক আগে। অপেক্ষা করছিলেন সবার জন্য। তাঁরা আসতেই অনিমাদি নেতাকে বললে, 'আমরা দুজনে এগিয়ে যাচ্ছি, আপনারা বিশ্রাম করে আস্তে আস্তে আসুন।'

'কিন্তু সন্ধ্যের আগে লিলাম পৌছানো যাবে কি ? আসার সময়ই পথের যা চেহারা দেখেছি ! আর ইতিমধেই ন মাইল হাঁটা হয়ে গেছে।' নেতা আমতা আমতা করতে থাকেন।

অনিমাদি বলেন, 'আমাকে সাত তারিখের মধ্যে কলকাতায় পৌঁছতেই হবে। আমি না গেলে স্কুলের প্রশ্নপত্র তৈরি হবে না। ছুটির পরই পরীক্ষা।'

নেতা রাজী হলেন। কৃপাণবাবু ও অনিমাদি বেরিয়ে পড়লেন আট মাইল দূরে লিলামের দিকে। যাবার সময় অনিমাদি অমূল্যকে বললেন, 'তোমরাও বেশি দেরি কোর না। তাড়াতাড়ি এস। এখনও কিছু টিনের মাছ আর কিমা মটর রয়েছে। আজ আমি নিজে রান্না করব। আমি আগে গিয়ে রান্না চড়িয়ে দিচ্ছি।'

'তোমার তো পুঁথিগত বিদ্যা। স্কুলের মেয়েদের রান্না শেখানো, আর মুখে দেবার মত রান্না করা এক জিনিস নয়। খাবারগুলো নষ্ট করবে বুঝতে পারছি।'

অমূল্যর কথায় হেসে ফেললেন অনিমাদি, 'আচ্ছা আজ রাতে খাবার সময় যেন একথা মনে থাকে। আমরা সবাই খাবো, আর তাকিয়ে তাকিয়ে তুমি তাই দেখবে।'

অমূল্য তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, 'না না। আমি এমনি বললাম। আমি জানি তুমি খুউব ভাল রান্না করতে পার অনিমাদি।'

আবার হাসলেন তিনি। কৃপাণবাবুও সে হাসিতে যোগ দিলেন। তারপরে ওঁরা বিদায় নিলেন হাত নেড়ে। চিরবিদায় নিলেন অনিমাদি তাঁর সহযাত্রীদের কাছ থেকে। আমাদের কাছ থেকে।

বুগডিয়ার থেকে প্রথম কিছুদূর পর্যন্ত আঁকাবাঁকা পথ। তারপরে অনেকটা সোজা, একটি ঝরণার কাছে এসে ডানদিকে বাঁক নিয়েছে। আবার কিছুটা এসে রাস্তাটি বেঁকেছে বাঁয়ে। বাঁক ছাড়ালেই সেই গিলা বা কাঁচা পাহাড়। পাহাড়ীরা বলে খতরনাক। অর্থাৎ শ'খানেক ফুট বিপদসঙ্কুল স্থান। ডান দিকে প্রায় হাজার ফুট উঁচু খাড়া পাহাড়, বাঁদিকে খরস্রোতা গৌরীগঙ্গা। পাহাড়ের গা দিয়ে সঙ্কীর্ণ পথ। গত কয়েকদিনের বৃষ্টি আর ভূমিকম্পের ফলে ক্রমাগত ধস্ নেমে, সেই পথ-রেখা নিশ্চিহ্ন—মরণফাঁদে রূপান্তরিত। জায়গাটির উচ্চতা মাত্র হাজার ছয়েক ফুট। মার্তোলী থেকে দূরত্ব প্রায় সাড়ে ছয় মাইল। সেখান থেকে লিলামের পুলিস ব্যারাক মাইল দেড়েক।

বিকেল পৌনে ছটা নাগাদ সর্দার লক্ষ্মণ সিং তার কুলির দল নিয়ে এখানে এসে উপস্থিত হল। পাহাড়টাকে ভাল করে লক্ষ্য করে নিয়ে ওরা সেই ধস পেরোতে শুরু করল। অতর্কিতে ওপর থেকে কয়েকখানা পাথর পড়ল গড়িয়ে। লক্ষ্মণ সিং ও একজন স্থানীয় ঘোড়াওয়ালা সামান্য আহত হল। তাহলেও তারা

খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে লিলামের পুলিসব্যারাকে পৌঁছল সন্ধ্যের একটু আগে।

অনিমাদিকে নিয়ে কৃপাণবাবু যখন সেই মরণফাঁদের কাছে এলেন, তখনও বেশ দিনের আলো রয়েছে। জায়গাটার চেহারা দেখে ওঁরা তুজনেই একবার থমকে দাঁড়ালেন। একেবারেই চেনা যাচ্ছে না। সমস্ত পাহাড়টাই যেন টুকরো টুকরো হয়ে গড়িয়ে পড়তে চাইছে গৌরীগঙ্গার জলে। ওঁরা সাবধান হলেন। কৃপাণবাবু ভাল করে দেখে নিলেন পাহাড়টা। নাঃ, শান্ত ও স্থির। কোথাও একটি নুড়ি পর্যন্ত গড়াচ্ছে না। তাঁর দীর্ঘ পদযাত্রার অভিজ্ঞতা থেকে মনে হল, এখন পার হওয়া যেতে পারে। তবে পাশাপাশি নয়। পাশাপাশি চলা সম্ভব নয় সেখানে। অনিমাদি চললেন আগে আগে, কৃপাণবাবু তাঁর পেছনে।

কতটুকুই বা জায়গা। পেরোতে বড় জোর মিনিট পনেরো লাগে। ওঁরা ধীর পদক্ষেপে প্রায় তুই-তৃতীয়াংশ পেরিয়ে এলেন। কৃপাণবাবুর কি মনে হল, তিনি ঘড়ি দেখলেন—ছটা বেজে দশ। নাঃ, আলো থাকতেই লিলাম পৌঁছনো যাবে। আর মাত্র মাইল দেড়েক। কিন্তু পাহাড়ী পথে মাইলের হিসেব অচল। দেড় মাইল হলেও লিলাম ছিল বহুদূর। অনিমাদির জীবনের পদক্ষেপের বাইরে।

অতর্কিতে একটা প্রচণ্ড গর্জন প্রকম্পিত করে তুলল চতুর্দিক। কিছু বুঝে উঠতে পারার আগেই কৃপাণবাবুর চোখের সামনে সারা পৃথিবী তুলে উঠল। বেশ বড় একখানি পাথর বিত্যুৎবেগে লাফিয়ে পড়ল অনিমাদির ওপরে। তিনি নিঃশব্দে লুটিয়ে পড়লেন হিমালয়ের কোলে। হিমালয় নিঃসঙ্কোচে তাঁকে কাছে টেনে নিল চিরকালের মত। আর কোন দিন হিমালয়ের হাতছানি তাঁকে ব্যাকুল করে তুলবে না। তিনি আকুল হয়ে হিমালয়ের পথে পথে ছুটে বেড়াবেন না। হিমালয়ের সঙ্গে চিরমিলন হল তাঁর। মেজর জয়াল ও ম্যাডাম কোগানের নামের পাশে আর একটি নাম স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত হল—শ্রীমতী অনিমা সেনগুপ্তা!

কিন্তু অনিমাদি যে বলেছিলেন তিনি নিরাপদে ফিরে আসবেন আমাদের মাঝে? বিদায় বেলার সেই শেষ কথাটি কেন সত্য হল না তাঁর জীবনে?

তবে আমাদের জীবনে মিথ্যে হয় নি তাঁর বাণী। ফিরে না এলেও আমরা তাঁকে হারাই নি। তিনি আছেন আমাদের অন্তরে, প্রত্যেক হিমালয়-প্রেমিকের মাঝে। তিনি বেঁচে আছেন হিমালয়ের হিমানীতে, কমনীয়া কুমায়ুনের মাটিতে আর ভারতীয় পর্বতারোহণের ইতিহাসে।

॥ একুশ ॥

কখন যে একটা তুষারাবৃত প্রান্তরে নেমে এসেছি খেয়াল করি নি। খেয়াল হতে দেখি একটি স্বচ্ছ জলধারার সামনে দাঁড়িয়ে আছি। মনে হচ্ছে এই তুষারাবৃত প্রান্তরটি একটি জমাটবাঁধা নদী। আর এই জলধারাটি অচল নদীর সচল সংস্করণ।

লাফ দিয়ে জলধারা ডিঙ্গিয়ে এলাম। জলধারার পরেও বরফাবৃত প্রান্তর। কঠিন বরফ—ক্রমাগত পা পিছলে যাচ্ছে।

কিন্তু কয়েক পা এগোবার পরেই বরফের প্রকৃতি পালটে গেল। এখানে নরম তুষারের সমারোহ। প্রতি পদক্ষেপে পা তলিয়ে যাচ্ছে। রামচাঁদ বরফ পরীক্ষা করে করে এগিয়ে চলেছে। তারই প্রদর্শিত আঁকাবাঁকা পথে আমরা চলেছি এগিয়ে।

তুষারাবৃত প্রাঙ্গণ শেষ হল। আমরা আবার ওপরে উঠতে শুরু করলাম। আশ্চর্য এখানে একটুও বরফ নেই। পাথরও নেই বললেই চলে। কালো মাটির পাহাড়। মোটেই সুগম নয়। কর্দমাক্ত চড়াই পথ। দেহের ভারসাম্য বজায় রেখে আরোহণ করা কঠিন। ফলে আছাড় খাবার প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেছে আমাদের মধ্যে। আছাড়ে আছাড়ে সর্বাঙ্গ ব্যথা হয়ে যাচ্ছে। কালো কাদায় মাখামাখি হয়ে ভালুকের মত চেহারা হয়েছে সবার।

কিছুক্ষণ বাদে একটা বিরাট পাথরের প্রাচীর দেখতে পেলাম। একটু এগিয়ে বুঝলাম প্রাচীর নয়, পাহাড়। তবে এদিকটা একেবারে খাড়া উঠে গেছে। বীর বলে, "ওখানেই বাগুয়াবাসা।"

একে একে আমরা উঠে এলাম ধর্মশালার সামনে। একফালি আঙ্গিনা। সেখানে পড়ে আছে আমাদের কয়েকবোঝা জ্বালানি। কুলিরা কাল রেখে গেছে এখানে। পিঠ থেকে রুকস্যাক নামিয়ে সবাই বসে পড়ি এখানে-ওখানে।

পাথরের ওপরে পাথর সাজিয়ে বুকসমান উঁচু করা হয়েছে। তার ওপরে স্লেট পাথরের ছাউনি দিয়ে প্রণবানন্দ তৈরি করেছেন এই ধর্মশালা। ভেতরে জনছয়েক মানুষ কোনমতে শুয়ে থাকতে পারে। ১৪,৫০০ ফুট উঁচু এই দুর্গম স্থানে এ আবাসটি নির্মাণ করতে স্বামীজীকে অনেক দুঃখ কষ্ট সইতে হয়েছে।

যেসব যাত্রী তাঁবু ছাড়া রূপকুণ্ডে আসেন, তাঁদের কাছে অপরিহার্য এই

ধর্মশালা। তাঁরা ওয়ান থেকে শুকরি ও বাগচো হয়ে এখানে আসেন। এখান থেকে রূপকুণ্ড যাওয়া-আসা করেন। জায়গাটা প্রাকৃতিক দিক থেকে বড়ই নিরাপদ। পাশেই প্রবাহিত হচ্ছে একটি স্বচ্ছশীতল জলধারা। কে বলতে পারে এই ধর্মশালাটি না থাকলে হয়ত অনিমাদি প্রমাণ করতে পারতেন না যে মেয়েরাও রূপকুণ্ড দর্শন করতে পারে। মানব সেবাই তো মানুষের শ্রেষ্ঠ সাধনা। সাধক প্রণবানন্দকে প্রণাম করি।

রামচাঁদের ইচ্ছে আজ রাতটা আমরা এখানেই থাকি। কিন্তু আমাদের ইচ্ছে এগিয়ে যাই। বেলা যখন রয়েছে, তখন এখুনি যাত্রার যতি টানা অর্থহীন। আজ এক মাইল এগিয়ে থাকলে, কাল অনেক সুবিধে হবে। তাই গম্ভীর স্বরে অসিতবাবু রামচাঁদকে বলেন, "কুলিরা কিছু কিছু জ্বালানি মালের সঙ্গে বেঁধে নিক। কাল সকালে এসে ওরা বাকিটা নিয়ে যাবে। কাল তো ওদের কোন কাজ নেই।"

রামচাঁদ কুলিদের নির্দেশ দেয়। ওরা একে একে উঠে দাঁড়ায়। জল খেয়ে নিয়ে মালের সঙ্গে কিছু কিছু জ্বালানি বেঁধে নেয়। তারপরে আস্তে আস্তে চলা শুরু করে। আমরা ওদের অনুসরণ করি।

ধর্মশালার পাশ দিয়ে সেই পাহাড়টির গা ঘেঁষে সঙ্কীর্ণ পথ। পাহাড়টির নাম বলওয়া। কোথাও কোথাও আইস এক্স দিয়ে পথ ঠিক করে নিতে হচ্ছে। কখনও বা পাশের পাথর ধরে ধরে এগোতে হচ্ছে।

একজন কুলির পিঠ থেকে একটা কিট্ পড়ে গেল। চিন্তিত নেতার সঙ্গে চিন্তা করার জন্য আমারাও বসে পড়ি। চিন্তায় সমাধান হল না। তবে সর্বসম্মতিক্রমে সাব্যস্ত হল—যা যাবার তা গেছে, যা গেছে তার জন্য হা-হুতাশ না করে এখন এগিয়ে যাওয়াই সঙ্গত। আমরা এগিয়ে চলি।

চলতে চলতে থমকে দাঁড়াতে হয়। একটি ছাদহীন পাথরের ঘর। এখানে কার বাসা বাঁধার শখ হয়েছিল? সপ্রশ্ন নয়নে রামচাঁদের দিকে তাকাই। সে উত্তর দেয়, "রানীকা স্থলেরা।"

"রানী তো বুঝলাম, স্থলেরাটা কি?" মোহিত বলে।

"স্থলেরা শব্দের অর্থ আতুর ঘর। রানী কা স্থলেরা মানে রানীর আতুর ঘর।"

"কোথাকার রানী? তিনি কেনই বা এসেছিলেন এখানে?" সঙ্গে সঙ্গে সুজল প্রশ্ন করে।

রামচাঁদ বলে, "সে কথা শুনতে হলে বসতে হবে এখানে। দুর্গম পথ। গল্প করতে করতে চলা যাবে না। তা ছাড়া তাতে শুনতেও পাবেন না সবাই। সারি বেঁধে চলতে হচ্ছে যে।"

"তা একটু বসাই যাক না। কি বলুন অসিতদা?" দাশু নেতার অনুমতি চায়।

"বসলে যে দেরি হয়ে যাবে।" অসিতবাবু আপত্তি করেন।

ঘড়ি দেখে দেবকীদা বলেন, "মোটে চারটে বাজে। এখনও অনেক সময় আছে। আর কতক্ষণই বা লাগবে? ওরা যখন বলছে…।"

"ঠিক আছে।" নেতা অনুমতি দেন।

আমরা বসে পড়ি স্থলেরার সামনে। বেশ খানিকটা সমতল জায়গা রয়েছে। একটু দূরে একটি ঝরণা—ছিরনাগ। ইচ্ছে করলে এখানেও তাঁবু ফেলা যায়। কিন্তু বেলা যখন রয়েছে আমরা আরও এগিয়ে যাব।

স্থলেরার অঙ্গনে দুটি পাথরের বেদী রয়েছে। তারই একটির ওপর বসে পড়ে রামচাঁদ। সে কুলিদের এগিয়ে যেতে বলে। তারপর পকেট থেকে রেশমী রুমাল বের করে মুখ মোছে। রুমাল রেখে সিগারেট বের করে। সিগারেট ধরিয়ে একটা টান দিয়ে শুরু করে—সে প্রায় সাতশ বছর আগেকার কথা। কনৌজরাজ যশোদয়াল সিং সপরিবারে অংশ নিলেন নন্দাযাতে। আসন্নপ্রসবা রানী বল্লভা তাঁর সঙ্গী হলেন। বহু কষ্ট করে রাজা রানী এসে পৌছলেন এখানে এই গিমতলিতে। তাঁবু ফেলা হল। ইতিমধ্যে অগ্রবর্তী দল পৌছে গেছেন রূপকুণ্ডে। রাজারানীর মঙ্গল কামনা করে তাঁরা সেখানে লাটুদেবী ও নন্দাদেবীর পুজো দিয়েছেন। পরদিন সকালে তাঁরা এগিয়ে যাবেন হোমকুণ্ডে, রাজা-রানী যাবেন রূপকুণ্ডে।

সহসা রানীর প্রসববেদনা শুরু হল। রাজার সঙ্গীরা তাড়াতাড়ি পাথর দিয়ে তৈরি করলেন এই স্থলেরা। গভীর রাতে রানী সন্তান প্রসব করলেন।

তুষারতীর্থ কলুষিত হল। লাটুদেবী রুষ্টা হলেন, নন্দাদেবী হলেন ক্রুদ্ধা। আরম্ভ হল বজ্রপাত—প্রচণ্ড তুষারঝড়। রূপকুণ্ডের তাঁবু উড়ে গেল। গিমতলির স্থলেরা ভেঙ্গে পড়ল। পাত্র-মিত্র-অমাত্যসহ সপরিবারে শহীদ হলেন যশোদয়াল। রূপকুণ্ড পরিণত হল মরণহ্রদে।

বাগুয়াবাসা থেকে যে পাথরের প্রাচীর শুরু হয়েছিল, রানীকা স্থলেরায় এসেই তা শেষ হয়ে গেল। প্রাচীরের শেষে একটি বিস্তীর্ণ প্রান্তর—তুষারাবৃত।

আর সেদিকে নজর পড়তেই উপেনবাবু যেন পাগল হয়ে গেলেন। তিনি বলতে থাকলেন, "Saussuri Graminifolia…হেমকমল, ফেণকমল, ব্রহ্মকমল! তা ছাড়া ঐ যে Rheum herb, দেখুন না কি সুন্দর অথচ কত বড় বড় লাল পাতা। আর ঐ দেখুন, কত বিচিত্র ধরনের Delphinium—কোথাও দেখি নি। এক জায়গায় এমন সমারোহ আমি আর দেখি নি।"

মিথ্যে বলেন নি উপেনবাবু। তুষারাবৃত প্রান্তরে যেন পারিজাতের মেলা বসেছে। সত্যই পাগল হবার মত দৃশ্য।

কিন্তু আমরা এগিয়ে যাব কেমন করে? পারিজাত যে পথরোধ করেছে! ডাইনে বাঁয়ে, সামনে পেছনে কেবল ফুল আর ফুল। ফুল ছাড়া যে আর কিছুই নেই এখানে। ফুল না মাড়িয়ে পথ চলার উপায় নেই। অথচ উপেনবাবু বার বার সাবধানে করেছেন, "দেখবেন ফুল নষ্ট করবেন না যেন।"

এমন সুন্দর ফুল, কে চায় নষ্ট করতে? কিন্তু না করেই বা উপায় কি? তবু যতটা সম্ভব সাবধানে পথ চলেছি। চলতে চলতে পারিজাতের সৌরভে আকুল হচ্ছি। তাদের স্বর্গীয় সৌন্দর্যে ব্যাকুল হচ্ছি।

বেশ কিছুক্ষণ চলার পরে ফুল কমে এল। এখানটা অপেক্ষাকৃত অসমতল। কারণ ত্রিশুলের গা থেকে কয়েকটি সঙ্কীর্ণ গিরিশিরা পাশাপাশি নেমে এসেছে এখানে। একে একে তাদের অতিক্রম করছি আমরা। দুটি গিরিশিরার মাঝে বয়ে যাচ্ছে একটি ঝরণা। ঝরণা ডিঙিয়ে ওপরে উঠেছি আমরা।

খানিকটা উঠেই আবার একটি তুষারাবৃত প্রান্তর। আবার তেমনি ব্রহ্মকমল, ফেণকমল ও হেমকমলের মেলা। আবার সাবধান করেন উপেনবাবু। আবার তেমনি দেখে দেখে পথ চলা।

এ প্রান্তরটি আগেরটির চাইতে বিশালতর, কাজেই ফুলবনও বৃহত্তর। যেখানে একটু সমতল, সেখানেই বরফ। আর যেখানে বরফ, সেখানেই পারিজাত।

যেখানে বরফ নেই, সেখানে পারিজাত নেই। কিন্তু পাথরের ফাঁকে ফাঁকে ফুটে আছে নানা রঙের ছোট ছোট ফুল। পারিজাত বনে ঠাঁই পায় নি ওরা, কিন্তু পালিয়ে যায় নি অমরাবতী থেকে। অমরাবতী? হ্যাঁ এই তো অমরাবতী।

মনে মনে ধন্যবাদ জানাই রামচাঁদকে। সে আমাদের নিয়ে এসেছে এখানে। নিয়ে এসেছে রূপকুণ্ডের উপকণ্ঠে—হুনিয়াথরে।

আহা! এমন রমণীয় স্থানের কি কুৎসিত নাম, আচ্ছা এর কি একটা নতুন নাম রাখা যায় না? খুব যায়। যেমন রূপনগর। রূপকুণ্ডের উপকণ্ঠে রূপগঙ্গার তীরে আমরা যে বসতি স্থাপন করলাম, তাকে রূপনগর ছাড়া আর কি বলতে পারি?

আমাদের তিনদিকে খাড়া পাহাড়। একদিক আস্তে আস্তে নিচু হয়ে গিয়ে সেই ময়দানে মিশেছে। তার বুক চিড়ে বয়ে যাচ্ছে রূপগঙ্গা। ত্রিশুলের তুষার বিগলিত ধারা চলেছে মর্ত্যের মানবের মুক্তিধারায় পরিণত হতে।

ত্রিশুলকে আমরা দেখেছি বহু জায়গা থেকে। দেখেছি রানীক্ষেত, বিনসর, কৌসানী ও গোয়ালদাম থেকে। কিন্তু এ যেন সে ত্রিশুল নয়। সেখান থেকে যাকে মনে হয়েছে শান্ত ও সুন্দর, এখানে সে অশান্ত। তবে সুন্দর বৈকি—পরমসুন্দর। সে যে সত্য ও সুন্দরের প্রতীক।

আমরা এসেছি ত্রিশুল শিখরের দক্ষিণ দিকে, ঠিক শিলিসমুদ্র হিমবাহের নিচে। এই হিমবাহের উত্তর থেকে সৃষ্ট হয়েছে নন্দাকিনী আর দক্ষিণ থেকে রূপগঙ্গা। নন্দাকিনী ত্রিশুল পর্বতের পশ্চিম দিক দিয়ে প্রবাহিত হয়ে, নন্দপ্রয়াগে গিয়ে মন্দাকিনীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। আর রূপগঙ্গা শিলিসমুদ্রের দক্ষিণ প্রান্ত থেকে সৃষ্ট হয়ে ওই প্রান্তরকে প্লাবিত করে নেমে গেছে দক্ষিণে, সুতোলগাঁয়ে গিয়ে নন্দাকিনীতে মিলেছে।

রূপময়ী রূপগঙ্গা। স্বচ্ছ কিন্তু শীর্ণা, সদাচঞ্চলা কিন্তু গর্জনশীলা নয়। আঁকাবাঁকা একটি রুপোলী রেখা। প্রান্তরকে বিধৌত করে বাঁয়ে বাঁক নিয়েছে —অদৃশ্য হয়েছে।

পারিজাত বনেই তাঁবু ফেলার প্রস্তাব করল রামচাঁদ। আর সঙ্গে সঙ্গে আঁতকে উঠলেন উপেনবাবু, "সেকি! তাহলে যে ফুল কেটে ফেলতে হবে!"

"তাছাড়া উপায় কি? এখানে তো সর্বত্রই ফুল।"

যুক্তি মানতে চান না উপেনবাবু। বলে ওঠেন, "না না, এ ঠিক হচ্ছে না। হিমালয়ের অমূল্য সম্পদ এই সব ফুল। এ সম্পদ নষ্ট করা পাপ।"

কথাটা মিথ্যে নয়। এই দুষ্প্রাপ্য কুসুমদলকে দলন করা নেহাতই নিষ্ঠুরতা। কিন্তু এদের না কেটে যে তাঁবু ফেলা সম্ভব নয়। উপেনবাবুকে আবার বোঝাতে চেষ্টা করি। কিন্তু তিনি অবুঝ। বিরক্তকণ্ঠে বলেন, "এ জানলে আমি বাগুয়াবাসাতেই রাত কাটাতাম।"

যত পাপই হোক, শেষ পর্যন্ত সেই পারিজাত বন কেটে বসত হল। তবে

হিসেব করে করে তাঁবু ফেললাম। যত কম ফুল কেটে পারা যায়। ফুলগুলি কিন্তু ফেলে দিলাম না। এয়ার ম্যাট্রেস ফুলিয়ে তার চারিদিকে সাজিয়ে রাখলাম। কিছুক্ষণ বাদেই পূর্ণিমার চাঁদ উঠবে আকাশে। রূপনগর রূপান্তরিত হবে অমরাবতীতে। ফুলশয্যার এমন সুযোগ আর আসবে না জীবনে।

বাইরে বেরুতে গিয়ে দেখি কাচা পেঁপের বিচির মত অজস্র ধারায় তুষারকণা ঝড়ছে। আর তারই মধ্যে বীর কফির কেট্‌লী নিয়ে এক তাঁবু থেকে আর এক তাঁবুতে ছুটোছুটি করছে। এর মধ্যে কখনই বা সে স্টোভ ধরালো আর কখনই বা কফি বানালো! তবে এখন আমাদের কফির বড়ই প্রয়োজন। বীর তা জানে বলেই কফির কেট্‌লী নিয়ে এদিকে আসছে।

রুকস্যাক থেকে মগ বের করে বীরের কাছ থেকে কফি নিই। তাকে ধন্যবাদ দিই। সে মুচকি হেসে পাশের তাঁবুতে চলে যায়।

গরম কফি খেয়ে শরীরে বল পেলাম। বেরিয়ে এলাম বাইরে। তুষারকণা এখনও ঝরছে। ঝরছে মুষলধারায়। ইতিমধ্যেই তাঁবুর ওপরে তুষার সঞ্চিত হয়েছে। তুষারপাতের মধ্যে পায়চারি করতে ভালই লাগছে।

কয়েক মিনিটের মধ্যে তুষারপাত কমে এলো। যেমন অতর্কিতে আরম্ভ হয়েছিল, তেমনি শেষ হয়ে গেল। এখানে এমনই হয়। এখন আকাশ মেঘমুক্ত, ত্রিশুল কুয়াশামুক্ত আর আমাদের দেহ ও মন অবসাদমুক্ত।

এখানে আবহাওয়ার কোন স্থিরতা নেই। কাল কেমন থাকবে, কেউ বলতে পারে না। এখন যখন ভাল করে দেখা যাচ্ছে চারিদিক, তখন ছবি নিয়ে নিলে কেমন হয়?

ভালই হয়। আমার প্রস্তাব সবাই সমর্থন করে। ক্যামেরা বের করে কিছুক্ষণ ধরে ছবি নিলাম চারিদিকের।

ছবি তোলার পরে শুরু হল খেলা—বল খেলা। রাবার বা চামড়ার বল নয়, বরফের বল। পা দিয়ে নয়, হাত দিয়ে খেলছি আমরা। বরফের বল বানিয়ে একে অন্যের গায়ে ছুঁড়ে মারছে। যে যাকে কাছে পাচ্ছে তার গায়ে ছুঁড়ছে। কেবল সুজলের লক্ষ্য এক ও অভিন্ন—অসিতবাবুর ভুঁড়ি।

কিছুক্ষণ বাদে কেন যেন কথাটা খেয়াল হয় দাশুর। সে তাড়াতাড়ি তাঁবুতে গিয়ে থার্মোমিটারটা নিয়ে আসে। আর আনতেই আমাদের আক্কেল গুড়ুম—উত্তাপ ছাব্বিশ ডিগ্রি ফারেনহিট্‌।

ইতিমধ্যে আকাশটা আরও পরিষ্কার হয়ে গেছে। মেঘ আর কুয়াশার

শেষ চিহ্ন গেছে মুছে। এমন সুনীল আকাশ বহুদিন দেখি নি। আকাশ তো নয়, যেন চন্দ্রাতপ। সে এসেছে নেমে, একেবারে আমার হাতের নাগালের মধ্যে। এখানে দাঁড়িয়ে কার সাধ্য বলে আকাশ অসীম, আকাশ অনন্ত, আকাশ আমাদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।

অস্তাচলগামী সোনালী সূর্যের শেষ শিখা এসে আছাড় খেয়ে পড়েছে আমাদের তাঁবুর ওপরে, রূপনগরের রূপোলী প্রান্তরে আর অনতিদূরের ঐ নন্দাঘুন্টি ও ত্রিশুলের তুষারশুভ্র শরীরে। কেউ যেন মুঠো মুঠো আবীর দিয়েছে মাখিয়ে। সে আবীরের ছিটেফোঁটা এসে পড়েছে আমাদের চারিপাশে—রূপনগরে আর তার পারিজাত বনে।

আস্তে আস্তে শেষ শিখা গেল মিলিয়ে। আবীর গেল মুছে। আঁধার নেমে এল রূপনগরে, নন্দাঘুন্টি আর ত্রিশুলে। আঁধার নেমে এল আমাদের তাঁবুতে তাঁবুতে।

অমিতাভ আবার থার্মোমিটার বের করল। না, তার অনুমান মিথ্যে নয়। সত্যই উত্তাপ কমে যাচ্ছে। দু ঘণ্টায় দু ডিগ্রি কমে গেছে। এ হারে কমতে থাকলে তো কাল সকালে······?

আমাদের মনের উত্তাপ কিন্তু একটুও কমে নি। নইলে আমরা এখনও তাঁবুর বাইরে কেন?

না থেকে যে উপায় নেই। রূপনগরের আকাশে চাঁদ উঠেছে। আলোর বন্যা নেমেছে। চাঁদের হাসির বাঁধ গেছে ভেঙ্গে।

আকাশের দিকে তাকাই। রাতের আকাশ, কিন্তু তার নীলিমা মুছে যায় নি। সাদা সাদা কয়েকখানি মেঘ মহানন্দে আকাশের বুকে ছুটোছুটি করছে। কয়েকটি তারা এখানে ওখানে উঁকি দিচ্ছে। লাল তাদের রং। নীলচন্দ্রাতপের ওপরে লাল কয়েকটি বুটি।

পাহাড়ের দিকে তাকাই। ত্রিশুল ও নন্দাঘুন্টি। তুষার নয়, এ যেন শ্বেতপাথরের সীমাহীন সৌন্দর্য। চাঁদের আলো তাদের ওপর আছাড় খেয়ে চারিদিকে প্রতিফলিত হয়েছে। আর তাই এখানে এমন আলোর বন্যা।

মাটির দিকে তাকাই। মাটি বলেই মনে হচ্ছে এখন। চাঁদের হাসি উঁচু-নিচুর ব্যবধান দিয়েছে ঘুচিয়ে। সকল অসাম্য দূর করে সাম্য এনেছে এই অসমতল প্রান্তরে। গিরি-কান্তারে সমতলের সৌন্দর্য এনে তার ভয়াবহতা দিয়েছে দূর করে।

এখান থেকে এখন বহু দূর অবধি দেখা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে কৈলু বিনায়ক। ওদিকে তাকালে মনে হয় আমরা একটা সুবিরাট স্টেডিয়ামে বসে খেলা দেখছি। আকাশ পাহাড় আর মাটির মাঝে খেলা চলেছে। চাঁদ তারা আর মেঘ, নন্দাঘুন্টি আর ত্রিশুল, রূপগঙ্গা পারিজাত আর এই প্রান্তর, সবই এ খেলায় অংশ নিয়েছে। আমরা কেবল নীরব দর্শক।

আমাদের পেছনে খাড়া পাহাড় উঠে গেছে ওপরে। নিচের দিকে মসৃণ গ্রানাইট পাথর। তাই তেমন তুষার জমতে পারে নি। কিন্তু ওপরের দিকে যেখানে তুষার জমে আছে, সেখানেও মাঝে মাঝে কালো কালো পাথর জেগে রয়েছে। আমাদের সামনে অনেক উঁচুতে দুটি সাদা-কালো টিলা। দুই টিলার মাঝখানে একটি তুষারাবৃত প্রান্তর। ঐ প্রান্তরের পেছনেই রূপকুণ্ড।

যে পর্বতশিখর থেকে ভারতীয় পর্বতারোহণ আরম্ভ হয়েছে, সেই শিখরের সানুদেশে এসেছি আজ। ত্রিশুল থেকেই শুরু হয়েছে আমাদের পর্বতারোহণের ইতিহাস। প্রবীণ পর্বতারোহী শ্রীগুরুদয়াল সিং সেই অভিযানের নেতৃত্ব করেন। সহযাত্রী রয় ডি. গ্রীনউড ও শেরপা দাওয়া থাণ্ডুপকে নিয়ে নেতা ১৯৫১ সালের ২১শে জুন ২৩,৩৬০ ফুট উঁচু ত্রিশুল-১ শিখরে আরোহণ করেন। ভারতীয় পর্বতারোহীরা আরও দুবার ত্রিশুল শিখরে জাতীয় পতাকা প্রোথিত করেছেন। একবার দিনে—সূর্যের আলোয়, একবার রাতে—চাঁদের আলোয়।

এখান থেকে রূপগঙ্গাকে বড়ই ছোট মনে হচ্ছে। ছোট মনে হচ্ছে এই গিরি-কান্তারকে। তবে মাঝে মাঝে যখন হিমেল হাওয়ার ঝাপটা এসে গায়ে বিঁধছে, তখনই মনে পড়ছে ওরা সবাই অসীমের অংশীদার। ছোট আমরা—আমরা মর্ত্যের মানুষ।

কুলিদের তাঁবু থেকে সমবেত সঙ্গীতের শব্দ আসছে ভেসে। কাল সকালে রওনা হয়ে রূপকুণ্ড দর্শন করে বিকেলে আমরা ফিরে আসব এখানে। কয়েকজন কুলি কেবল যাবে আমাদের সঙ্গে। বাকি সকলে এখানে থাকবে। বিশ্রাম নেবে। আজ ওদের 'উইক এণ্ড'। তাই মৌজ করে গান গেয়ে নিচ্ছে। গান গাইতে খরচ হয় না। কিন্তু আনন্দের এমন উপকরণ আর নেই। তা ছাড়া গান গাইবার এ রকম আদর্শ স্থান যে বিশ্বসংসারে খুব কমই আছে।

এমন পরিবেশে এমনি আলো ঝলমল রাত মানুষের জীবনে বেশি আসে না। আসে নি আমাদের অনেকেরই জীবনে। তাই আমরা রামচাঁদের নির্দেশ

অমান্য করে, দুঃসহ শীত উপেক্ষা করে বসে আছি বাইরে। দেখছি স্ফটিকময় হিমালয়ের সীমাহীন সৌন্দর্য, তার অনিন্দ্যসুন্দর অনন্ত রূপ।

রূপের নেশায় বিভোর হয়ে কতক্ষণ বাইরে বসেছিলাম, খেয়াল নেই। খেয়াল হতে দেখি, আর কেউ নেই। আমি একা। সবাই শীতের জন্য তাঁবুতে চলে গেছে। আমিও ফিরে চলি তাঁবুতে। আজ দাশু আমার তাঁবুর সঙ্গী।

তাঁবুতে এসে দেখি দাশু স্লিপিং ব্যাগের ভেতরে। হাসতে হাসতে বলি, "কখন কেটে পড়লে, আমাকে একা ফেলে?"

দাশু নিরুত্তর। সে কি ঘুমিয়ে পড়ল নাকি? এয়ার ম্যাট্রেসের ওপরে বসে আবার বলি, "দাশু ঘুমোচ্ছ নাকি, দাশু…"

"এ্যা,…না। না না, ঘুমোইনি। আপনি কখন এলেন?"

"এই তো একটু আগে।" জুতো খুলে আমিও স্লিপিং ব্যাগের মধ্যে ঢুকে পড়ি। সত্যই বড্ড শীত লাগছে।

দাশু আবার নীরব। বলি, "শীতের জন্য চুপ করে আছো, না ঘুম পেয়েছে?"

"কোনটাই নয়।" দাশু একবার থামে। তারপরে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলে "এখানে আসার পর থেকে কেন যেন আমার বার বার বিঠল-গোয়ারের কথা মনে পড়ছে, মনে পড়ছে অনিমাদির কথা।"

"খুবই স্বাভাবিক। আমি সেবার তোমাদের সঙ্গী হতে পারি নি। কিন্তু অনিমাদির কথা আমারও মনে পড়ছে বৈকি। শুধু অনিমাদি কেন, ম্যালোরী ও আর্ভিন থেকে গৌরাঙ্গ ও অমর পর্যন্ত প্রত্যেকের কথাই আজ মনে পড়ছে।"

দাশু কোন কথা বলে না, আমিও চুপ করে থাকি। ভাবতে থাকি ভারতীয় পর্বতারোহণের কথা, গৌরাঙ্গ চৌধুরী ও অমর রায়ের কথা।

ভারতীয় পর্বতারোহণ আজ আর অবহেলার সামগ্রী নয়। বিশ্বের যে সব দেশে পর্বতারোহণের প্রচলন আছে, ভারত তাদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ। ভারতীয় পর্বতারোহণ শুরু হয়েছে মাত্র পনেরো বছর আগে। কিন্তু ইতিমধ্যেই বিশ্বের উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গ এভারেস্ট (২৯,০২৮´) সহ বিশ হাজার ফুটের চেয়ে উঁচু, বত্রিশটি হিমালয় শিখরে আমরা ভারতের জাতীয়পতাকা প্রোথিত করেছি।

ভারতীয় পর্বতারোহণে বাঙ্গালীর দানও সামান্য নয়। ভারতের প্রথম বে-সরকারী ও উচ্চতম বেসরকারী অভিযান পরিচালিত হয়েছে বাংলা দেশ

থেকে। প্রথমটি নন্দাঘুণ্টি অভিযান আর উচ্চতমটি মানা অভিযান। গত সাত বছরে বাংলা দেশ থেকে এগারটি পর্বতাভিযান আয়োজিত হয়েছে—নন্দাঘুণ্টি (২০,৭০০´)-১৯৬০ ; নন্দাখাত (২১,৬১০´) ও মানা (২৩,৮৬০´)-১৯৫৯ ; নীলগিরি (২১,২৬৪´)-১৯৬২ ; কাবরুডোম (২১,৬৫০´), দেও দেখানি (২০,২৬০´)-১৯৫৯ ; ত্রিশুলী (২৩,২১০´)-১৯৬০ ; মানা, যুগল মানা (২২,২৯০´) ত্রিশুলী ও ভাগীরথী-২ (২১,৩৬৪´)- ১৯৬০। এর অধিকাংশ অভিযানই সফল হয়েছে। এ ছাড়াও বাঙ্গালী অভিযাত্রী ফ্লাঃ লেঃ এ. কে. চৌধুরী, ক্যাপ্টেন দাস, ক্যাপ্টেন চক্রবর্তী, ভানু ব্যানার্জি ও অমূল্য সেন বিভিন্ন বিদেশী ও সর্ব-ভারতীয় অভিযানে অংশ নিয়ে সাফল্য অর্জন করেছেন। এক কথায় পৃথিবীর পর্বতারোহণের ইতিহাসে বাঙ্গালী তার নিজের আসনটি সুপ্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছে।

এই প্রতিষ্ঠা অর্জনের জন্য কিন্তু কম মূল্য দিতে হয় নি আমাদের। দুঃখ কষ্টের কথা ভাবছি না। কারণ দুঃখজয়ী না হলে, পর্বতারোহী হওয়া যায় না। সকল প্রকার দৈহিক কষ্টের উর্ধ্বে না উঠতে পারলে, হিমালয় পথের পথিক হওয়া যায় না। আমি ভাবছি চরম মূল্যের কথা, শহীদ হবার কথা। এ পর্যন্ত হিমালয়কে আমাদের তিনটি প্রাণ ডালি দিতে হয়েছে। সেই তিন মহাপ্রয়াণের কথাই আমি ভাবছি।

হিমালয়ের পথে প্রথম শহীদ হয়েছেন অনিমাদি। অনিমাদির পরে আমরা হিমালয়ে হারিয়েছি গৌরাঙ্গ চৌধুরীকে, আমাদের সোনার-গৌরাঙ্গকে। গৌরাঙ্গর আদি নিবাস বরিশালে। অনিমাদির মত সেও ছিল পিতামাতার প্রথম সন্তান। লেখাপড়ায় খারাপ ছিল না। সময় মতই আই. এ পাস করেছিল। ছোটবেলা থেকে সে ছিল ডানপিটে দুঃসাহসী। কলেজের এন. সি. সি-তে ছিল একজন পাণ্ডা। এন. সি. সি-র ক্যাডেট হিসেবে দার্জিলিং থেকে বেসিক মাউণ্টেনিয়ারিং ট্রেনিং নিয়ে আসে গৌরাঙ্গ। তার পরেই হিমালয়ের নেশা পেয়ে বসে তাকে। ১৯৬০ সালে গাড়োয়ালের সপ্তশৃঙ্গ শিখরে ও নীলগিরি পর্বতে বিশ হাজার ফুট পর্যন্ত আরোহণ করে। ১৯৬০ সালে মানা অভিযানে প্রায় ২২,০০০ ফুট পর্যন্ত ওঠে। ১৯৬০ সালে নওয়াং গমবুর সঙ্গে বদ্রীনাথের নারায়ণ পর্বত শিখরে আরোহণ করে।

সাংসারিক প্রয়োজনে গৌরাঙ্গকে চাকরি নিতে হয়। কিন্তু কেবল অফিস আর বাড়ি নিয়ে ব্যস্ত থাকার ছেলে নয় সে। গৌরাঙ্গ পড়াশুনা শুরু করে

১৯৬০ সালে বি. এ. পরীক্ষা দেয়। পরীক্ষায় পাস করেছিল গৌরাঙ্গ কিন্তু সে সুসংবাদ শুনে যেতে পারে নি।

পরীক্ষার পরই আবার হিমালয়ের নেশায় পেয়ে বসে তাকে। কম তো নয়, তিন-তিনটা বছর হিমালয়ের হিমেল হাওয়া লাগে নি তার গায়ে, তুষার-ধবল পথে পা ফেলে নি সে। তাই পরীক্ষার পরেই পুণার ডাক্তার জি. আর. পট্টবর্ধনের সঙ্গে গঙ্গোত্রী-১ (২১,৮৯০´) শিখরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে গৌরাঙ্গ।

এ অভিযানের খুব সামান্য সংবাদই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। যা প্রকাশিত হয়েছে তাও গৌরাঙ্গ নিখোঁজ হবার পরে। গৌরাঙ্গ নিখোঁজ হবার সময় তার সঙ্গে মিনজুর নামে একজন শেরপা ছিল। মিনজুর এই দুর্ঘটনার একমাত্র সাক্ষী।

মিনজুর বলেছে—গঙ্গোত্রী-১ অভিযানে তাদের তিন নম্বর শিবির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল প্রায় ১৯,০০০ ফুটে। পুরোহিত, মিনজুর ও আর একজন শেরপাকে নিয়ে গৌরাঙ্গ ৮ই জুন (১৯৬৫) এই শিবির স্থাপিত করে। ১০ই জুন তারা ১৯,০৯০ ফুট উঁচু নিকটবর্তী রুদ্রগৌরী শৃঙ্গে আরোহণ করে। তারপরে পুরোহিত নেমে আসে নিচে। শেরপাদের সঙ্গে গৌরাঙ্গ থেকে যায় সেখানে—গঙ্গোত্রী শিখরের পথ তৈরি করতে থাকে। ১৮ই জুন বিকেলে চশমা খুলে কাজ করবার সময় গৌরাঙ্গ চোখে একটা ব্যথা বোধ করে। সঙ্গী শেরপাও অসুস্থ হয়ে পড়ে। মিনজুর সঙ্গী শেরপা ও গৌরাঙ্গকে নিয়ে নিচে চলে যেতে চায়। গৌরাঙ্গ রাজী হয় না। শেরপারা নেমে আসে নিচে। তুষার-অন্ধ হয়েও সেই তুষারবৃত শিবিরে একা পড়ে থাকে গৌরাঙ্গ। পরদিন মিনজুর গৌরাঙ্গের জন্য ওষুধ নিয়ে ফিরে আসে শিবিরে। এসে দেখে গৌরাঙ্গর চোখের অবস্থা বেশ ভাল।

পরদিন সকালে উঠেই গৌরাঙ্গ মিনজুরকে বলে, তার চোখ ভাল হয়ে গেছে। সে শিখরের দিকে এগিয়ে যেতে চায়।

মিনজুর বাধা দেয়। বলে, 'সঙ্গে মাত্র দেড়শ ফুট দড়ি আছে। এতটুকু দড়ি নিয়ে দুজনে উঠব কেমন করে? তা ছাড়া আপনি এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ নন। তাই ওপরে না গিয়ে, চলুন আমরা নিচে নেমে যাই।'

গৌরাঙ্গ রাজি হয় না। বলে, 'নেমে গেলে সবাই আমাদের কাপুরুষ বলবে। বলবে আমরা ভয় পেয়েছি। আমার চোখের জন্য কোন চিন্তা করো না তুমি। চোখ আমার বেশ ভাল আছে। তবে দড়ির সমস্যাটা উপেক্ষা করবার

মত নয়। তুমি বরং একটু অপেক্ষা করো এখানে। আমি একবার সেই বিপজ্জনক জায়গাটার একটা ছবি নিয়ে আসি। দেখে আসি, শিখরের অন্য কোন পথ পাওয়া যায় কিনা। আমি আধ ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসছি।'

সে আধ ঘণ্টার আজও শেষ হয় নি, কোনদিন হবে না। ১৯৬০ সালের ২১শে জুন সকাল ছটার সময় কাঁধে ক্যামেরা ও হাতে আইস এক্স নিয়ে গৌরাঙ্গ সেই যে শিবির থেকে বেরিয়ে গেছে, আর সে ফিরে আসে নি। আর্ভিন ও ম্যালোরীর মত গৌরাঙ্গ চৌধুরীও চিরদিনের মত হিমালয়ে হারিয়ে গেছে। তবে তাঁদের মত তাকেও চিরকাল খুঁজে পাওয়া যাবে পর্বতারোহণের ইতিহাসে, পাওয়া যাবে দুঃসাহসী ভারতীয় তরুণদের তালিকায়।

গৌরাঙ্গর পরে আমরা হারিয়েছি অমর রায়কে। অমরের পৈতৃক নিবাস যশোহর জেলার বিনোদপুরে। অনিমাদি ও গৌরাঙ্গর মত অমরও পিতা-মাতার জ্যেষ্ঠ সন্তান। তবে প্রথম সন্তান নয়। তার আগে দুটি ভাই হয়ে মারা যায়। তাই বাপ-মা নাম রেখেছিলেন অমর। বোধ করি বুঝতে পেরেছিলেন, তাঁদের নামকরণ মিথ্যে হবে না। অমর সত্যই অমর হয়েছে। আজ তার সেই অমরত্বলাভের কথাই ভেবে চলেছি।

লেখাপড়ায় অমর মোটামুটি মন্দ ছিল না ছোটবেলায়। কিন্তু খেলাধূলায়, নৌকা টানায় তার জুড়ি পাওয়া যেত না। ১৯৫৬ সালে আই. কম পাস করে অমর কলকাতা কর্পোরেশনের চাকরিতে ঢোকে। পরে সে প্রাইভেটে বি. কম পাস করে আইন পড়া শুরু করেছিল। কলেজ স্পোর্টস ও স্বাস্থ্যশ্রী প্রতিযোগিতায় অমর অনেক পুরস্কার পেয়েছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় রোয়িং ক্লাবের সে ছিল একজন নামকরা সদস্য। নৌকা টানায় বহুবার পুরস্কার পেয়েছে অমর। এই রোয়িং ক্লাবেই অমূল্য সেনের সঙ্গে অমরের পরিচয় হয়। অমূল্যর কাছে হিমালয়ের গল্প শুনে অমর পর্বতাভিযানে উৎসাহিত হয়। তারই পরামর্শে বেসিক মাউন্টেনিয়ারিং ট্রেনিং নিতে দার্জিলিং যায়। তার পরেই সুজিত বসু তাকে চতুরঙ্গী অভিযানে যোগদান করার আমন্ত্রণ জানায়। পর্বতাভিযানের আমন্ত্রণ যে কোন পর্বতারোহীর পরম পুরস্কার। অমর সানন্দে সম্মত হয়। যশোহর নিবাসী বৃদ্ধ পিতার কাছে অভিযানে যোগ দেবার অনুমতি চেয়ে পাঠায়। পিতা নিষেধ করেন না, তবে পর্বতাভিযানের বিপদ সম্পর্কে পুত্রকে সতর্ক করে দেন। হয়তো বা পিতার মনে কোন আশঙ্কা দেখা দিয়ে থাকবে। কিন্তু তিনি জানতেন, দুঃসাহসী

পুত্রের জনক হলে সে সব আশঙ্কাকে আমল দিতে নেই। কারণ শাস্তি যা পাবার, তা পেতেই হবে। অনিমাদি ও গৌরাঙ্গর বৃদ্ধ পিতাদের সঙ্গে সেই একই শাস্তি ভোগ করছেন তিনি। তবে বীর সন্তানের জনক হতে পারা পরম সৌভাগ্য। সেদিক থেকে সৌভাগ্যবান তাঁরা।

এ অভিযানেরও কোন বিশদ বিবরণ বের হয় নি। কিন্তু তাতে অমর আর তার সহযাত্রীদের আত্মদানের মূল্য কমে যায় নি। খবরে প্রকাশ—চতুরঙ্গী অভিযাত্রীরা ১০ই অক্টোবর (১৯৬০) মূল শিবির স্থাপিত করে। তারা প্রথমে শতপন্থ শিখরে অভিযান চালায়। কিন্তু দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া ও তুষারপাতের জন্য সে অভিযান পরিত্যক্ত হয়। তারপরে তারা অপরাজিত ভাগরথী-২ শিখর অভিমুখে অভিযান শুরু করে। ২২শে অক্টোবর সকালে অমর রায়, গোবিন্দরাজ, শেরপা গিয়ালবু ও কারমা শেষ শিবির থেকে ভাগীরথী শিখরে যাত্রা করে। বিকেল পাঁচটার সময় তারা শিখরে পৌঁছয়। যে দুর্গম পর্বত-শৃঙ্গ বিগত ৩৫ বছরে বহু বিদেশী অভিযাত্রীদের ফিরিয়ে দিয়েছে, সেই অপ-রাজিত পর্বতশিখরে ভারতের জাতীয় পতাকা প্রোথিত করে দুঃসাহসী বাঙ্গালী তরুণ অমর রায়। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের। ভাগীরথী যে জয়মাল্য পড়িয়ে দিয়েছে তাকে, সে জয়মাল্য তার হাত থেকে গ্রহণ করতে পারি নি আমরা। অমর আর ফিরে আসে নি আমাদের মাঝে।

অভিযাত্রীরা আধ ঘণ্টা শিখরে অতিবাহিত করে নামতে থাকে নিচে। আঁধার আসে ঘনিয়ে, হাওয়ার বেগ ওঠে বেড়ে, শুরু হয় তুষারপাত। খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে সাবধানে নামতে থাকে তারা। একই দড়িতে বাঁধা চারজন, গিয়ালবু অমর গোবিন্দরাজ ও কারমা। হঠাৎ কারমার পা ফসকায়। সে ছিল সবার পেছনে। পেছনের আকস্মিক টানে সামলে নেবার অবসর পায় না সামনের অভিযাত্রীরা। কঠিন খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে গড়িয়ে পড়ে সকলে। পড়ে প্রায় তিন হাজার ফুট নিচে একটা গভীর খাদের মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে শহীদ হয় অমর। তারপরে গিয়ালবু। পরদিন কারমা। গোবিন্দরাজ সাংঘাতিক ভাবে আহত হয়েও বেঁচে যায় শেষ পর্যন্ত। ভারতীয় পর্বতা-রোহণের বৃহত্তম দুর্ঘটনার সাক্ষী সে। দুর্গম ভাগীরথী শিখর বিজয়ের একমাত্র জীবিত অভিযাত্রী।

বাঙ্গালী ছেলেমেয়েদের ঘরকুনো দুর্নাম ঘুচিয়ে, পৃথিবীর পর্বতারোহণের ইতিহাসে যারা ভারতের নাম সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে, নিজেদের জীবনের দীপ-

শিখা দিয়ে যারা কোটি মানুষের জীবনে সাহসের আলো জ্বালিয়েছে, তাদের মৃত্যুহীন প্রাণকে প্রণাম করি।

॥ তেইশ ॥

'নন্দা মাঈকী…জয়।'

বেরিয়ে এলাম তাঁবু থেকে। আজ ২রা অক্টোবর। আজকের তারিখেই আমরা নীলগিরি অভিযানের মূল-শিবির স্থাপিত করেছিলাম নন্দন-কাননে। আজকের তারিখেই অনিমাদি শহীদ হয়েছেন কুমায়ুনে। আর আজই আমরা চলেছি রূপকুণ্ডে—মরণহ্রদের তীরে, জীবনের জয়গান গাইতে।

যাত্রার আয়োজন শুরু হয়েছিল শেষরাতে। শীতের জন্য কেউ আমরা ঘুমোতে পারি নি। প্রচণ্ড শীত এখানে। এর চেয়ে উঁচু জায়গায় রাত কাটিয়েছি, কিন্তু এমন শীতে কষ্ট পাই নি। চারিদিক খোলা, তাই তুষারাবৃত হিমালয়ের হিমেল হাওয়া সব সময় দাপাদাপি করে এখানে। বুঝতে পারছি, তাঁবু ফেলার এমন চমৎকার জায়গা ফেলে প্রণবানন্দ কেন এক মাইল পেছিয়ে, বাগুয়াবাসায় ধর্মশালা নির্মাণ করেছেন।

ঘুমোতে পারি নি কেউ, কিন্তু রাতে তাঁবুর বাইরে বেরিয়েছে কেবল অমিতাভ। রাত তখন দুটো। হিমেল হাওয়ার দাপটে তাঁবুটা তখন থর থর করে কাঁপছে। চাঁদের আলোয় তাঁবুর ভেতরে ভোরের ছোঁয়া লেগেছে। অমিতাভ একা এক তাঁবুতে থাকে। সে স্লিপিংব্যাগের জিপ খুলে ফেলে। এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়ায় তার হাড়সুদ্ধ কেঁপে ওঠে। তবু সে উঠে বসে। জুতো জোড়া টেনে আনে কাছে। জুতো নয় যেন জমাট বাঁধা বরফ।

জুতো পরে বাইরে বেরিয়ে এসেছে অমিতাভ। নির্জন নীশিথে চাঁদের আলোয় প্রাণভরে হিমালয়কে দেখেছে। তারপরে নিজের তাঁবুর বরফ ঝেড়ে ফেলে কিছুক্ষণ পায়চারি করেছে কাল বিকেলে ঝরা তুষারস্তূপের ওপর দিয়ে। ওরা ততক্ষণে অনেকটা শক্ত হয়ে এসেছে।

আর কুলিরা? তারা কাল সারারাত আগুনের ধারে বসে নন্দাদেবীর জাগার গেয়েছে। দেবীর নামগান করে জেগে থাকার ক্লান্তি দূর করে শীতের সঙ্গে সংগ্রাম করেছে।

চারিপাশের সব কিছুকে চেয়ে চেয়ে দেখেছে অমিতাভ। কিন্তু সে দেখতে পায় নি তাদের। যারা নাকি নির্জন নিশীথে নাচ-গান করে এখানে আর যাদের জন্যই এই সৌন্দর্য নিকেতনের নাম হুনিয়াথর। হুনিয়া মানে ভূত আর থর মানে স্থান। অমিতাভর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় নি সেই অশরীরীদের।

তাঁবুতে ফিরে অমিতাভ আর পারে নি ঘুমোতে। একে শীত, তার ওপর পিপাসা। জল খেতে গিয়ে দেখেছে ওয়াটার বটলের জল জমে বরফ হয়ে আছে। রূপের তৃষ্ণার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে জলের তৃষ্ণা। তৃষ্ণায় আকুল হয়েছে অমিতাভ। ব্যাকুল চিত্তে প্রভাতের প্রতীক্ষা করেছে।

কোনমতে রাতটুকু কাবার করে তাঁবুতে তাঁবুতে এসে আমাদের ডাক দিয়েছে। বিনা বাক্যব্যয়ে আমরা উঠে বসেছি। যাত্রার আয়োজন আরম্ভ করেছি। স্লিপিং ব্যাগের ভেতরে বুকের কাছে রাখা জুতো-মোজা বের করে অনেক কসরতের পরে পায়ে পরেছি। দাঁত না মেজে, একটু গরম জল চোখে-মুখে দিয়ে, কফির মগে চুমুক দিয়েছি।

আয়োজন যখনই শুরু হয়ে থাক, জলখাবার খেয়ে, দুপুরের খাবার সঙ্গে নিয়ে রওনা হতে সাতটা বেজে গেল। চারিদিক একবার ভাল করে দেখে নিয়ে নন্দাদেবীর জয়গান গেয়ে আমরা যাত্রা শুরু করি।

বীর বিদায় জানায় আমাদের। কুলিরাও তার সঙ্গে হাত নাড়ে। তিন জন কুলি কেবল চলেছে সঙ্গে। তারা আমাদের খাবার, ওয়াটারপ্রুফ ও দড়ি বইছে। বাকি কুলিদের নিয়ে বীর আজ এখানেই থাকবে। গোয়ালদাম থেকে পদযাত্রা আরম্ভ করার পরে এই প্রথম বীরের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হল।

রামচাঁদ চলেছে আগে। তার পেছনে সারি বেঁধে পথ চলেছি আমরা। কমলবনের ভেতর দিয়ে আমাদের পথ। কুলিরা কয়েকটি ব্রহ্মকমল তুলে নিল। রূপকুণ্ডে বসে আমরা পুষ্পাঞ্জলি দেব নন্দাদেবীকে।

কমলবনের প্রায় সমতল ছোট প্রান্তরটুকু পেরিয়ে পৌঁছলাম ডানদিকের গিরিশিরার কাছে। পাহাড়ের গা বেয়ে আমাদের ওপরে ওঠা শুরু হল। পাথর আর বরফ। মাঝে মাঝে নরম বরফ। পাথরগুলো প্রায়ই আলগা। পা দিতেই নড়ে উঠছে। সাবধানে পা ফেলে আইস এক্সে ভর দিয়ে ধীরে ধীরে ওপরে উঠছি আমরা।

'মর্ণিং শোজ দি ডে' কথাটা হিমালয়ে সত্য নয়। হিমালয়ের সকাল দেখে দুপুরকেও আন্দাজ করা যায় না। যে কোন সময় সহসা দুর্যোগ ঘনিয়ে আসতে

পারে। তবু গিরি-কান্তারের যাত্রী সুন্দর সকাল দেখলে খুশি হয়। বহুদিনের আশা পূর্ণ হবার দিন আজ। তাই শরতের সুন্দর সকাল আজ আমাদের মনকে আনন্দময় করে তুলেছে। নন্দাদেবীর জয়ধ্বনি দিতে দিতে যাত্রাপথে এগিয়ে চলেছি আমরা।

চড়াই বাড়ছে, বরফ বাড়ছে। পথ দুর্গম থেকে দুর্গমতর হচ্ছে। অমিতাভ মোহিত ও সুজল চলেছে রামচাঁদের সঙ্গে। ওরা মাঝে মাঝে আইস এক্স দিয়ে ধাপ কেটে দিচ্ছে। সেই ধাপের ওপর পা ফেলে ফেলে আমরা ওপরে উঠেছি।

অনেক ওপরে উঠতে হবে। রূপকুণ্ডের উচ্চতা ১৬,৫০০ ফুট। কিন্তু আমাদের ১৭,০০০ হাজার ফুট পর্যন্ত উঠে তারপরে নেমে যেতে হবে। ছনিয়াথর ১৪,৫০০ ফুট। সেখান থেকে রূপকুণ্ড আড়াই মাইল। আড়াই মাইলে আড়াই হাজার ফুট চড়াই ভাঙতে হবে। এই উচ্চতায় গড়ে মাইলে হাজার ফুট চড়াই ভাঙ্গা খুবই কঠিন। কিন্তু কঠিন বলেই তো এসেছি এখানে।

পথ বন্ধ। আমাদের সামনে পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে একটা দেওয়াল। বরফ নয়, পাথরের দেওয়াল। দেয়য়ালটা এত খাড়া যে তার গায়ে বরফ জমতে পারে না। পারলে ভাল হত। ধাপ কেটে ওপরে উঠে যাওয়া যেত।

কিন্তু বরফ নেই বলে তো চলা বন্ধ করা যাবে না। দেওয়ালের গায়ে গর্ত ও ফাটল খুঁজে বের করে, তাতে পা দিয়ে রক্ ক্লাইম্বিং করে, আমরা একে একে উঠে আসি ওপরে।

ত্রিশূল অনেক কাছে এগিয়ে এসেছে। না, ত্রিশূল নয়। ত্রিশূল অচল ও অটল। সে যেখানে ছিল, সেখানেই আছে। চিরকাল থাকবে ওখানে। ওখানে দাঁড়িয়েই সে মর্ত্যের মানুষকে কাছে ডাকছে। আমরা তার ডাকে সাড়া দিয়েছি। তার কাছে এসেছি।

কিছুক্ষণ পরে এসে পৌছলাম একটা তুষারাবৃত ছোট প্রান্তরে। নিচে তাকিয়ে বুঝতে পারলাম পাহাড়ের গা বেয়ে ওপরে ওঠা আপাতত শেষ হয়েছে। এবার আমাদের আড়াআড়িভাবে উত্তরে এগিয়ে যেতে হবে। যেতে হবে চননিয়াকোটের পাদদেশে—রূপকুণ্ডে।

প্রান্তরের কোমল তুষারের ওপর বসে বিশ্রাম করি কয়েক মিনিট। ইতিমধ্যে প্রখর রোদ উঠেছে। সূর্যালোক স্ফটিকস্বচ্ছ হিমালয়ে প্রতিফলিত হয়ে চারিদিকে পড়েছে ছড়িয়ে। কালো চশমা পরেও মনে হচ্ছে এত আলো

এর আগে কখনও দেখি নি। কেবল আলো নয়। হিমালয়ে যেন আগুন লেগেছে। আমাদের সর্বাঙ্গ জ্বালা করছে।

একটু বাদেই আমরা হাজির হলাম একটা ভয়ানক স্থানে। অনেকটা জায়গা—বিরাট বিরাট ফাটলে বোঝাই। ফাটলগুলির দিকে তাকালে ভয় করে। যেন আমাদের গিলে ফেলবার জন্য হাঁ করে রয়েছে। ডানদিকে পাহাড়ের গায়ে নরম বরফ। সেখান দিয়ে চললে পড়ে যাবার সম্ভাবনা প্রতি পদক্ষেপে। কাজেই আমাদের এই ফাটল এড়িয়ে এগিয়ে যেতে হবে।

যেখানে ফাটল নেই, সেখানে পা দেবার পরে যে তলিয়ে যাব না, তারই বা নিশ্চয়তা কোথায়। তাই আমরা কোমরে দড়ি বেঁধে নিলাম। যাতে একজন তলিয়ে গেলে সঙ্গীরা তাকে টেনে তুলতে পারে।

কেউ তলিয়ে গেল না। রামচাঁদের চেনা জায়গা। সে কোন ফাটলকে বাঁদিকে, কোনটিকে ডানদিকে রেখে নিশ্চিন্ত পদক্ষেপে এগিয়ে চলল। তার পেছনে আমরা নির্বিঘ্নে পেরিয়ে এলাম সেই ভয়ানক জায়গা।

গিরি-কান্তারে কি বাধার শেষ আছে? একটি শেষ হতেই আর একটি সামনে এসে দাঁড়ায়। বিরাট বিরাট পাথরে বোঝাই অনেকটা জায়গা—চড়াই। খুব খাড়া নয়, তবু কষ্টকর। পাথরের ফাঁকে ফাঁকে এখানে ওখানে বরফ জমে আছে। তাহলেও জায়গাটা প্রস্তরময়। এত উঁচুতে এমন জায়গা বেশি দেখা যায় না। খুব সাবধানে আস্তে আস্তে অতিক্রম করলাম সেই দুর্গম স্থান।

এলাম সুবিশাল এক তুষারক্ষেত্রের সামনে। ইতিমধ্যে সূর্য অদৃশ্য হয়েছে। আবহাওয়ার পরিবর্তন হচ্ছে। কুয়াশা ঘনিয়ে আসছে।

আমরা চড়াই বেয়ে সেই তুষারক্ষেত্রে উঠতে থাকি। বহুবিস্তৃত ক্ষেত্র। একসময় আমরা উঠে আসি তুষারক্ষেত্রের শেষে। এ যাত্রার উচ্চতম স্থানে উপনীত হয়েছি। এখানকার উচ্চতা ১৭,০০০ ফুট। এখান থেকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে আমাদের শিবির। দেখা যাচ্ছে কৈলু বিনায়ক। দেখা যাচ্ছে চননিয়াকোট, ত্রিশুল, নন্দাঘুন্টি, চৌখাম্বা আর অসংখ্য নাম-না-জানা শৃঙ্গ।

আকাশে সূর্য নেই। হিমশীতল জগৎ। অথচ অত্যন্ত গরম লাগছে। ঘামে ভিজে গেছে সারা শরীর। মাথা ঝিম ঝিম করছে। টুপিটা খুলে মাথায় একটু হাওয়া লাগাই। মাফলারটা ঢিলে করে দিই। ইচ্ছে করছে

সোয়েটার খুলে ফেলি। কিন্তু নিমোনিয়ার ভয়ে সাহস পাই না। চারিদিকে যে বরফ ছাড়া আর কিছু নেই।

বিশ্রাম শেষে উঠে দাঁড়াই। রামচাঁদকে জিজ্ঞেস করি, "আর কতদূর ?"

রামচাঁদ একটু হাসে। তারপরে সামনের তুষারময় প্রান্তরের দিকে হাত ইশারা করে বলে, "আর দূর নয়। ঐ তো দেখা যাচ্ছে রূপকুণ্ড।"

"দেখা যাচ্ছে! কোথায় ?" সবাই সমস্বরে বলে উঠি।

"ঐ যে।" রামচাঁদ আবার দেখায়। তুষারাবৃত প্রান্তরের শেষে কোন অংশটি রূপকুণ্ড ঠিক বুঝতে পারি না। তবে এটা বুঝতে পারি যে রূপকুণ্ড আর দূরে নয়। আমরা দূরকে নিকট করেছি। দুর্গমকে জয় করেছি।

ছিঃ ছিঃ, এত কাছে এসেও এতক্ষণ এভাবে বসে আছি! আমরা ঢালু তুষারময় প্রান্তর পেরিয়ে নিচে নামতে থাকি। আমরা ছুটতে চাই। পারি না। নরম তুষারে পা তলিয়ে যাচ্ছে। হাঁটুসমান বরফের কাদা ভেঙ্গে চলতে হচ্ছে। আমরা রামচাঁদকে অনুসরণ করি। ধীরে ধীরে পথ চলি।

হঠাৎ খেয়াল হয়—ত্রিশুল নেই। কোন্ ফাঁকে সে যেন পালিয়ে গেছে আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে। একটা টিলার আড়ালে ঢাকা পড়েছে ত্রিশুল। বহুদিন বাদে ওকে হারালাম। অথচ ওর এত কাছে আর কখনও আসি নি।

না, না, ত্রিশুলকে হারাবো কেন ? ঐ তো ত্রিশুল। টিলা ছাড়িয়ে একটু নেমে আসতেই আবার দৃশ্যমান হয়েছে।

এখান থেকে ডানদিকে একটা ঢালের মত উঠে গেছে। রামচাঁদ বলল, "ঐটে জিউন্‌রা গলির পথ।"

থমকে দাঁড়াই। ঐ পথ ধরে গেলে পৌছনো যাবে ত্রিশুল পর্বতে। ঐ পথেই অভিযাত্রীরা ত্রিশুল পর্বতে অভিযান চালিয়েছেন। এত কাছে এসেও তাঁরা আসেন নি রূপকুণ্ডে।

যাদের নিয়ে রূপকুণ্ড তারাও কিন্তু ঐ পথেরই যাত্রী ছিলেন। জিউন্‌র গলি (১৬, ৩০০´) দিয়েই যেতে হয় হোমকুণ্ডে—নন্দাযাতের গন্তব্যস্থলে। সেই পরম পবিত্র তীর্থে বসে নন্দাদেবীর উদ্দেশে প্রণতি জানাবার জন্য যুগে যুগে মানুষ ছুটে এসেছে এই গিরি-কান্তারে।

* যতদূর জানা যায় মহাভারতের যুগেও নন্দাযাতের প্রচলন ছিল। এমন কি পাণ্ডবরা পর্যন্ত এতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। যুগে যুগে এই যাত্রা শ্রেষ্ঠ তীর্থযাত্রার মর্যাদা পেয়েছে। গুপ্তযুগে (৪র্থ থেকে ৮ম শতাব্দী) নন্দাযাত

বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। হর্ষবর্ধন (৬০৭-৬৫৭ খৃঃ) নন্দাযাতের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বানভট্টের হর্ষচরিতে এর উল্লেখ আছে। গুপ্ত পরবর্তীযুগেও এই যাত্রার জনপ্রিয়তা কিছুমাত্র কমে যায় নি। কাত্যুরী রাজারা 'নন্দা-ভগবতী-চরণ-কমল-কমলা-সনাথমূর্তি' নামে নিজেদের অভিহিত করেছেন।

মুসলমান আমলে স্বাভাবিক ভাবেই সমতল থেকে নন্দাযাত্রা আসা কমে যায়। কিন্তু ইংরেজ আমলে আবার সমতলবাসীরা যাত্রায় অংশ নিতে শুরু করেন। অ্যাটকিন্‌সন দেখেছেন (১৮৮২ খৃঃ) নন্দাষ্টমীতে শিব-পার্বতীর বিবাহবার্ষিকী পালিত হয়। তখন গাড়োয়ালের চাঁদপুর পরগণার নউটি গ্রাম থেকে প্রতি বছর একটি শোভাযাত্রা বের হত। পালকিতে করে নন্দাদেবীকে নিয়ে আসা হত বৈদিনী কুণ্ডে। সেখানে মহাসমারোহে দেবীপূজা অনুষ্ঠিত হত। বারো বছর বাদে বিশেষ যাত্রা হত। সেই যাত্রায় নন্দাদেবীর সেবিকা লাটুদেবীকেও সঙ্গে নেওয়া হত। নউটিতে লাটুদেবীর একটি মন্দির আছে। এই যাত্রায় বৈদিনী কুণ্ড ছাড়িয়ে যতদূর সম্ভব নন্দাদেবীকে নিয়ে যাওয়া হত। তাঁরা বোধ হয় হোমকুণ্ডে পৌছতে চাইতেন। কিন্তু অধিকাংশ বারই তা সম্ভব হত না। যাই হোক, তাঁরা যে পর্যন্ত যেতে পারতেন, সেখানে অভ্রমিশ্রিত দুটি শিলাকে দেবীরূপে পূজা করতেন। সূর্যকিরণে সেই অভ্রশিলা জল-জল করত।

ইংরেজ আমলের আগে কিছুকাল শোভাযাত্রার শেষে নন্দাদেবীর উদ্দেশে নরবলি দেওয়া হত। উত্তর গাড়োয়ালের দুধাতৌলি অঞ্চলে এখনও নাকি এই নরবলির প্রচলন আছে। সেখানকার কোন কোন গ্রামে এর একটি বিকল্প প্রথা আছে। বারো বছর বাদে বয়স্ক ব্যক্তিরা একত্র হয়ে একজন অতি বৃদ্ধকে নন্দাদেবীর উৎসর্গরূপে নির্বাচিত করেন। সাধারণতঃ ঐ বৃদ্ধ নিজেই নির্বাচিত হতে চান। নির্বাচনের পরে বৃদ্ধ চুল ও নখ কেটে স্নান করেন। তারপর তিলক কাটেন। চাল ডাল, হলুদ ফুল, যব ও জল মিশিয়ে তার মাথায় ঢেলে দেওয়া হয়। ব্যাস, সমাজের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ঘুচে গেল। সেদিন থেকে তাঁর আলাদা বাড়ি। তিনি তখন থেকে স্বপাক ও একাহারী। বৃদ্ধের আত্মীয়রা তাড়াতাড়ি করে তাঁর শ্রাদ্ধশান্তি চুকিয়ে ফেলেন। কারণ তাঁদের কাছে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেছেন। বৃদ্ধ কিন্তু সত্যি সত্যই বছরখানেকের মধ্যে ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

অ্যাটকিন্‌সন কুমায়ুনের রণচুলা ও ভাগর এবং গাড়োয়ালে কুরুর, ননোরা,

হিন্দোল, সেমলী, সিং, তল্লীধুরা, নউটি ও গৌড় গ্রামে নন্দাদেবীর মন্দির দেখেছেন।

কুমায়ুনী ও গাড়োয়ালীরা উচ্চস্থানেই নন্দাদেবীর পুজো করে থাকেন। এই পুজোই তাঁদের শ্রেষ্ঠ ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব। কোন কোন গ্রামে পুজোর সময় শ্বশুরবাড়ি থেকে মেয়েদের নিয়ে আসা হয়। ভ্রাতৃবধূরা তাদের কাপড ও দক্ষিণা দেন। অর্থাৎ নন্দাপুজোর সঙ্গে ননদপূজাও করা হয়।

এদেশের মানুষের ধারণা নউটি ছিল নন্দাদেবীর বাপের বাড়ি। বারো বছর বাদে নন্দা শ্বশুরবাডি যেতেন। কৈলাসের পথে হোমকুণ্ডে নন্দা হোম করেছিলেন। তাই বারো বছর বাদে নন্দাযাত হয়। টিহরীরাজ এই যাত্রার অর্ধেক খরচ দেন। বাকি অর্ধেক চাঁদা তোলা হয়। গাড়োয়াল কুমায়ুনের সব জায়গা থেকে, এমন কি হরিদ্বার থেকে পর্যন্ত যাত্রী আসেন। বৈদিক তান্ত্রিক ও শৈবরা একসঙ্গে পথ চলেন। চৌসিঙ্গা খাড়ু বা চার শিংওয়ালা একটি ভেড়া যোগাড করা হয়। কাপড় গয়না চাল চিড়ে গমের অঙ্কুর কাকুড় ডালিম কমলালেবু প্রভৃতি সেই ভেড়ার পিঠে চাপিয়ে, তার পেছন পেছন যাত্রীরা পথ চলেন। ওয়ান থেকে নন্দাদেবীর সেবিকা লাটুদেবীকে সঙ্গে নেওয়া হয়। ভেড়াটি যে পর্যন্ত আসতে পারে, যাত্রীরাও সে পর্যন্ত আসে। এক সময় দেখা যায় পথশ্রমে ক্লান্ত ভেড়াটি পথের ওপর বসে পড়েছে। আর সে উঠতে পারে না। যাত্রাও শেষ হয়। যাত্রীরা ফিরে চলে ঘরে। ফলে অধিকাংশ বারই বৈদিনীতে যাত্রা শেষ হয়ে যায়। বড় জোর পাথরনাচুনি পর্যন্ত আসে।

কিন্তু এ নিয়মটি হাল আমলের। যে আমলে মানুষ আরামপ্রিয় হয়ে পড়েছে। তার আগের যুগে ভেড়া ছাড়াই তীর্থযাত্রীরা এসেছেন এ পথে। পৌছেছেন রূপকুণ্ড ও হোমকুণ্ডের তীরে।

হোমকুণ্ডের উদ্দেশ্যেই যাত্রা করেছিলেন কনৌজরাজ যশোদয়াল। রানী বল্লভা সকলের নিষেধ অমান্য করে স্বামীর সঙ্গিনী হয়েছিলেন। পাত্র-মিত্র সৈন্য-সামন্ত দাস-দাসী নিয়ে রাজা রওনা হয়েছিলেন হোমকুণ্ডে। পথশ্রমে ক্লান্ত বল্লভার অসময়ে প্রসব-বেদনা দেখা দেয়। রানী কা স্থলেরায় সন্তান প্রসব করেছিলেন তিনি। ওরা বলেন, রানী বল্লভা কলুষিত করেছিলেন এই পুণ্যভূমিকে। তাই ক্রুদ্ধা হয়েছিলেন নন্দাদেবী। নন্দাদেবীর রোষে ধ্বংস হয়েছেন রাজা-রানী আর তাঁদের সহযাত্রীরা।

কথাটা মেনে নিতে পারি না। মানুষের জন্য যদি তীর্থ, তবে মানুষের মানসী কেন আসতে পারবে না তীর্থে? আমাদের ধর্ম তো সুদূর অতীত থেকেই সর্বকর্মে নারীর সমান অধিকার মেনে নিয়েছে। নারী তো কেবল প্রেয়সী নয়, সে যে সহধর্মিণী। তাই জানকী বনবাসী শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গিনী হয়েছিলেন। পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য হয়তো হয়, কিন্তু সতী যদি পতির সঙ্গে তীর্থে আসে, তাহলে তার অন্যায় কোথায়?

আর সন্তানধারণ? সে তো রমনীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম, নারীজন্মের পরম সার্থকতা। নন্দাদেবী নিজেও যে জননী। এই পুণ্যভূমিতে রানী বল্লভা যে সন্তানকে জন্মদান করেছিলেন, সে তো দেবশিশু। পাপের সঙ্গে তার সম্পর্ক কোথায়? তাহলে তার আবির্ভাবে পুণ্যভূমি কলুষিত হবে কেন?

পাপ নয়, পুণ্য। সার্থক জন্ম সেই পুণ্যার্থীদের। মৃত্যু তো মানুষের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। কিন্তু এমন গৌরবময় মৃত্যু কজনে বরণ করতে পারেন। সেকালে মানুষ কত কষ্ট করে মহাপন্থায় গমন করতেন। আর বিনা কষ্টে নন্দাদেবীর কৃপায় তাঁরা এখানে মহাপ্রয়াণ লাভ করেছেন। রূপকুণ্ড পরিণত হয়েছে পুণ্যতীর্থে।

জানি অনেকে আপত্তি জানাবেন। বলবেন রূপকুণ্ড তীর্থ নয়। হোমকুণ্ড যাত্রীরা এখানে এসে রাতের আশ্রয় নিয়েছিলেন মাত্র। আর সেই রাতেই প্রচণ্ড প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দেয়। তাঁরা মারা যান।

কথাটা মিথ্যে নয়। তবু তাঁদের সঙ্গে একমত হতে পারি না। উচ্চ-হিমালয়ে যেখানে জল আছে, সেখানেই গড়ে উঠেছে তীর্থ। নন্দাযাত্রীরা রূপকুণ্ডে স্নান করে হোমকুণ্ডে যেতেন। কারণ হোমকুণ্ডে জল নেই, আছে তিনখানি শিলা। সেই শিলার ওপরে দাঁড়িয়ে দেবী নন্দা হোম করেছিলেন বলেই নাম হয়েছে হোমকুণ্ড। তাহলে হোমকুণ্ডের পুণ্যস্নানক্ষেত্র রূপকুণ্ড তীর্থ হবে না কেন?

সব চেয়ে বড় কথা এতগুলি মহৎ মানুষ যেখানে মহাপ্রয়াণ লাভ করলেন, সেই পরম পবিত্র স্থান তীর্থ নয় তো কি? পরেশনাথ যদি তীর্থ হতে পারে, রূপকুণ্ড তীর্থ নয় কেন? মানুষের জন্য যদি তীর্থ, তবে রূপকুণ্ড মহাতীর্থ।

জিউনরা গলির পথকে ডানদিকে রেখে আমরা এগিয়ে চলি তীর্থপথে। কিছুদূর এগিয়ে বাঁদিকে নামতে থাকি। বরফ ক্রমেই শক্ত হচ্ছে। চলতে পরিশ্রম কম হচ্ছে, কিন্তু জোরে চলতে গেলেই পা ফস্‌কে যাচ্ছে।

আমাদের ঠিক সামনে চননিয়াকোট। ১৬,৫৮৬ ফুট উঁচু একটি বিচিত্র পাহাড়। বিচিত্র এইজন্য যে, এ উচ্চতায় এমন সাদা আর কালোয় মেশানো পাহাড় বড় একটা দেখা যায় না। এখানে সবই সাদা—পাহাড় সাদা, প্রান্তর সাদা। তাই চননিয়াকোট যেন চারিদিকের মধ্যে খাপছাড়া। ওর গায়ের কালো দাগগুলি বিস্ময়কর। কিন্তু কেন এই কলঙ্কচিহ্ন?

রাজা যশোদয়ালের সহযাত্রীরা এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন রূপকুণ্ডের তীরে। নন্দাদেবীর পুজো দিয়ে তাঁরা বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। সহসা ত্রিশূল সংহারমূর্তি ধারণ করেছিল। যাঁরা নন্দাযাতে অংশ নেন তাঁরা সবাই জানেন—এ যাত্রা অন্তিমযাত্রায় পরিণত হতে পারে। কিন্তু মৃত্যুভয়হীন হলেও তীর্থযাত্রীরা তা মানুষ। সহজে মানুষ মরণকে মেনে নেয় না। তাই বিভ্রান্ত যাত্রীরা ছুটে গিয়েছিলেন চননিয়াকোটের কাছে। রক্তাপ্লুত দেহে তাকে জড়িয়ে ধরে করুণ কণ্ঠে বলেছিলেন—তুমি ত্রিশূলকে শান্ত করো।

কিন্তু চননিয়াকোটের সাধ্য কি সে শান্ত করে ত্রিশূলকে! অসহায় চননিয়া-কোট সেদিন কেবল নীরবে দাঁড়িয়েছিল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে শুধু দেখেছিল পুণ্যার্থী মানুষের মহাপ্রয়াণ।

তাঁরা কেউ নেই। কিন্তু আছে তাঁদের সেই রক্তলেখা। আছে চননিয়া-কোটের গায়ে—কলঙ্কচিহ্ন রূপে। তাই সাদার জগতে বাস করেও সে এমন কালো।

"হুঁশিয়ার।" রামচাঁদ সাবধান করে। আমি বাস্তবে ফিরে আসি। ধীরে ধীরে পা ফেলি।

কুয়াশা ঘন হচ্ছে। ঝড়ের পূর্বাভাস কি? হতে পারে। ঝড় উঠেছিল সাড়ে ছ'শ বছর আগে। আজও উঠতে পারে বৈকি। কিন্তু ঝড়ের ভয়ে ভীত হলে তো গিরি-কান্তারের পথে পা বাড়ানো যায় না। ঘরে বসে হিমালয়ের স্বপ্ন দেখতে হয়।

যুগে যুগে যে সব যাত্রী গিরিতীর্থ পরিক্রমায় এসেছেন, কি সম্বল ছিল তাঁদের? ছিল না আমাদের মত সাজ-সরঞ্জাম, পোশাক-পরিচ্ছদ আর অভিজ্ঞ পথ-প্রদর্শক। কেবলমাত্র ভক্তির ডালি পূর্ণ করে তাঁরা এই দুর্গম পথে পা বাড়িয়েছেন। কেউ ফিরে গেছেন ঘরে, কেউ বা ফিরতে পারেন নি। কিন্তু তাঁদের কেউ বিফলকাম হন নি। তাঁরা সবাই আমাদের পথিকৃৎ। তাঁদের স্মৃতি আমাদের শ্রেষ্ঠ পাথেয়।

সহসা চলা বন্ধ করে রামচাঁদ। আমরা বিস্মিত হই। তার দিকে তাকাই। সে হাসে। ব্যস্ত হয় মোহিত। বলে, "থামলে কেন?"

রামচাঁদ আবার হাসে। সহাস্যে বলে, "আমরা এসে গেছি।"

"কোথায়?"

"রূপকুণ্ডে।"

চমকে উঠি। চারিদিকে তাকাই। কোথায় কুণ্ড? এ তো কেবলই বরফ। জলের চিহ্নমাত্র চোখে পড়ছে না। তুষারাবৃত প্রান্তরটি আমাদের পায়ের কাছ থেকে সহসা ঢালু হয়ে গেছে। একটি প্রায় গোলাকার তুষারময় পর্যাঙ্কের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছি আমরা।

সেই পর্যাঙ্কটিকে দেখিয়েই রামচাঁদ বলে, "ঐ হচ্ছে কুণ্ড।"

"জল কোথায়?" অমিতাভ জিজ্ঞেস করে।

"নেই। বরফ হয়ে গেছে।"

"কিন্তু বীরেনদার বইতে পড়েছি ১৫০ থেকে ২৫০ ফুট ব্যাসের একটি জলাশয় রূপকুণ্ড। ছবি দেখেছি—কুণ্ডের চারিদিকে খাড়া পাথরের দেওয়াল, তীরে ছোট-বড় পাথরের ছড়াছড়ি। সেসব কোথায়?" মোহিত বলে।

"সব ঢেকে গেছে বরফে।"

"তাহলে যে আমরা কিছুই দেখতে পাবো না।" নেতা নিরাশ কণ্ঠে বলেন।

"জী।"

ছোট্ট উত্তর। কিন্তু প্রচণ্ড আঘাত করে সবাইকে। কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলতে পারি না। তারপরে অমিতাভ বলে, "তুমি তো জানো কোথায় আছে। বরফ খুঁড়ে অন্তত দু-একটি দেহাবশেষ বের করা যায় না?"

"না। কম করেও দশ-বারো ফুট বরফ জমেছে।"

"তাহলে বৃথাই আমাদের এখানে আসা। বিফল হল আমাদের যাত্রা।" অসিতবাবু মুষড়ে পড়েন।

রামচাঁদ চুপ করে থাকে। ব্যর্থতার গ্লানি সবাইকে শব্দহীন করে ফেলেছে। করুণ নয়নে আমরা তাকিয়ে আছি তুষারাবৃত রূপকুণ্ডের দিকে।

সত্যই কি আমরা ব্যর্থকাম? আমাদের যাত্রা কি বিফল হল? আমরা কি বৃথাই গিরি-কান্তার পরিক্রমা করলাম?

না। দুর্গম পথের সকল বাধাকে অতিক্রম করে, দুস্তর প্রান্তরের সকল

বিপদকে জয় করে আমরা আজ আসতে পেরেছি রূপকুণ্ডের তীরে। প্রণতি জানাতে পারছি সেই মরণজয়ী তীর্থযাত্রীদের উদ্দেশে। তাঁদের দেহাবশেষ দেখতে পেলাম না, কিন্তু পেলাম তাঁদের প্রাণের পুণ্যস্পর্শ। তাঁরা আমাদের আশীর্বাদ করছেন। কৃতজ্ঞ কণ্ঠে বলছেন—সার্থক আমাদের মহাপ্রয়াণ। মর্ত্যের মানুষ বিস্মৃত হয় নি আমাদের।

কি হত তাঁদের সেই বিকৃত দেহাবশেষ, অলঙ্কার কিংবা পোষাক-পরিচ্ছদ দেখে? আমরা নৃতাত্ত্বিক নই, আমরা তীর্থযাত্রী।

তার চেয়ে এই ভাল হল। পুণ্যার্থীদের ভয়াবহ পরিণতির সঙ্গে পরিচিত হতে হল না, অথচ রূপকুণ্ড দর্শন হল। তাঁদের প্রাণের পুণ্যস্পর্শে আমাদের জীবন ধন্য হল।

রামচাঁদের সঙ্গে আমরা সেই পর্যাঙ্কের ভেতরে নেমে আসি খানিকটা। মরণজয়ী যাত্রীদের উদ্দেশে জয়ধ্বনি করি। তারপরে সুজল পূজোয় বসে। সে ব্রহ্মকমল আর চকোলেট উৎসর্গ করে দেবীনন্দার শ্রীচরণে।

পূজোশেষে প্রণাম করি নন্দাদেবীকে, প্রণাম করি ত্রিশূল আর নন্দাঘুন্টিকে। তাঁদের কাছে করজোড়ে প্রার্থনা করি—তোমরা মৃত্যুঞ্জয়ী তীর্থযাত্রীদের স্বর্গগত আত্মাকে শান্তি দাও। রূপকুণ্ড রূপান্তরিত হোক মহাতীর্থে। সেই মহামানবদের আত্মত্যাগ সার্থক হোয়।

॥ চব্বিশ ॥

"পুণ্যে পাপে দুঃখে সুখে পতনে উত্থানে
মানুষ হইতে দাও তোমার সন্তানে
হে স্নেহার্ত বঙ্গভূমি—তব গৃহক্রোড়ে
চিরশিশু করে আর রাখিয়ো না ধরে।"…

"রাখে নি তো!" মোহিত বাধা দেয়।

দাশু আবৃত্তি থামায়।

মোহিত আবার বলে, "রাখলে কি আর আমরা যেতে পারতাম রূপকুণ্ডে? আর তারপরেও সোজা পথে ঘরে না ফিরে আবার এই দীর্ঘ ও দুর্গম পথ পাড়ি দিতাম? আসল ব্যাপারটা কি জানিস?"

"কী ?"

"আসলে তখন কেউ ভাবতেই পারেন নি যে বাঙালীর ঘরে আমাদের মতো লক্ষ্মীছাড়া জন্মাতে পারে।"

গল্প করতে করতে উৎরাই ভাঙছি আমরা। পাথরনাচুনি থেকে বাগচোর খাড়া উৎরাই।

সকাল সাড়ে নটায় ছনিয়াথর থেকে রওনা হয়ে পুরনো পথে পাথরনাচুনি এসেছি। সেখান থেকে শুরু হয়েছে নতুন পথ। তিন তালের পথ—ব্রহ্মতাল (১২,০০০´), বিগুনতাল (১১,০০০´) ও খপলুতাল, (১০,০০০´)। তিনতাল দেখে আমরা একেবারে নন্দকিশোরীতে নেমে পুরনো পথ ধরব।

বাগচো। ১৩,৪৯১ ফুট উঁচু ঘন জঙ্গলে ঘেরা একটু সমতল প্রান্তর। মেষপালকদের কয়েকটি কুটির। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে আবার চলা শুরু করি।

সমতলের শেষে উৎরাই। পাহাড়ের গা দিয়ে সরু পায়ে চলা পথ। পথ নয়, পথ-রেখা। কোথাও কোথাও রেখা পর্যন্ত নেই। অনুমানে পথ চলতে হচ্ছে।

কুলিরা এগিয়ে গেছে আগে। রামচাঁদ রয়েছে তাদের সঙ্গে। আমাদের সঙ্গে আছে বীর। তার পেছনে সারি বেঁধে পথ চলেছি আমরা।

সহসা জঙ্গল শেষ হয়ে গেল। কিন্তু এর চেয়ে যে জঙ্গল ভাল ছিল। এখানে কাঁটাগাছ নেই, আছে পাথর। বিরাট বিরাট পাথর। পাথর পেরিয়ে পথ চলতে হচ্ছে। বীর বলে, "এ জায়গার নাম হালদাড়া।"

একটু এগিয়ে আবার ঝোপঝাড়। এরা উদ্ভিদ, কিন্তু উদ্ভিদবিজ্ঞানী উপেনবাবুর কোন কাজে আসছে না। বরং আমাদের মতো তাঁরও হাত-পা কাঁটায় ছড়ে যাচ্ছে, তিনিও আছাড় খাচ্ছেন। বীর বলে, "এ জায়গার নাম কাটরিয়া।"

"বেড়ে নাম দিয়েছ ভাই।" নেতা বীরের পিঠ চাপড়ে দেন।

চলা বন্ধ করে বীর। থমকে দাঁড়াই। বীর ইশারা করে। একজন লোক। পথের ওপর পড়ে আছে।

সর্বনাশ, কোন দুর্ঘটনা নাকি ? কিন্তু এ পথে আজ আমরা ছাড়া আর কেউ এসেছে বলে তো শুনি নি। তাহলে কি আমাদেরই কেউ ? তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসি।

হ্যাঁ, আমাদেরই একজন। কুলি। তবে দুর্ঘটনা নয়, নিদ্রা। মালের

কিট মাথায় দিয়ে মালবাহক সুখনিদ্রায় বেহুঁশ। জায়গাটি অবশ্য ঘুমোবারই মতো। এখানে পথটি প্রশস্ত। একপাশে খাড়া পাহাড়। আর একপাশে প্রকাণ্ড একখানি অর্ধবৃত্তাকার পাথর। পথের ওপরে আচ্ছাদন সৃষ্টি করেছে।

কিন্তু লোকটির মাথার কাছে ওটা কি পড়ে আছে? একটা বোতল। দেবকীদা হাতে তুলে নেন। হ্যাঁ, যা ভেবেছিলাম তাই। লেমন বার্লির একটা খালি বোতল। এ বোতল ওর কাছে এলো কেমন করে? এ বোতল তো থাকে দেবকীদা, অমিতাভ কিংবা অসিতবাবুর রুকস্যাকে। তাড়াতাড়ি রুকস্যাক নামায় ওরা। না, ঠিকই আছে। দেবকীদার রুকস্যাক থেকে বোতলটি পাচার হয়েছে।

"বোতল সমস্যার যখন সমাধান হল, তখন আর সময় নষ্ট না করে, লোকটিকে ডেকে তুলে চল আমরা এগিয়ে যাই।" সুজল তাড়া লাগায়।

"কেন, তোর কি খিদে পেয়েছে নাকি রে?" নেতা জিজ্ঞেস করেন।

"পেয়েছে বৈকি। পাবে না? সেই সাত-সকালে চারটি চিড়েভাজা খাইয়ে হাঁটাতে শুরু করিয়েছো। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতে চলল, এখনও খেতে দেবার নামটি নেই।"

"কে দেবে? একি বাড়ি পেয়েছো, যে বুড়ো ছেলেকে মা ভাত বেড়ে দেবেন?" নেতা ধমক লাগান।

সুজল কিন্তু বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে বলে, "এখানে মা নেই, দাদা তো রয়েছেন, তিনিই দেবেন।" একটু থামে সে। তার পরে আবার বলে, "দাও না খানকয়েক বিস্কুট, সত্যি বড্ড খিদে পেয়েছে অসিতদা।"

আমরা তার কথায় হেসে উঠি। আর তাতেই ঘুম ভেঙ্গে যায় মালবাহকটির। কিন্তু সে চোখ মেলে না, জড়িতকণ্ঠে বলে, "কৌন হ্যায়?"

"কোই নেহী হ্যায়। তুমহারা কেয়া হুয়া?" দাশু জিজ্ঞেস করে।

"মজা আ গিয়া। বিলাইতি শরাব পিয়া।"

"কিধর মিলা?" মোহিত প্রশ্ন করে।

"বড়া সাবকা ঝোলিমে। পুরা বোতল ফুক দিয়া। কিসিকো নেহী দিয়া।"

আমরা মুখ টিপে হাসি। দেবকীদার দিকে তাকাই। দেবকীদা বলেন, "ইয়ে শরাব নেহী, শরবৎ।"

"শরবৎ?" লোকটি চমকে ওঠে। তার নেশা কেটে যায়। সে চোখ

মেলে। আমাদের দেখতে পায়। তাড়াতাড়ি উঠে বসে, দাঁড়ায়। কিটটা পিঠে বাঁধে। তারপরে একবার দেবকীদার দিকে তাকিয়ে ছুটে নামতে থাকে উৎরাই পথে।

বিস্কুট ও জল খেয়ে নিয়ে আমরাও রওনা হই। চলতে চলতে বীর বলে, "এ জায়গাটার নাম তামাকিয়া ওয়াড়িয়ার, অর্থাৎ......"

"স্মোকিং রুম।" মাঝখান থেকে অমিতাভ বলে ওঠে।

হাসতে হাসতে বীর বলে, "জী।"

আরও অনেকটা নেমে এসে একটা ঝরণা পেরিয়ে দিনের যাত্রা শেষ হল। সাড়ে তিনটার সময় আমরা পৌঁছলাম বড়াজলঢুঙ্গা। খাড়া পাহাড়ের কোলে খানিকটা স্যাঁতসেঁতে সমতল। ওপরের দিকে ছড়িয়ে আছে বিভিন্ন আকারের ছোট-বড পাথর। দুখানি পাথর বিশেষ করে দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। একখানি অবিকল ভেড়ার মতো দেখতে। আর একখানি গোল—গাছের গুঁড়ির মতো। পাথরখানি প্রকাণ্ড—কয়েক টন ওজন হবে।

নিচের সমতলে তাঁবু ফেলেছে রামচাঁদ। বীর উনোন জ্বালিয়েছে। আমরা এসে চারদিকে বসি। মোহিত থার্মোমিটার বের করে আনে। তাপমাত্রা ৩৪° ফ্যারেনহিট্। হবেই তো, উচ্চতা যে ১৩,০০০ ফুট। তার ওপর সামনের পাহাড়টির পেছনেই তুষারাবৃত ত্রিশুল আর নন্দাঘুন্টি। ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে। আজও ওদের দেখছি, আরও কয়েকদিন দেখতে পাব। কিন্তু তারপরে......

আমরা গিয়েছিলাম ওদের কাছে, খুবই কাছে। এবার ওদের ছেড়ে চলে যাচ্ছি দূরে। আর কোনোদিন হয়তো আসতে পারব না ওদের এত কাছে। তাই আজ কেবল বার বার ওদের দেখি। এ দেখার শেষ না হলেই যেন ভাল ছিল।

কিন্তু তা তো হবার নয়। জগতে কোন দেখাই অফুরন্ত নয়, কোন পাওয়াই অন্তহীন নয়।

আবার আরম্ভ হল পদযাত্রা। আরম্ভ হল সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে—সকাল সাতটার সময়। গিরিশিরার পর গিরিশিরা পেরিয়ে পথ। পথের বহু নিচে বয়ে যাচ্ছে রূপগঙ্গা। সে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। এগিয়ে দিচ্ছে কী?

বীর বলে, "এ গিরিশিরাগুলি রণকধার গিরিশ্রেণীর অংশ, যে রণকধার

পেরিয়ে আমরা ওয়ান থেকে বৈদিনী গিয়েছি।"

"তাহলে কি আমরা ওয়ানের দিকে এগোচ্ছি?" দাশু জিজ্ঞেস করে।

"তা···বলতে পারেন। আমরা আজ কুকিনাখালে তাঁবু ফেলব। সেখান থেকে ওয়ান মাত্র দেড় মাইল।"

ভাবছি ওয়ান ডাকবাংলোর চৌকিদার পার সিং-এর কথা। এত কাছে এসেও ওর সঙ্গে দেখা হবে না। কি করব, এই যে হিমালয় পথের নিয়ম। আজ বীর সঙ্গে রয়েছে, দু'দিন পরে তার কাছে থেকেও নিতে হবে বিদায়। আর সে বিদায় হতে পারে চিরবিদায়।

আজকের পথ বড়ই সুন্দর। একে তো একটানা উৎরাই, তার ওপরে পথের পাশে সবুজ বন, রঙীন ফুল আর রং-বেরংয়ের ফার্ণ। কাল সারাদিন উপেনবাবু মুখখানি গম্ভীর করে ছিলেন। আজ তাঁর মুখে হাসি ফুটেছে। তিনি মহানন্দে ফুল ও পাতা সংগ্রহ করছেন আর বলছেন, "এই ফুলগুলি রোজবেরি, আর এসবই হচ্ছে কুটবন। এই ফারগাছগুলি Abeis Pectinatu······এ ছাড়া পথের ধারে ভূর্জ ও রডোডেনড্রন তো দেখতেই পাচ্ছেন।

কিছুক্ষণ বাদে একফালি সমতল প্রান্তরের সামনে আসি। বীর বলে, "ছোটাজলঢুঙ্গা।"

এখান থেকে ভূণা ডাকবাংলো ছবির মতো দেখাচ্ছে। সহজ পথ। আমরা জোরে জোরে পা চালাই।

প্রায় দু'ঘণ্টা উৎরাই করে সমতল পাওয়া গেল। শুধু সমতল নয়— সরকারী পথ। বেশ প্রশস্ত। ওয়ান ছাড়ার পরে আর এমন পথ পাই নি। এ জায়গাটার নাম বজমোড়া।

পথের পাশে তামাক আর কাঁকুড় গাছ। দূরে সুতোল আর রামণী গ্রাম দেখা যাচ্ছে। ঘন জঙ্গলে ঘেরা। দেখা যাচ্ছে ভূণা ও তাতারার ডাকবাংলো। দেখা যাচ্ছে রূপগঙ্গা ও নন্দাকিনীর সঙ্গম। আমরা দেখতে দেখতে পথ চলেছি।

সহসা থামতে হয়। একখানি পাথর। হিমালয়ের পথে পদচারণ করছি আর পাথর দেখে দাঁড়িয়ে পড়লাম? দাঁড়াতেই হবে। এমন পাথর যে বড় একটা দেখা যায় না। অবিকল একটি তোরণ ও মন্দিরের মতো দেখতে। ছবি নেবার পরে আবার শুরু হয় পথ-চলা।

বড়াজলঢুঙ্গা থেকে ঘণ্টা তিনেক হেঁটে আমরা ভূণা পৌছলাম। ডাক-বাংলোর সামনে লেখা—'5 Miles,' '1941' '10, 500 Feet.'

প্রথমটি দূরত্ব। কিন্তু কোথা থেকে তা লেখা নেই। বোধ করি ওয়ান থেকে। দ্বিতীয়টি নিশ্চয়ই এই ডাকবাংলো নির্মাণের সাল। আর তৃতীয়টি এখানকার উচ্চতা।

একজন লোক এসে সেলাম করে। বলে, "আমি খেলাপ সিং। এই ডাকবাংলোর চৌকিদার। আপনারা ভেতরে আসুন। ফরেস্টার সাব আপনাদের ডাকছেন।"

আমরা ভেতরে আসি। ফরেস্টার মিঃ নেগী বসেছিলেন বারান্দায়। উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করে আমাদের বসতে বলেন তিনি। অনুরোধ করেন, আজকের রাতটা এখানে কাটিয়ে যেতে।

সবিনয়ে বলি, এমনিতেই দু'দিন দেরি হয়ে গেছে। আজ আমরা কুকিনাখাল পর্যন্ত এগিয়ে যেতে চাই।

তিনি বাধা দেন না। বলেন, "জায়গাটা খুবই সুন্দর। তবে রাতটা একটু সাবধানে থাকবেন, ওখানে বড় ভালুকের উপদ্রব।" তারপরে চৌকিদারকে তাগিদ দেন, "জলদি সাবদের খানার বন্দোবস্ত করে দাও।"

মিঃ নেগী ভাওয়ালীর লোক। কথায় কথায় তিনি বলেন, এখান থেকে শুকরি হয়ে ওয়ান পাঁচ মাইল। নতুন রাস্তা তৈরি হচ্ছে। এ রাস্তায় দূরত্ব আরও আধ মাইল কমে যাবে।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই চৌকিদার খানা পাকিয়ে ফেলে। খানা মানে ডাল-ভাত, কিংবা রুটি-তরকারি নয়, আলুসিদ্ধ। সেই সঙ্গে নুন আর লঙ্কা। আলুই এখানকার প্রধান খাদ্য। খেতে ভালই লাগল।

খাওয়া হলে বিদায় নিই মিঃ নেগীর কাছ থেকে। চৌকিদারকে বকশিশ দিয়ে বেরিয়ে আসি। চলতে থাকি ভূণার গ্রাম্যপথে।

প্রাকৃতিক সম্পদে সম্পদশালী ভূণা। এখানে কুট ছাড়া আরও অনেক রকম ওষধি জন্মায়। এদের মধ্যে কাটাক (একরকম তিতে শিকড়), অতীশ (শিকড়—পেটের অসুখের ওষুধ) ও ভুলু (শিকড়—ঘা ও একজিমার ওষুধ) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখানে প্রচুর পরিমাণে মূলা, সর্ষে ও আলু উৎপন্ন হয়। আর হয় মাসি। এর শিকড় দিয়ে পাহাড়ীরা ধূপের কাজ করে।

ভূণা ছাড়িয়ে এসেছি, কিন্তু কমে নি পথের সৌন্দর্য—বরং বেড়েছে। তেমনি

নানা রং-য়ের গাছে ছাওয়া প্রায় সমতল প্রশস্ত পথ। মাঝে মাঝে তাঁবু ফেলার মতো প্রান্তর।

মেষপালকদের কয়েকটি কুটির রয়েছে এখানে। এ জায়গাটাকে ওরা বলে ডলপেয়ারী। কুটিরগুলি জনহীন। শীত এসে গেছে, মেষপালকরা নেমে গেছে নিচে।

খানিকটা এগিয়ে আরও কয়েকখানি কুড়েঘর। তেমনি জনশূন্য। বীর বলে, "এ জায়গার নাম নিমদিয়া।"

এত সুন্দর জায়গা! মনে হচ্ছে মাটিও বেশ উর্বরা। কিন্তু জনবসতি নেই। আশ্চর্য!

বীর বলে, "ভয়ানক ভালুকের উৎপাত। তাছাড়া মাঝে মাঝে বাঘেরও উপদ্রব হয়। তাই স্থায়ীভাবে কেউ বসবাস করে না এ অঞ্চলে।"

দুটি পথের সঙ্গমে এসে থামতে হল। একটি পথ দেখিয়ে বীর বলে, "এই আমাদের পথ। ও পথটি চলে গেছে কর্ণৌল হয়ে গোণাতাল। এ জায়গাটার নাম ধারহুরেটা।"

বিচিত্র নামটির কথা ভাবতে ভাবতে এগিয়ে চলি নিজেদের পথে। পথ সুন্দর থেকে সুন্দরতর হচ্ছে। বিচিত্রতর গাছপালার পাশ দিয়ে পথ চলেছি। ফুলে ফলে আর পাতায় রংয়ের বন্যা। চমৎকার আবহাওয়া, বড়ই ভাল লাগছে পথ চলতে।

চলতে চলতে কেবলই দেখছি উপেনবাবুকে। এক মুহূর্ত বিশ্রাম নিচ্ছেন না ভদ্রলোক। সমানে প্রজাতি সংগ্রহ করে চলেছেন।

হাসতে হাসতে অসিতবাবু বলেন, "আজ রাতে উপেনবাবুকে ওভারটাইম করতে হবে।"

উপেনবাবু কোন জবাব দেন না। একটু মুচকি হেসে নিজের কাজ করে যেতে থাকেন।

বেলা তিনটেয় চলা বন্ধ হল। আমরা কুকিনাখাল পৌঁছলাম। গাড়োয়ালী ও কুমায়ুনীরা গিরিবর্ত্মকে খাল বলে। কুকিনাখালও কুমায়ুনের সীমান্তে ১০,২৪০ ফুট উঁচু গাড়োয়ালের একটি গিরিবর্ত্ম। এখান থেকে একটি পথ গেছে ওয়ান, একটি তিনতাল হয়ে নন্দকিশোরী, আর একটি কুঁয়ারি গিরিবর্ত্ম হয়ে জোশীমঠ। মৈত্রমশায় আশা করি নির্বিঘ্নে জোশীমঠ পৌঁছে গেছেন এতদিনে।

জায়গাটার চেহারা কিন্তু মোটেই গিরিবর্ত্মের মতো নয়।

দাশু বলে, "এ তো খাল নয়, এ যে বাগ—বাগিচা।".

সুজল বলে, "আমার তো গুলমার্গের কথা মনে পড়ছে।"

সত্যই তাই। ভারী সুন্দর। পাইন আর দেওদারে ঘেরা সুসমতল প্রান্তর। একটু নিচে একটি ক্ষীণ জলধারা বয়ে যাচ্ছে।

আজ আর আগুন পোহাবার প্রয়োজন নেই। দু'দিনে আমরা চার হাজার ফুটের বেশি নেমে এসেছি। মোটেই শীত লাগছে না। অনেকদিন পরে ভাল করে ঘুমোতে পারব।

নেতা আজ দাতাকর্ণ। কাল কয়েকজন কুলি ছেড়ে দেওয়া হবে। তাই তিনি ওজন কমাবার জন্য গুদাম লুটের অনুমতি দিয়েছেন। ফলে সবার মুখ চলছে।

খাওয়া-দাওয়া সেরে সকাল সকাল শুয়ে পড়েছি। কিন্তু কুলিরা আবার আগুন জ্বালিয়ে জলসা শুরু করল কেন। ওরা কি ঘুমোবে না সারারাত?

"না।" উপেনবাবু বলেন, "ভালুকের ভয় বলে ওরা আগুনের ধারে বসে গান গাইছে।"

শুয়ে শুয়ে শুনতে থাকি সেই অবিশ্বাস্য কাহিনী—কুলিদের গান। যে গান গাড়োয়াল ও কুমায়ুনে মানুষের মুখে মুখে গীত হয়ে আসছে বহুদিন থেকে। ওরা সমবেত কণ্ঠে গাইছে। গান গেয়ে গেয়ে বলছে—

ত্রিশুল পর্বতের ওপর থেকে হর-পার্বতী একদিন আর্যাবর্তের শোভা দেখছিলেন। সহসা পার্বতীর নজর পড়ে বহুদূরের বিশাল এক প্রাসাদের দিকে। তিনি স্বামীকে জিজ্ঞেস করলেন, 'নাথ! ওটা কার প্রাসাদ?'

শিব মৃদু হেসে বললেন, 'তোমার বোন বল্লভার। সে এখন কনৌজরাজ যশোদয়ালের রাণী। ওটা কনৌজের রাজপ্রাসাদ।'

শিবানী তখন ধুনি জ্বালিয়ে শিবকে সেখানে বসিয়ে রেখে, নিজে চললেন বোনের সঙ্গে দেখা করতে। বহুদিন বোনকে দেখেন না তিনি। একদিন ও এক রাতের মধ্যে বোনের সঙ্গে দেখা করে শিবানী ফিরে এলেন ত্রিশুল শিখরে।

কিছুকাল পরে কাশীর পণ্ডিতদের পরামর্শে কনৌজরাজ নন্দাযাতে অংশ নিতে মনস্থ করলেন। খবর পেয়ে বল্লভা বলে বসলেন, তিনিও স্বামীর সঙ্গে যাবেন। বল্লভা তখন সন্তানসম্ভবা। যশোদয়াল তাঁকে অনেক বোঝালেন।

কিন্তু বল্লভা অবুঝ। শেষ পর্যন্ত তিনি স্বামীর সঙ্গিনী হলেন।

রাজা-রাণী গিমতলিতে পৌছলেন। গৌরী দেখতে পেলেন তাঁদের। আনন্দে অধীর হয়ে তিনি নেমে এলেন ত্রিশুল থেকে। কিন্তু বোনের কাছে এসেই তাঁর সকল আনন্দের অবসান হল। বল্লভা একটি সন্তান প্রসব করেছেন। কলুষিত করেছেন শিবালয়কে।

ক্রুদ্ধা শিবানী ছুটে এলেন শিবের কাছে। তিনি স্বামীকে বললেন বল্লভাকে শাস্তি দিতে। ভোলানাথ কিন্তু বল্লভার কোন অপরাধই দেখতে পেলেন না।

গৌরী তখন একে একে সমস্ত দেব-দেবীর কাছে গিয়ে একই অনুরোধ করতে থাকলেন। কিন্তু কেউ তাঁর কথায় কর্ণপাত করলেন না।

অবশেষে ওয়ানের লাটুদেবী এলেন এগিয়ে। তিনি পার্বতীকে বললেন, 'মা আমি বল্লভাকে শাস্তি দেব, শিবালয়কে কলুষমুক্ত করব। কিন্তু আমাকে একটি করুণা করতে হবে।'

'কী?'

'আমি যেন চিরকাল ত্রিশুলের দ্বারী হয়ে থাকতে পারি।'

'তাতে তোমার লাভ?'

'তাহলে যারা হর-পার্বতীর পূজো দিতে আসবে, তাদের প্রথম পূজো পাব আমি।'

'বেশ তাই হবে।'

লাটুদেবী তখন কয়েক দিন ও কয়েক রাত ধরে লৌহবৃষ্টি করলেন। স্বামী ও সন্তানসহ বল্লভা বিদায় নিলেন এ পৃথিবী থেকে।

"সাব চায়।"

ঘুম ভেঙ্গে যায়। চোখ মেলে দেখি কেটলি হাতে বীর দাঁড়িয়ে আছে। তাড়াতাড়ি উঠে বসি। মগ বাড়িয়ে ধরি। বীর চা ঢেলে দেয়। চুমুক দিয়ে বলে উঠি, "আজকের চা-টা একটু অন্যরকম লাগছে!"

"জী।" বীর হাসে, "সকালে গিয়ে নিচের গাঁও থেকে দুধ নিয়ে এসেছি। সেই দুধ দিয়ে চা বানিয়েছি।"

ঘড়ি দেখি। মোটে সাতটা। এরই মধ্যে নিচের গ্রামে গিয়ে দুধ এনে,

সেই দুধ দিয়ে চা বানিয়েছে। বীরশ্রেষ্ঠ বীর সিং।

অসিতবাবু তাঁবুতে আসেন। বলেন, "আপনারা উঠে গেছেন! ভালই হল।"

"কোন দরকার আছে?" উপেনবাবু জিজ্ঞেস করেন।

"হ্যাঁ, মালপত্র রি-প্যাক করতে হবে। আজ থেকে কুলিরা তিরিশ সের করে মাল বইবে।"

"হঠাৎ তাদের এ সুমতি?"

"আমরা ওয়ান এলাকায় এসে গেছি। এখানে তাই নিয়ম।"

অসিতবাবুর সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে আসি। সুজল দাশু মোহিত ও অমিতাভ কয়েকজন কুলিকে নিয়ে মালপত্র বাঁধা শুরু করে দিয়েছে। দেবকীদা বীর সিংকে রান্নায় সাহায্য করছে। লজ্জা পেলাম। ওরা না জানি কখন থেকে কাজ করছে, আর আমরা এতক্ষণ শুয়েছিলাম। তাড়াতাড়ি হাত লাগাই।

আটটার মধ্যে আমাদের কাজ হয়ে যায়। কিন্তু আমাদের হলেই তো হবে না। যারা ছাড়া আমরা অচল, তাদের এখনও পাত্তা নেই। অধিকাংশ কুলিকে নিয়ে কাল রামচাঁদ ওয়ান চলে গেছে। কথা ছিল, সাতটার মধ্যে আসবে। এখনও আসছে না।

তবে বেশিক্ষণ দেরি করতে হল না। নটার সময় রামচাঁদ এলো। এসেই শুরু করল হিসেব। সোজা হিসেব। কিন্তু তাকেই জটিল করে তুলল রামচাঁদ। তার বক্তব্য দেড়া মাল বইবে কাজেই তেইশ জনের জায়গায় পনেরো জন কুলি রাখতে হবে। কিন্তু গত সাতদিনে যে খাবার খরচ হয়েছে, ফলে ওজন কমেছে, তা কিছুতেই মানতে চায় না সে। শেষ পর্যন্ত তার কথাই রইল। নইলে আরও দেরি হয়ে যাবে।

এগারোটার সময় যাত্রা হল শুরু। আমরা রওনা হলাম ব্রহ্মতালের পথে।

রঙীন বন দিয়ে ঘেরা তৃণভূমি—ধীরে ধীরে ওপরে উঠে গেছে। মিশেছে সামনের শ্যামল পাহাড়টির চূড়োয়। সেই বনপথ দিয়ে আমরা আস্তে আস্তে ওপরে উঠছি।

একটু বাদেই বনাবৃত একফালি সমতল প্রান্তর। নানা রঙের ফুলের মেলা। মনে হয় মানুষের হাতে গড়া—সযত্নে রচিত কানন।

বড় গাছের সারি অর্ধবৃত্তাকারে বেষ্টন করেছে একটি শ্যামল তৃণাচ্ছাদিত প্রায়-সমতল প্রান্তরকে। যেন গাছে ঘেরা বুগিয়াল।

সবাই বসে পড়ি। এমন সুন্দর জায়গায় বসে যাব না কিছুক্ষণ? এখান থেকে চারিদিক চমৎকার দেখা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে বৈদিনী বুগিয়াল, দেখা যাচ্ছে ত্রিশুল ও নন্দাঘুন্টি। মনে হচ্ছে না আমরা ওদের থেকে এতো দূরে চলে এসেছি। মনে হচ্ছে, ওরা যেন এখনও রয়েছে তেমনি কাছে। কিন্তু আর কতদিন?

সহসা মেঘ ঘনিয়ে এলো ত্রিশুল আর নন্দাঘুন্টির শিরে। তাদের সোনালী শিখর দুটিকে কে যেন কালো একখানি যবনিকা দিয়ে ঢেকে দিল। কে আবার দেবে? ওরা নিজেরাই নিজেদের আড়াল করে নিল। ওদের অভিমান হয়েছে। আমরা যে ওদের ছেড়ে চলে যাচ্ছি দূরে। ওরা তো জানে না, যত দূরে যাই, ওরা থাকবে আমাদের কাছে। ওরা চিরকাল রইবে আমার অন্তরের অন্তরলোকে, আমার মনের মুকুরে, আমার হৃদয়-সরসীর তীরে।

নেতার নির্দেশে উঠে দাঁড়াতে হয়। আমরা চড়াই বেয়ে উঠে আসি ওপরে। ভেবেছিলাম এখানে এলেই চড়াই শেষ হবে। কিন্তু বীর সামনের উঁচু পাহাড়টি দেখিয়ে বলে, "এখন ঐ পাহাড়টায় চড়তে হবে।"

বলা আর চড়া এক কথা নয়। তার ওপর পথের প্রকৃতি একেবারে পালটে গেল। স্যাঁতসেঁতে পিচ্ছিল পথ। একটু এদিকওদিক হলেই হাজার ফুট নিচে পড়ে যাব।

কঠিন চড়াই। দম ফুরিয়ে যাচ্ছে। গলা শুকিয়ে আসছে। কিন্তু কোথাও জল নেই। ওয়াটার বটলের জল শেষ হয়ে গেছে। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হয়ে পড়েছি।

বেলা একটার সময় একটি ক্ষীণ জলধারা পাওয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে সবাই বসে পড়ল সেখানে। জল তেমন পরিষ্কার নয়। কিন্তু জল তো বটে। আকণ্ঠ তৃষ্ণা মিটিয়ে আলুসিদ্ধ খেয়ে নিই।

চলতে চলতে দেবকীদা জিজ্ঞেস করেন, "ভাই বীর, আমাদের যে ব্রহ্মতালু শুকিয়ে গেল। তোমার ব্রহ্মতাল আর কতদূর?"

বীর দিগন্তের দিকে ইশারা করে বলে, "উয়ো যো টাপ্ হ্যায়, উসকো বাদ চড়হাই খতম্।"

টাপ মানে ইংরেজী টপ্ অর্থাৎ পর্বতশিখর। সে শিখরটি কোথায়, কতদূরে কিছুই বুঝতে পারি না। কেবল বীরের কণ্ঠস্বরের ওপর নির্ভর করেই নতুন উদ্যমে চড়াই ভাঙতে থাকি।

সারি বেঁধে ওপরে উঠছি। পথ আর ফুরোতে চাইছে না। মাঝে মাঝে হারিয়ে যাচ্ছে। আবার খুঁজে নিতে হচ্ছে।

বীর বলে, "এ জায়গার নাম মুনিয়াল ঠোক, মানে মুনিয়াল মারার জায়গা। গ্রীষ্মকালে এখানে মুনিয়ালের মেলা বসে।" একবার থামে সে। তারপরে বলে, "এবারে আমাদের ঐ পাহাড়টায় চড়তে হবে। ওর নাম পাটিয়া খড়ক।"

"মুনিয়াল ঠোক তো হল। আদমী ঠোকটা কোথায়? তার পরেই কি তোমার সেই টাপ্।" দেবকীদা জিজ্ঞেস করেন।

বীর মুখে কিছু বলে না। কেবল ঘাড় নাড়ে, যার অর্থ 'হ্যাঁ' কিংবা 'না' দুই হতে পারে। আবার কোনটাই না হতে পারে। আর কিছু না বলে আমরা তার পেছনে চলতে থাকি। হাঁটুসমান ঘাস ভেঙে চড়াই পথ। ঘাসের মাঝে লুকিয়ে আছে বড় বড় পাথর। প্রতি মুহূর্তে পড়ে যাবার আশঙ্কা। পিপাসায় গলা শুকিয়ে আসছে। কিন্তু কোথাও জল নেই। জলের ভাবনায় অন্যমনস্ক হবার অবকাশও নেই। সব ভাবনা ভুলে পথের দিকে প্রখর নজর রাখতে হচ্ছে।

সহসা সুজল তার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বলে ওঠে, "মাগো মা, তুমি যদি আমার এ কষ্ট দেখতে পেতে, তাহলে কেঁদে কেঁদে সারা হতে।"

কথাটা মিথ্যে নয়। আমরা চুপ করে থাকি। কিন্তু চুপ থাকতে পারেন না অসিতবাবু। তিনি বলেন, "তুই বড় স্বার্থপর।"

"কেন?"

"কেবল নিজের মায়ের কথাই ভাবছিস, আমাদের মা-কে মনে করছিস না। তাঁরা যেন আর কাঁদতে জানেন না।"

"তাঁদের পুত্রবধূরা কিন্তু আরও বেশি কাঁদতে পারেন অসিতদা।" সুজল এগিয়ে যায়।

আমরা উঠে আসি পাটিয়া খড়কের ওপরে। দেবকীদা বলেন, "এবারে কোন্ খড়ক বীর।"

"লাল লিংড়া খড়ক।"

"মানে।" দাশু জিজ্ঞেস করে।

"লাল সিংওয়ালা বকরির পাহাড।"

"গাড়োয়ালে কিন্তু খড়ক মানে হিমবাহ। এখানে বুঝি পাহাড়?"

"জী।" বীর উত্তর দেয়।

"এই কি শেষ টাপ্?" দেবকীদা প্রশ্ন করেন।

"জী সাব।" এবারে বীর উত্তর দেয়।

হঠাৎ কয়েক ফোটা জল গায়ে পড়ল। বৃষ্টি নামল নাকি? আকাশের দিকে তাকাই। হ্যাঁ, বৃষ্টি নেমেছে। বৃষ্টিতে পথ পিচ্ছিল হবে, দুর্গম থেকে দুস্তর হবে। পথিক কখনও বরুণকে বরণ করে না সানন্দে। কিন্তু আমরা করলাম। আমরা তৃষ্ণার্ত। আমরা চাতকের মতো হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। প্রাণভরে স্বর্গবারি পান করলাম।

একটু বাদে তুষারপাত আরম্ভ হল। আমরা একখানি পাথরের আড়ালে আশ্রয় নিই। তুষারপাত কমলে আবার শুরু হয় পথ চলা। ভয়ানক দুর্গম পথ। খুব ধীরে ধীরে উঠতে হচ্ছে। মনে হচ্ছে নাচতে নাচতে চলেছি—যেন আমাদের জুতোর নিচে কেউ চাকা লাগিয়ে দিয়েছে।

একসময় এসে পৌছলাম লাল লিংডা খডকের শিখরে। আর দেখতে পেলাম সেই অদ্ভুত দৃশ্য—বিরাট একটা জন্তু হাত-পা গুটিয়ে উপুড় হয়ে আছে। সামনে, ওপরে—আকাশের গায়ে। বীরের দিকে তাকাতেই সে বলে ওঠে, "বরাম্‌তাল পাহাড়। এর ওপারেই তাল। ওপরে উঠলে দেখা যাবে।"

"তাহলে এই তোমার শেষ টাপ্?"

"জী সাব।"

আমরা পা চালাই। কিন্তু আর যে চলতে চাইছে না। পায়ের কি দোষ?

বহু কষ্টে উঠে আসি ব্রহ্মতাল পাহাড়ের শিখরে। তৃণাচ্ছাদিত—অনেকটা মালভূমির মত। এখান থেকে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। তবে মেঘের জন্য এখন ভাল করে দেখা যাচ্ছে না সব। তবু ইশারা করে বীর বলতে থাকে, "ঐ দেখুন ওয়ান। তারপরে পিরি, ওলাংগুরা, কানে, পটিয়া, ববনবিরা ও শিরোর গ্রাম। আর ওদিকে বুঙ্গা, বুরশোল, রতগাঁও, কুলবুড়ি ও ডুংরি।"

ওর দৃষ্টিশক্তি বোধ হয় আমাদের চেয়ে প্রখর। নইলে এতো সব দেখতে পাচ্ছে কেমন করে? তবে আমরা যে কিছুই দেখছি না, তা নয়। আমরা দেখতে পাচ্ছি ত্রিশূল আর নন্দাঘুন্টি। আবার তারা দেখা দিয়েছে। ঠিক

তেমনি ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। মনেই হচ্ছে না আমরা ইতিমধ্যে আরও দূরে চলে এসেছি।

একটা পাথরের বেদীর কাছে এসে বীর থামে। বলে, "ভুংরি গ্রামের নন্দাযাত এখানে এসে নন্দামূর্তি নামায়—যাত্রীরা বিশ্রাম করে। চড়াই ভেঙে উঠে আসতে হয় কিনা।"

আমরাও চড়াই ভেঙ্গে উঠে এসেছি এখানে। আমরাও বসে পড়ি। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে উঠে দাঁড়াই। দেবকীদা বীরকে জিজ্ঞেস করেন, "টপাটপ তো টাপ শেষ হল, এবার বরামতাল কোথায়?"

নিচে একটি বিন্দু দেখিয়ে বীর বলে, "ঐ যে।"

মোটেই আশ্বস্ত হতে পারি না। বুঝতে পারছি এখনও সে বহুদূরে। তবু চলতে থাকি উৎরাই পথে। পিপাসায় গলা শুকিয়ে আসছে। কিন্তু কোথাও জল নেই। জল অনেক নিচে—ব্রহ্মতালে। আমরা সেখানেই চলেছি। কেউ কোন কথা বলছি না। যন্ত্রের মতো পথ চলেছি।

বিন্দুটি ক্রমেই বড হচ্ছে। আমরা নেমে আসছি। এবারে বোঝা যাচ্ছে ব্রহ্মতাল জলাশয়। আর সে একা নয়। কাছাকাছি আরও কয়েকটি হ্রদ আছে। ওখানে পৌছতে পারলে জল পাব। জল নয়, জীবন। আমরা জোরে জোরে চলতে শুরু করি। জোরে আরও জোরে। কাছে আরও কাছে—ডিম্বাকৃতি শান্ত সুনীল জলাশয়ের তীরে।

পরদিন। রাত দশটা। এইমাত্র গোয়ালদাম ডাকবাংলোয় পৌছলাম। আমাদের গিরি-কান্তার পরিক্রমার প্রথম অধ্যায় শেষ হল। কাল সারাদিন বিশ্রাম। পরশু সকালের বাসে চেপে গরুড় হয়ে বাগেশ্বর যাব। সেখানে মেজর ও প্রাণেশ অপেক্ষা করছে। তাদের সঙ্গে নিয়ে বাসে করে কাপকোট যাব। সেখান থেকে আবার আরম্ভ হবে পদযাত্রা। আমরা পিণ্ডারী হিমবাহ দর্শন করব।

কিন্তু সে-সব তো ভবিষ্যতের কথা। ভবিষ্যতের কথা বলার অনেক সময় পাওয়া যাবে। এখন অতীতের কথা বলে নিই। আজকের সারাদিনের কথা। এমন দিন পদযাত্রীর জীবনে বড় বেশি আসে না।

গতকাল আমরা ৮ মাইল হেঁটেছি—কুকিনাখাল থেকে ব্রহ্মতাল। পরশু হেঁটেছি ৯ মাইল—বড়াজলচুঙ্গা থেকে কুকিনাখাল। তার আগের দিন ১০

মাইল—ছনিয়াথর থেকে বড়াজলঢুঙ্গা। আর আজ? আজ ২০ মাইল—ব্রহ্মতাল থেকে গোয়ালদাম। সারাদিন প্রায় উপবাসী থেকে আমরা এই দীর্ঘ ও দুর্গম পথ পাড়ি দিয়েছি।

কয়েকখানা বিস্কুট আর দুটি করে আলুসিদ্ধর সঙ্গে আধমগ কফি খেয়ে সকাল আটটা নাগাদ রওনা হয়েছিলাম ব্রহ্মতাল থেকে। খাবারের থলিটা দেওয়া হয়েছিল কুলি রতন সিংকে। কথা ছিল, সে আমাদের সঙ্গে থাকবে। দুপুরে কোন ঝরণার ধারে বসে লাঞ্চ সেরে নেবো। কোন সুযোগে সে যেন পেছিয়ে পড়েছে। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়েছে, বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা, সন্ধ্যা শেষে রাত। এখনও রতন সিং এসে পৌছয় নি। শুধু সে-ই একা নয়। আসে নি অন্য কুলিরা। রাতটা বোধ হয় আমাদের ভিজে পোশাকে ভূমি-শয্যায় কাটাতে হবে।

কুলিদের কথা ভেবে আর কি হবে? তার চেয়ে বরং পথের কথা ভাবা যাক্—আজকের পথ।

আজ রওনা হয়ে বীর সিং-এর সঙ্গে আমরা আবার উঠে এসেছি কালকের সেই ব্রহ্মতাল পাহাড়ের ওপরে। পথে এক জায়গায় গুটিকয়েক মরচে পড়া ত্রিশুল, একটি পেতলের প্রদীপ আর কয়েকটি বিবর্ণ পতাকা দেখে একবার দাঁড়িয়েছি সেখানে। বীর বলেছে—বিনায়কের স্থান। গণপতির উদ্দেশে একটি প্রণাম রেখে এসেছি এগিয়ে। উঠে এসেছি ব্রহ্মতাল পর্বতশিখরে। আজ আবহাওয়া ভাল ছিল। সূর্যালোকে ঝলমল করছিল চারিদিক। ভাল করে একবার চারিদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে আমরা উৎরাই পথে নামতে শুরু করেছি।

উৎরাই কোথাও কম, কোথাও বেশি। একসময় আমরা পৌছেছি বড়গাছের গণ্ডিতে—তেলাইনির বনে। বন ক্রমেই ঘন হয়েছে। এই গহন বনের ভেতরেই ভিকলতাল বা বিগুনতাল। গাছে ছাওয়া ছোট একটি হ্রদ। কখনই রোদ পড়তে পারে না। গাছের পাতা পড়ে পড়ে জল পচে গেছে। তাই বীর জল খেতে দেয় নি আমাদের।

তারপরে ধীরে ধীরে বন হালকা হয়েছে। আর সেই বনের সীমাতেই খপলুতাল। বীর বলেছে—খোপতালিয়াতাল। হ্রদের ধারে রয়েছে কয়েকটি কুটির। হ্রদটি ছোট কিন্তু ভারী সুন্দর। গাছ কম—জলে রোদ পড়ে। পরিষ্কার জল। আমরা হাত-মুখ ধুয়ে প্রাণভরে জল খেয়েছি। তারপরে একটি

গাছের ছায়ায় বসে খাবারের অপেক্ষা, রতন সিংয়ের প্রতীক্ষা করেছি। কিন্তু কোথায় রতন? রতন পাওয়া কি অতই সহজ? বৃথাই সময় নষ্ট হয়েছে। বিরক্ত হয়ে একসময় আমরা চলা শুরু করেছি।

কয়েকটি অদ্ভুত গাছ দেখে চলা বন্ধ হয়েছে আমাদের। গুঁড়িগুলি একেবারে ফাঁপা। সেখানে নাকি দেব-দেবীরা বসবাস করেন। তাই গাছের গোড়ায় মানতের ত্রিশূল আর সিঁদুরের প্রলেপ।

পাথর কম হলেও, পথটি মোটেই সমতল নয়। বড় বড় গাছের সারি সারি শিকড় ডিঙ্গিয়ে পথ চলতে হয়েছে। শিকড় তো নয়, যেন গিরিশিরা।

খিদেয় ছটফট করেছি। মাঝে মাঝে পথের ওপর বসে পড়েছি। রতনের পথ চেয়ে বসে রয়েছি। কিন্তু কোথায় রতন? রতন আসে নি।

পৌঁছেছি ফরালী—একটি সমতল শিখর। দেখা হয়েছে একজন মেষপালকের সঙ্গে। সব শুনে সে তার সামান্য সম্বল থেকে কয়েকটি কাঁকুড় দিয়েছে আমাদের। তাই খেয়ে কোনমতে কিছুক্ষণের জন্য জঠরাগ্নির জ্বালা নিবারণ করেছি।

কিছুদূর এগিয়ে বমোটিয়া। একটি জলধারা পেয়ে প্রাণভরে জল খেয়েছি। বসেছি কিছুক্ষণ। কিন্তু আসে নি রতন।

তারপরে কারবলি গ্রাম। কিছুই জোটে নি সেখানে। কয়েকটি কাঁকুড় জুটেছে পরের গ্রাম সিরন্‌থলে।

মাল্লাধার ও তাল্লাধার গ্রাম পেরিয়ে বিকেল পাঁচটায় পৌঁছেছি নন্দকিশোরী। বড় আশা ছিল সেখানে ডাল-রুটি পাব। কিন্তু সে আশা বিফল হয়েছে। খানিকটা ছোলাভাজা ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় নি। এক গেলাস করে চায়ের সঙ্গে তাই ভাগ করে খেয়ে আমরা পুরনো পথে পা বাড়িয়েছি।

পথ পুরনো হলেও, পথের প্রকৃতি ভিন্ন। যাবার সময় সে উৎরাই ছিল, আসার সময় চড়াই হয়েছে। ভয়ঙ্কর চড়াই। কিছুক্ষণের মধ্যে আঁধার নেমে এসেছে পথে। পিপাসায় গলা শুকিয়ে এসেছে। তবু অন্ধের মতো হাতড়ে হাতড়ে পথ চলেছি, ধুঁকতে ধুঁকতে কোনমতে ফিরে এসেছি গোয়ালদাম—যেখান থেকে বারো দিন আগে আমাদের এই পদযাত্রা শুরু হয়েছিল।

পথশ্রমে সবাই ক্লান্ত ও অবসন্ন। যে যেখানে পেরেছি, শুয়ে পড়েছি। চৌকিদার আগুন আর আলো জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে। সবাই চোখ বুজে

পড়ে আছি। কেবল আলোর কাছে বসে ডায়েরী লিখছে সুজল। লিখছে—

'ডায়েরী লেখার এমন আদর্শ অবসর জীবনে হয়তো আর কখনও আসবে না। তাই এই লোভটুকু সামলাতে পারলাম না।

'আজকের দিনটি বোধ হয় এ যাত্রার সব চেয়ে স্মরণীয় দিন। বারো ঘণ্টা হেঁটে আমরা ব্রহ্মতাল থেকে থেকে গোয়ালদাম এসেছি। আমার মনের মণিকোঠায় এ দিনটির স্মৃতি অক্ষয় হয়ে রইবে।

'বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা হল আজ। অনাহারে পথ চলার অভিজ্ঞতা, অন্ধকারে দুর্গম পথ পেরোবার অভিজ্ঞতা, সন্ধ্যাতারার আলোয় পথ চিনে নেবার অভিজ্ঞতা। ভয়ঙ্কর ও সুন্দর এই অভিজ্ঞতার কথা চিরকাল মনে থাকবে।

'মনে পড়ছে—কিছুক্ষণ আগেও কোথায় ছিলাম! গহন বনের মধ্য দিয়ে অন্ধকার চড়াই পথ। মারাত্মক চড়াই। ঘামে সমস্ত শরীর ভিজে গেছে। চশমা ঝাপসা হয়ে এসেছে। কিছুই দেখতে পারছিলাম না, তবু ছুটে আসছিলাম। জানতাম পদস্খলন মানেই মৃত্যু। মৃত্যুকে তুচ্ছ জ্ঞান করে সেই ভয়ঙ্কর পথ অতিক্রম করে এসেছি আমি আর আমার সহযাত্রীরা। সারাদিনের ক্লান্তিতে সহযাত্রীরা ঢলে পড়েছে নিদ্রার কোলে। কিন্তু ঘুম আসছে না আমার। আমি কেবল ভেবে চলেছি আজকের পদযাত্রার কথা।

'কখন যেন চাঁদ উঠেছে আকাশে—কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ। জ্যোৎস্নাধারায় গোয়ালদাম ভেসে যাচ্ছে। ডাকবাংলোর নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে বসে কাচের জানলা দিয়ে আমি বার বার গোয়ালদামকে দেখছি। গোয়ালদামের কথাও চিরকাল মনে থাকবে আমার। আমি আবার আসবো এখানে। কয়েকটা দিন কাটিয়ে যাবো এই রমণীয় নিকেতনে।'

॥ পঁচিশ ॥

বাস থেকে নামতেই প্রাণেশ এসে জড়িয়ে ধরে আমাকে। একসঙ্গে গিরি-কান্তার পরিক্রমায় বেরিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলাম। আজ আবার আমরা মিলিত হলাম বাগেশ্বরে। একটু আগে আমাদের বাস এসে বাগেশ্বরে থামল।

সবার সঙ্গে ওর আলিঙ্গন শেষ হলে, প্রাণেশকে জিজ্ঞেস করি, "মেজর কোথায়?"

"রানীক্ষেতে।"

"কেন?"

"তা বলতে পারব না। পরশু আমরা মুনসিয়ারী থেকে এখানে ফিরে এসেছি। এসেই তিনি আমাকে বললেন—তুমি সহযাত্রীদের জন্য অপেক্ষা করো এখানে। ওদের সঙ্গে পিণ্ডারী হিমবাহ দেখে ফিরে যেও কলকাতায়। আমি কাল সকালে রানীক্ষেত চলে যাচ্ছি।"

"আশ্চর্য! তাঁরই আগ্রহে আমরা পিণ্ডারী হিমবাহে যাচ্ছি আর তিনি চলে গেলেন। তুমি কিছু বললে না তাঁকে?" দেবকীদা প্রাণেশকে প্রশ্ন করেন।

"বলেছিলাম। উত্তরে তিনি বললেন—আমার মনটা ভাল নেই ভাই। এ রকম মানসিক অবস্থায় তোমাদের সঙ্গী হতে চাই না।"

"হঠাৎ কি হল, কিছু বুঝতে পেরেছো?" মোহিত জিজ্ঞেস করে।

"না।" প্রাণেশ বলে, "যাবার পথে বেশ স্ফূর্তিতে ছিলেন। অথচ রাত্তি ডাকবাংলোয় পা দেবার পরেই তিনি যেন কেমন আনমনা ও উদাসীন হয়ে পড়লেন। কিন্তু মুখে কিছুই বলেন নি। ফেরার পথেও চুপচাপ ছিলেন। এখানে এসে কেবল বললেন ঐ কথা।"

মনটা খারাপ হয়ে গেল। রানীক্ষেতে আলাপ হয়েছিল। বহুদিন থেকে তিনি সেখানে আছেন। তাঁর সঙ্গে আমরা বিনসর গিয়েছিলাম। যতদূর জানতে পেরেছি, তিনি একজন প্রাক্তন মেজর। সংসারে কেউ নেই। তিনি হিমালয়ে অনেক ঘুরেছেন। বড়ই আমুদে লোক। তাঁর সঙ্গে হিমালয়ে কয়েকটা দিন কাটাবার জন্য দিন গুনছিলাম। তা আর হয়ে উঠল না।

"চলুন ডাকবাংলোয় যাওয়া যাক।" প্রাণেশ তাড়া লাগায়, "রুকস্যাক আর খাবারের কিটগুলো নিয়ে চলুন। বাকি মাল সব বাস অফিসেই থাকবে। আমি ওদের সঙ্গে ব্যবস্থা করেছি। কাল ওরাই কাপকোটের বাসে মাল তুলে দেবে।"

তাই করা হল। আমরা ডাকবাংলোয় রওনা হলাম। পাথর বাঁধানো পথ। বাসস্ট্যাণ্ডের পরে পথের দুদিকে দোকানপাট। পেছনের দিকে বাড়ি-ঘর। এটি কিন্তু প্রধান বাজার নয়। বড় বাজার গোমতীর ওপারে—নতুন শহরে।

সরযূ ও গোমতীর সঙ্গমে ২৯° ৫০′ ১৫″ উত্তর এবং ৭৯° ৪৮′ ৫২″

পূর্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত ৩১৪৩ ফুট উঁচু একটি সুপ্রাচীন জনপদ বাগেশ্বর। আলমোরা জেলার একটি মহকুমা শহর। বাসে আলমোরা থেকে ৫৬ ও কাঠগুদাম থেকে ১১৩ মাইল। হাঁটাপথে আলমোরা থেকে ২৬ মাইল। এ পথটি পদযাত্রীদের বড়ই প্রিয়—ভারী সুন্দর পথ।

এখান থেকে আরও দুটি মোটরপথ আছে। একটি চৌকড়ী হয়ে পিথোরাগড় আর একটি কাপকোট হয়ে শামাধুরা।

বহুকাল থেকেই বাগেশ্বর ভারত-তিব্বত বাণিজ্যের একটি বড় কেন্দ্র ছিল। তিব্বত স্বাধীনতা হারাবার পরে সে বাণিজ্য বন্ধ হয়ে গেছে। তাহলেও তাঁত ও পশমজাত দ্রব্য আমদানি-রপ্তানির একটি বড় কেন্দ্র বাগেশ্বর। নিকটবর্তী বোরগাঁও-য়ে একটি ট্যানারী আছে। এ অঞ্চলে সোপস্টোন, গ্রাফাইট, লোহা, তামা ও স্ফটিকের খনি আছে।

বেশ কিছুটা এসে আমাদের পথ বাঁয়ে বাঁক নিল। এখানেই ডানদিকে মন্দিরের পথ গেছে নেমে। আমরা বড় রাস্তা ধরে বাঁয়ে এগিয়ে চললাম। দু'দিকেই দোকানপাট ও বাড়ি-ঘর। বাঁদিকে বাড়ির পেছনে টিলা আর ডান দিকে দোকানের পরে সরযু। তিন ভাই ও প্রিয় প্রজাদের সঙ্গে যে নদীর পুণ্যসলিলে পরমপুণ্যবান শ্রীরামচন্দ্র মরদেহ বিসর্জন দিয়েছিলেন, সেই পুণ্যতোয়ার তীর দিয়ে পথ চলেছি আমরা।

সরযু কুমায়ুনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নদী। গোমতী, পনার ও রামগঙ্গা (পিথোরাগড়) তিনটি প্রধান শাখানদী সরযুর। জোলজিবীতে কালী নদী এসে মিলেছে সরযুর সঙ্গে।

একটু এগিয়ে পথের ডানদিকে পুল। ওপর দিয়ে বাস চলাচল করে। গোমতীর ওপরেও একটি পুল আছে। দুটি পুলই প্রাচীন। প্রথমে ছিল দড়ির ঝুলা। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের বন্যায় সে ঝুলা দুটি ভেসে যায়। তারপরে ১৪৭ ও ৬০ ফুট দীর্ঘ দুটি লোহার তারের ঝুলা তৈরি হয় সরযু ও গোমতীর ওপরে। এখন নির্মিত হয়েছে পুল।

পুলের ওপর দাঁড়িয়ে দর্শন করি মার্কণ্ডেয় শিলা। মহামুনি মার্কণ্ডেয় নাকি এই শিলার ওপরে বসে তপস্যা এবং দুর্গা সপ্তসতী পুঁথি রচনা করেছিলেন। শিব এই শিলায় বসে হিমবানের মেয়েকে বিয়ে করেন।

পুণ্যশিলাকে প্রণাম করে আমরা এপারে আসি। একটু এগিয়ে বাঁ দিকের পথ ধরে উঠে আসি ডাকবাংলোয়। নির্মাণ বিভাগের বেশ বড় বাংলো।

পথের পাশে পাহাড়ের ওপর অবস্থিত। চমৎকার অবস্থান। শহর বড়ই সুন্দর দেখাচ্ছে এখান থেকে। সরযূ আর গোমতীকে মনে হচ্ছে দুটি আঁকাবাঁকা রূপোলী রেখা।

স্নান করে খেয়ে নিলাম। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে চললাম সঙ্গম ও মন্দির দর্শন করতে।

সঙ্গমটি সমতল। অনেকটা খালি জায়গা। এখানেই মেলা বসে। মকর সংক্রান্তি, কার্তিক পূর্ণিমা, গঙ্গা দশহরা ও শিবরাত্রিতে মেলা বসে এখানে। মকর সংক্রান্তির মেলাকে বলে উত্তরায়ণীর মেলা। এটি কুমায়ুনের একটি শ্রেষ্ঠ সামাজিক ও বাণিজ্যিক সম্মেলন।

সঙ্গম থেকে উঠে এসে লোকালয়ের মধ্যে মন্দির। দেয়াল ঘেরা—ছোট তোরণ। ভেতরে ঢুকে মন্দির প্রাঙ্গণ—গাছে ছাওয়া। প্রায় কেন্দ্রস্থলে মাঝারি আকারের প্রাচীন মন্দির। বাঘনাথ মন্দির। কেউ বলে ব্যাঘ্রেশ্বর, কেউ বা বলেন বাক-ঈশ্বর। মন্দিরের সামনে অনেকগুলি ঘণ্টা ঝুলছে, ভেতরটা অন্ধকার। আরও কয়েকটি মন্দির আছে এখানে—দত্তাত্রেয়, ভৈরবনাথ ও গঙ্গাজীর মন্দির।

বাঘনাথ মন্দিরের সঠিক নির্মাণকাল জানা যায় নি। তবে ১৪৫০ খৃষ্টাব্দে চাঁদরাজা লক্ষ্মীচন্দ্র মন্দিরটির আমূল সংস্কার সাধন করেন।

বৈজনাথের মতই বাগেশ্বর সুবিস্তৃত ও শস্যশ্যামল উপত্যকা। দুয়ের যোগাযোগও সুপ্রাচীন। দূরত্ব মাত্র বারো মাইল। কাজেই বাগেশ্বর কাত্যুরী প্রভাবিত নগর। এখানে কাত্যুরী রাজা ভূদেবের শিলালিপি পাওয়া গেছে, অথচ কাত্যুরী আমলের কোন মন্দির নেই। কেবল কয়েকটি ভগ্নমূর্তি পাওয়া গেছে।

দর্শন শেষে বাজারে আসি। কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরির পরে ফিরে আসি ডাক-বাংলোয়। চৌকিদার চেয়ার বের করে দেয় সামনের সবুজ লনে। কেবল সন্ধ্যা হয়েছে। চাঁদ উঠতে দেরি আছে এখনও। কিন্তু বাগেশ্বরকে মন্দ লাগছে না। চাঁদ উঠলে তার এমন রূপ যাবে হারিয়ে। আলো-আঁধারি এই রূপটি বড় ভাল লাগছে দেখতে। ভাল লাগছে শুনতে সরযূর কলতান। দেখতে পাচ্ছি না, কেবল শুনছি তার গান।

এলোমেলো কথার মাঝে হঠাৎ অমিতাভ প্রশ্ন করে প্রাণেশকে, "মেজর যাবার সময় তোমাকে কি বললেন ?"

"নিজের সম্পর্কে কিছুই বলেন নি। জানেনই তো তিনি নিজের প্রসঙ্গে নির্বাক। কেবল আমাকে ছোট একখানি খাতা দিয়ে বললেন—এর মধ্যে আমার প্রথম মুনসিয়ারী যাত্রার কথা লেখা আছে। তখনকার পথের সঙ্গে এখনকার পথের কোন মিল পাবে না খুঁজে। কিন্তু সেদিনকার কাহিনী বোধ হয় খারাপ লাগবে না তোমাদের। সহযাত্রীরা এলে খাতাখানি তাদের পড়তে দিয়ে বলো, এখানা তাদের আমি উপহার দিয়ে গেলাম।"

প্রাণেশ ভেতরে যায়। একটু বাদে একখানি খাতা নিয়ে ফিরে আসে। বলে, "দাশুদা আপনি পড়ুন।"

প্রাণেশের হাত থেকে খাতাখানি নিয়ে খুলতে খুলতে দাশু বলে, "আমি পড়ব ?"

"বেশ তো পড়ো না।" দেবকীদা বলেন।

দাশু আর কোন কথা না বলে পড়তে শুরু করে—

'যে কথা বলব ভাবি, বলতে পারি না,
যে কাহিনী লিখব ভাবি, লিখতে পারি না,
যে দেশে যাব ভাবি, যেতে পারি না।

অথচ আমার কণ্ঠ বলতে চায় সেই না-বলা কথা, আমার লেখনী লিখতে চায় সেই না-লেখা কাহিনী, আমার চরণ যেতে চায় সেই না-যাওয়া দেশে।

কিন্তু চাইলেই তো পাওয়া যায় না—চাওয়ার সঙ্গে পাওয়ার বিরোধ চিরকাল। আর এই না-পাওয়া মানব-মনের চিরন্তন সমস্যা।

তবু মানুষ কথা বলে, কাহিনী রচনা করে, পদযাত্রায় অংশ নেয়। আর সে-কথা, সে-কাহিনী ও সে-যাত্রাকে কখনও কখনও তার মনের মত বলে মনে হয়। এই মনে হওয়ার সঙ্গে হয়তো মনের কোন সত্যিকারের মিল নেই। কিন্তু মিথ্যের মধ্যেও তো মানুষ সাময়িক আনন্দ পায়। এ পাওয়াও কম নয়।

তেমনি এক কাহিনী আজ তোমাকে বলতে বসেছি আমি। আমার মনের কথা তোমার মনের মত হবে কিনা জানি না। যদি না হয়, তাহলে জেনো সেটা কাহিনীর দোষ নয়, কাহিনীকারের অযোগ্যতা।

সে-কথা আমার হলেও, সে-কাহিনী আমাদের দুজনের। আর সে-দেশ কমনীয়া কুমায়ুনের কনিষ্ঠা-কন্যা পিথোরাগড় জেলার মুনসিয়ারী মহকুমা।

পদযাত্রীদের প্রাণপ্রিয় পিথোরাগড়, পর্বতাভিযাত্রীদের প্রাণের স্বর্গ

পিথোরাগড়। পিথোরাগড়ের পথে ও প্রান্তরে, তার গিরি-কান্তারে ছড়িয়ে আছে রং-বেরংয়ের ফুল, রকমারী ফল আর নানা জাতের পশুপাখী। পিথোরা-গড়ের পরিবর্তনশীলা প্রকৃতি পথিকের পথশ্রমকে দূর করে, তার হৃদয় ও মনকে পরম প্রশান্তিপূর্ণ করে তোলে। পথিক পাগল হয় পিথোরাগড়ের পথে। কিন্তু না, এখন পথিকের কথা নয়, এখন পথের কথা বলে নিই।

মুনসিয়ারী দুর্গমতর কুমায়ুন হিমালয়ের প্রবেশ তোরণ। গাড়োয়াল-কুমা-য়ুনের কয়েকটি বিখ্যাত পর্বতশৃঙ্গ এই অঞ্চলে অবস্থিত। এদের মধ্যে আছে— নন্দাদেবী, নন্দাদেবী-পূর্ব, নন্দাকোট, নন্দাখাত, পঞ্চচুলি ও ত্রিশুলী।

নন্দাকোট শৃঙ্গে ভারতীয় অভিযাত্রীরা আরোহণ করেছেন ১৯৫৯ সালের ২৫শে মে। কমাণ্ডার এম. এস. কোহলী এই অভিযানের নেতৃত্ব করেন। কে. পি. শর্মা শিখরারোহণকারীদের অন্যতম।

১৯৬১ সালের ২০শে অক্টোবর এক তরুণ অভিযাত্রীদল নন্দাখাত শিখরে আরোহণ করেন। শিখরবিজয়ী দলনেতার নাম পৃথ্বী চৌধুরী। বীরেন সরকার এই অভিযাত্রীদলের সদস্য ছিল।

নন্দাদেবী ভারতের উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গ। ১৯৬৪ সালের ২০শে জুন লেঃ কর্নেল এন. কুমারের নেতৃত্বে এই সুদুর্গম শিখরে ভারতের জাতীয় পতাকা প্রথম প্রোথিত করেছেন নওয়াং গমবু। তাঁর সঙ্গে ছিলেন শেরপা দাওয়া নরবু।

এই বছরই ৪ঠা, ৫ই ও ৬ই জুন ফ্লাঃ লেঃ এ. কে. চৌধুরীর নেতৃত্বে দুর্গম পঞ্চ-চুলির তিনটি শৃঙ্গে ভারতীয় অভিযাত্রীরা আরোহণ করেছেন। অমূল্য সেন শিখরারোহণকারীদের অন্যতম।

মুনসিয়ারী যাওয়া আর মুসৌরী যাওয়া এক নয়। 'দুগ্‌গা' বলে বেরিয়ে পড়লেই মুনসিয়ারী যেতে পারবে না। এ যাওয়ার জন্য আয়োজনের প্রয়োজন। যেমন ধরো খাবার-দাবার ও পথের আশ্রয়ের ব্যবস্থা। তাই আগের থেকে খোঁজখবর নিয়ে চিঠি লিখে ডাকবাংলো ঠিক করতে হবে। তারপরে রয়েছে কুলি-সমস্যা। সমস্যা বলা ঠিক নয়। কুলি পাওয়া যায় তবে আগের থেকেই বন্দোবস্ত করতে হয়। কাপকোট শ্রমিক সহায়ক সমিতির সম্পাদককে চিঠি লিখলে তিনি কুলি সংগ্রহ করে রাখেন। এই গেল বে-সরকারী বন্দোবস্তের কথা। এবারে সরকারী বন্দোবস্তের কথা বলছি। সীমান্ত জেলা বলে পিথোরাগড় সংরক্ষিত এলাকা। এ জেলায় যেতে হলে নোটিফাইড এরিয়া পারমিট নিতে

হয়। পিথোরাগড়ের জেলা শাসক এই পারমিট দিয়ে থাকেন। অন্তত মাস দুয়েক আগে তাঁর কাছে দরখাস্ত করতে হয়। যাঁরা পিথোরাগড় থেকে পদযাত্রা শুরু করেন, তাঁরা সেখানে পৌঁছে পারমিট নিয়ে যান। আর যাঁরা কাপকোট শামাধুরা হয়ে যান, তাঁরা পিথোরাগড় জেলায় প্রবেশ করে তেজাম থেকে পারমিট সংগ্রহ করে নেন। আমরা এই পথেই মুনসিয়ারী যাব। কাজেই আমাদের যাত্রাস্থল পিথোরাগড় জেলা হলেও আমরা পিথোরাগড় শহরে যাব না। আমাদের পদযাত্রা শুরু হবে আলমোরা জেলার সীমান্ত শামাধুরা থেকে।

কখন যাব? কেন অক্টোবর মাসে। প্রতি বছর যে সময় আমরা পাহাড়ে যাই। দুর্গম হিমালয়ে যাবার দুটি সময়, মে-জুন আর সেপ্টেম্বর-অক্টোবর। আমি কিন্তু অক্টোবর মাসটাই বেশি পছন্দ করি। এ সময় শীত একটু বেশি হলেও বর্ষা কম, কাজেই ধস নামে না। বর্ষা না থাকায় পদযাত্রায় বেশি সময় পাওয়া যায়। আর আকাশ—এমন স্বচ্ছ সুনীল আকাশ আর তুমি কখনও পাবে না হিমালয়ে। ফলে চারদিকের পর্বতশৃঙ্গের প্রকৃত রূপদর্শন করতে পারবে। তবে এ সময় ফুল তেমন পাওয়া যায় না। কিন্তু তুমি তো জান, ফুল পেতে হলে হিমালয়ে যেতে হবে বর্ষাকালে—জুলাই অগাস্টে।

বাগেশ্বর থেকে আমরা প্রথম বাসে রওনা হব শামাধুরা—দূরত্ব ২৬ মাইল। পথে পড়বে কাপকোট, সরযুর তীরে সমৃদ্ধ একটি গ্রাম। কয়েক বছর আগে কাপকোটই ছিল বাসপথের প্রান্তসীমা। এখন বাস যাচ্ছে শামাধুরা—আরও ১২ মাইল। সেখানেই পথ থেমে থাকে নি, এগিয়ে চলেছে মুনসিয়ারীর দিকে। অদূর ভবিষ্যতে মুনসিয়ারী পর্যন্ত বাস চলবে। অর্থাৎ মুনসিয়ারী মুসৌরী হবে। কাজেই তার আগে আমাদের ঘুরে আসতে হবে মুনসিয়ারী থেকে।

কাপকোট থেকে বিখ্যাত পিণ্ডারী হিমবাহের পদযাত্রা শুরু করতে হয়। সরযুর ওপারে বাসস্ট্যাণ্ড থেকে প্রায় মাইল খানেক দূরে চমৎকার একটি ডাক-বাংলো আছে। আমরা পিণ্ডারী পথযাত্রী নই, তাই আমরা সে ডাকবাংলোয় বাস করব না। তবে কুলি ঠিক করার জন্য একবার নামতে হবে কাপকোট বাসস্ট্যাণ্ডে। কাপকোট-শামাধুরা বাসপথ যাত্রীদের ভাগ্যের ওপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ যাত্রীরা ভাগ্যবান হলে, প্রকৃতি অনুগ্রহ করেন—পথ ঠিক থাকে, বাস চলে। প্রকৃতি বিরূপা হলে পথে ধস নামে—বাস বন্ধ হয়। পিঠে মাল বেঁধে যাত্রীদের তখন পথে নামতে হয়। কদম বাড়ায়ে বারো মাইল চড়াই-উৎরাই ভেঙে পৌঁছতে হয় শামাধুরা।

পথ প্রসারিত হচ্ছে। শামাধুরা থেকে বাসপথ যাচ্ছে তেজাম—আরও সাত মাইল। পিথোরাগড় থেকে বাসপথ আসছে সেখানে। সেখান থেকে পথ যাবে মুনসিয়ারী। অর্থাৎ পিথোরাগড় ও আলমোরা থেকে বাস চলবে মুনসিয়ারী। সেই সঙ্গে হিমালয়ের আর একটি বিচিত্র-সুন্দর পথের অপমৃত্যু ঘটবে।

যন্ত্রযানের সঙ্গে হিমালয়ের সম্পর্কটা সুমধুর নয়। কলের গাড়ির সওয়ার হয়ে হিমালয় পথের প্রকৃত সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করা যায় না। হিমালয়কে দেখতে হয় নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তার বিপদসঙ্কুল পথে এগিয়ে না গেলে, হিমালয় নিজেকে প্রকাশ করে না দর্শনার্থীদের কাছে। দেবতাকে পেতে হলে তপস্যা করতে হয়। দেবতাত্মা হিমালয়কে পাবার জন্যও সাধনার প্রয়োজন। পদযাত্রাই সে সাধনা।

কুলি যোগাড হলে, আমরা সেই বাসে করেই রওনা হব শামাধুরা। কুমায়ুনী ভাষায় ধুরা শব্দের অর্থ জঙ্গল। শামা গ্রামের উপকণ্ঠে জঙ্গলময় ভূখণ্ডের নাম শামাধুরা।

শামা একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম। উচ্চতা ৪৮৫০ ফুট। গ্রামের প্রায় প্রতি ঘরে রেডিও আছে। আছে অন্তত একটি করে ছেলে, যে সেনাবাহিনীতে যোগদান করেছে। শিক্ষার দিকেও গ্রামবাসীদের যথেষ্ট নজর আছে। একটি ছেলেদের ও একটি মেয়েদের স্কুল আছে এ গ্রামে। গ্রামের সীমা সরে যাচ্ছে ধুরার দিকে—বন কেটে বসত বসছে। শামার সীমা বাড়ছে আর ধুরার আয়তন যাচ্ছে কমে। গড়ে উঠছে একটি ব্যস্ত বাজার, সুন্দর শহর।

শামাধুরার ডাকবাংলোটি বাসস্ট্যাণ্ড থেকে প্রায় এক ফার্লং দূরে অবস্থিত। তবে ডাকবাংলোর কাছে কয়েকটি দোকান আছে। আর আছে বনাবৃত মূল-নারায়ণের মন্দির।

মন্দির শুনে তো তোমার আর তর সইবে না। তখনই যেতে চাইবে ছুটে। তবে হ্যাঁ, মন্দিরটি যেমন সুন্দর তেমনি প্রসিদ্ধ। বাৎসরিক উৎসবের জন্য বিখ্যাত এ মন্দির। সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিকে সে উৎসব হয়। পুণ্যার্থীরা দর্শন শেষে মনস্কামনা জানিয়ে মন্দির সংলগ্ন বনের কোন গাছে ছোট ছোট ঘণ্টা বেঁধে দেন। এখন মন্দিরের চারিপাশে ছোট-বড় গাছের শাখা-প্রশাখায় সহস্র ঘণ্টা ঝুলছে। বনে বাতাস জাগলে, ঘণ্টায় সাড়া জাগে। সহস্র ঘণ্টা লক্ষ কণ্ঠে ভগবানের সামগীতি গেয়ে ওঠে। সেই শাশ্বত সঙ্গীতের ধ্বনিতে অদূরবর্তী শামা নদীর কলতান যায় হারিয়ে।

পরদিন সকালে আমাদের যাত্রা হবে শুরু। ঝোলা কাঁধে লাঠি হাতে আমরা বেড়িয়ে পড়ব পথে। প্রথম তিন মাইল মসৃণ ও সমতল। তার পরেই উৎরাই। অবশেষে অসমতল পাকদাণ্ডি বেয়ে রামগঙ্গার বেলাভূমিতে নেমে যেতে হবে। রামগঙ্গা আলমোরা ও পিথোরাগড় জেলার সীমারেখা তথা ইনারলাইন। রামগঙ্গার ওপারেই পিথোরাগড় জেলা—নোটিফাইড এরিয়া। তাই পারমিট না থাকলে রামগঙ্গার পুল পেরনো উচিত নয়। আমাদের কাছে পারমিট না থাকলেও জেলা শাসকের চিঠি থাকবে। তেজামের তহশীলদারের কাছ থেকে আমাদের পারমিট সংগ্রহ করে নিতে হবে।

পুল পেরিয়ে পিথোরাগড় জেলায় প্রবেশ করব আমরা। পুলের এপারে রাউসল গ্রাম—দুখানি দোকান আছে। তারই একখানির দাওয়ায় বসে দুপুরে খাওয়া সেরে নেব।

এখান থেকে তেজাম (৩২৮০´) মাত্র দু মাইল। রামগঙ্গা ও জাকুলা নদীর সঙ্গমে অবস্থিত তেজাম একটি নির্মীয়মান শহর। তেজামে নেমে পারমিট নিতে হবে আমাদের।

তেজাম থেকে তিন মাইল এগিয়ে কুঈটি। স্কুল দোকান আর দাওয়াখানা নিয়ে একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম। দোকানে খাবার পাওয়া যায়, কাজেই তোমাকে হাত পুড়িয়ে রান্না করতে হবে না।

রাগ করলে বুঝি? আরে না না, আমি এমনি ও-কথা বললাম। রান্না করতে তোমার হাত পুড়বে কেন? পদযাত্রার পরিশ্রমের পরে নেহাৎ নিরুপায় না হলে, কে আর রান্না করতে চায় বল? পরিশ্রান্ত বলে সে-সন্ধ্যায় আমরা রান্নার হাঙ্গামা করব না। দোকান থেকে দাল-সবজি আর রোটি নিয়ে আসব। রাত্রিবাসের কোন অসুবিধে নেই কুঈটীতে। কুমায়ুনের অন্যান্য বড় গ্রামের মতো এখানেও একটি পঞ্চায়েত কোঠী বা অতিথিশালা আছে। গ্রামের সব চেয়ে বড ও ভাল ঘরখানি হল পঞ্চায়েতকোঠী। কুমায়ুনীরা অতিশয় অতিথিবৎসল।

শামাধুরা থেকে কুঈটী দশ মাইল। এই দশ মাইল পথের প্রতি ইঞ্চি জমি ছবির মতো সুন্দর। দু-দিকে খাড়া পাহাড় উঠে গেছে সপ্তলোকে। পাহাড় বেয়ে নেমে এসেছে চিরচঞ্চলা লাস্যময়ী ঝরণা, সদাই সপ্তসুর সৃষ্টি করে চলেছে। মাঝে মাঝে দু-একটি ধস। ধস ধ্বংসের প্রতীক। কিন্তু ধ্বংস যে সৃষ্টির স্রষ্টা—বিবর্তনের বার্তাবহ। ধ্বংস রূপহীন নয়। তাই

এ-সব ধ্বসেরও একটি নিজস্ব রূপ আছে। নিয়ত বিবর্তনশীল হিমালয়ের সেই পরিবর্তনটুকু ভাল লাগবে আমাদের। হিমালয় আর তার এই অবহেলিত পথের অপরূপ রূপে রূপতৃষা নিবারণ করব আমরা। সকল পথশ্রান্তি বিস্মৃত হয়ে চলব এগিয়ে। কখনও বা পথের পাশে কলাগাছ দেখে কিংবা ঘুঘুর ডাক শুনে শ্যামলা বঙ্গপল্লীর কথা তোমার মনে পড়ে যাবে। অথচ আমরা তখন বাংলা থেকে কতদূরে। কিন্তু তুমি তো জান, মনের মিল আর প্রাণের টান থাকলে —দূর কভু দূর নহে।

দ্বিতীয় দিন সকালে উঠেই দেখবে তোমার সারা শরীর, বিশেষ করে পা দুখানি ব্যথায় টনটন করছে। শরীরের কি দোষ বল! শরীরটাকে সুস্থ রাখার কোন চেষ্টাই যে আমরা করি না। খাইদাই, অফিস করি আর গাড়িতে ঘুরে বেড়াই। ট্রাম-বাসের কল্যাণে চরণ দুখানির ব্যবহার তো বিস্মৃত হয়েছি। একে হাঁটার অভ্যেস নেই, তার ওপর অসমতল চড়াই-উৎরাই পথ। গা-হাত-পা ব্যথা হবে না কেন? তাই তো তোমাকে বলি, পদযাত্রায় বের হবার অন্তত মাসখানেক আগের থেকে একটু ব্যায়াম করতে। সকাল সকাল উঠে ছাতে কিংবা বারান্দায় কিছুক্ষণ ব্যায়াম করা কি এমন কঠিন কাজ? করলে আর এই কষ্টটুকু সইতে হবে না। তবে তুমি তো তা করবে না, তোমার নাকি লজ্জা করে। লজ্জা নারীর ভূষণ। কিন্তু অহেতুক লজ্জা অনেক সময়েই কষ্টের কারণ হয়। কাজেই তোমাকে কষ্ট পেতে হবে। কিন্তু মজা কি জান—পাহাড়ী পথে পদচারণা শুরু করলে শরীরে যে ব্যথা হয়, কেবল পদচারণাতেই তার উপশম। এ যেন বিষে বিষক্ষয়। তাই ব্যথার ভয়ে কুঁইটীর পঞ্চায়েত-কোঠীতে বসে থাকলে চলবে না। পিঠে ঝোলা বেঁধে, লাঠি হাতে নিয়ে আবার বেরিয়ে পড়তে হবে পথে, কমনীয়া কুমায়ুনের পথে।

তবে তুমি ভয় পেও না। তোমার এই কোমল-অমল স্নিগ্ধ-সুন্দর শরীরটাকে কি আমি বেশি কষ্ট দিতে পারি? তাই দ্বিতীয় দিনে মাত্র পাঁচ মাইল হেঁটে গিরগাঁও পৌঁছে আমাদের যাত্রা স্থগিত রাখব। আর কুঁইটী থেকে পথ চলতে শুরু করে কিছুক্ষণের মধ্যে আপনা থেকেই তুমি ব্যথাকে বিস্মৃত হবে। এমন সুন্দর পাহাড়ী পথ তুমি খুব কমই দেখেছ। এই পথটিকে 'এপিটোম অব কুমায়ুন' অর্থাৎ কুমায়ুনের সংক্ষিপ্ত-সার বলা হয়।

সঙ্গীতময়ী জাকুলার তীর দিয়ে পথ। না উপত্যকার মধ্য দিয়ে পথ। উপত্যকা জাকুলার তীর ছুঁয়ে দিগন্তের কাছে গিয়ে পাহাড়ে মিশেছে।

হিমালয়ের সুন্দরতম উপত্যকা কয়টির অন্যতমা এই লা।

চীনারা তিব্বত জবরদখল করার পরে জোহার উপত্যকার বহু ভুটিয়া সওদাগর এই উপত্যকায় এসে বাসা বেঁধেছে। বংশ পরম্পরায় ওরা তিব্বতের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করে আসছিল। সমাজতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদীরা ওদের সেই পৈতৃক বৃত্তি বন্ধ করে দিয়েছে। প্রথম দিকে ওরা খুবই অসুবিধায় পড়েছিল। পরে ওরা বৃত্তি বদলেছে। চাষ-আবাদে মন দিয়ে লা উপত্যকার রূপ পালটে ফেলেছে।

কুঈটি থেকে মাত্র মাইল খানেক এগিয়ে জাকুলার ওপারে একটি ঝরণা দেখে তুমি ঝরণার মতই চটুল ও চপল হয়ে উঠবে। এমন অনিন্দ্যসুন্দর ঝরণা তুমি এর আগে আর দেখ নি। কেমন দেখতে সে ঝরণা? না, সে কথা এখন বলব না। সে ঝরণার রূপ বর্ণনীয় নয়—দর্শনীয়।

আরও দু মাইল এগিয়ে একটা পুল পেরিয়ে আমরা জাকুলার অপর তীরে আসব। আসার আগে পুলের ওপর দাঁড়িয়ে লা ও জাকুলাকে বিদায় জানাবো। তারপরে এপাড়ের চড়াই পথ পেরিয়ে পৌঁছব গিরগাঁও।

গিরগাঁও একটি ছোট্ট গ্রাম। এখানে স্কুল ডাকবাংলো ও কয়েকটি দোকান আছে। দোকানে খাবার কিনতে পাওয়া যায়। কাজেই রান্না করার ঝামেলা নেই। ভাবছ খাওয়া যেমন তেমন, থাকব কোথায়? কেন, ডাকবাংলোয়। বোঝাই থাকলে? আগে চিঠি লিখলে ডাকবাংলোয় ঠাঁই পেতে অসুবিধে হবে না। আর যদি একান্তই সেখানে আমরা ঠাঁই না পাই, তাহলে স্কুলবাড়ি তো রয়েছেই। মোট কথা রাত্রিবাসের কোন অসুবিধে হবে না।

তৃতীয় দিন সকালে ঘুম ভাঙ্গলে দেখবে, গায়ের ব্যথা অনেক কমে গেছে। সেদিন কিন্তু আমাদের সকাল সকাল বেরিয়ে পড়তে হবে। গিরগাঁও থেকে মুনসিয়ারী আট মাইল। পথ খুব সহজ নয়। আগের দিন জাকুলার পুল থেকে যে চড়াই পথ শুরু হয়েছিল, তা তখনও শেষ হয় নি। বরং তিন মাইল আরও বেশি চড়াই ভেঙ্গে আমাদের পৌঁছতে হবে সাড়ে আট হাজার ফুট উঁচু কালামুনি গিরিবর্ত্মে।

পৌঁছতে কিন্তু কষ্ট হবে না তোমার। কোন ক্লান্তি আসবে না তোমার দেহে আর মনে। পথের পাশে নানা রংয়ের নাম-না-জানা ফুল তুলতে তুলতে পথ চলবে তুমি। আর আমাকে তাদের রূপের বাহার দেখাতে গিয়ে ভুলে যাবে যে তুমি চড়াই পথে চলেছো। ফুলভারে তোমার বিনোনো-চুলের

সাজানো খোঁপাটি খসে পড়তে চাইবে। ততক্ষণে যে তার ওজন তোমার চড়াই-চঞ্চল চরণ দুখানির চেয়ে বেশি হয়ে উঠেছে।

হঠাৎ ফুল ফেলে ফুলবনে লুকিয়ে থাকা শামুকের দিকে দৃষ্টি দেবে তুমি। তাদের সচিত্র গড়ন দেখে দু-একটিকে সঙ্গে নিতে চাইবে। কিন্তু যেই না তুমি ধরার জন্য হাত বাড়াবে, অমনি তারা শুঁড় বাড়িয়ে গুটি গুটি চলতে শুরু করবে।

শামুকের শোক কিন্তু বেশিক্ষণ স্থায়ী হবে না তোমার মনে। তুমি দেখবে, পাখায় রামধনু রং মেখে প্রজাপতির দল যাওয়া-আসা করছে। শাড়ীর আঁচল মেলে তাদের ধরতে চাইবে তুমি। ওরা কিন্তু ধরা দেবে না।

চলতে চলতে পথের ধারে একখানি পাথরের পাশে তুমি কুড়িয়ে পাবে সজারুর কয়েকটি কাঁটা। খুশিতে উচ্ছল হয়ে উঠবে—যেন রাজৈশ্বর্য পেয়েছো। কাঁটা কটি হাতে নিয়ে পরশপাথর পাবার ভঙ্গিতে আমাকে বোঝাবে এলু-মনিয়মের কাটার চেয়ে সজারুর কাঁটায় 'হনিকুম্ব' কেন ভাল ওঠে।

কয়েক পা চলেই প্রসঙ্গ পরিবর্তন করবে তুমি। উলের হনিকুম্ব থেকে সত্যিকারের মৌচাক। তোমার নজরে পড়বে মৌমাছিদের আনাগোনা। ফুলে ফুলে মধু খেয়ে বেড়াচ্ছে তারা। অসংখ্য মৌমাছি, অনেক মৌচাক। একটা পাঁচমিশেলি মিঠে গন্ধে মাতাল হব আমরা। মধুপের গুঞ্জন তোমার মনে সুরের পরশ ছোঁয়াবে। তুমি মৌমাছির মতই গুনগুনিয়ে উঠবে। তুমি গাইতে গাইতে পথ চলবে আর আমি চলতে চলতে শুনব সেই গান।

একসময় আমরা পৌছব কালামুনি গিরিবর্ত্মে। তখন দেব-দিবাকর যদি থাকে আকাশে, আর আকাশ যদি থাকে মেঘমুক্ত, তাহলে তুমি বিস্ময়ে ও আনন্দে উতলা হয়ে উঠবে। দেখবে কুমায়ুনের রমণীয় শৃঙ্গমালা পঞ্চচুলির পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছ তুমি। পঞ্চপাণ্ডবের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত পঞ্চচুলি আমাদের আশীর্বাদ করছে। সূর্যের সোনালী আলোয় পঞ্চচুলির পাঁচটি রূপালী শিখর ঝলমলিয়ে উঠেছে তোমার চোখের 'জুম'-করা তারা দুটিতে। কিন্তু দেব-দিবাকর কৃপা না করলে তুমি দেখতে পাবে না পঞ্চচুলিকে—তুমি গুম হয়ে যাবে।

কালামুনি গিরিবর্ত্মের ওপরে উঠে আমরা বাঁয়ে বাঁক নেব। তারপরে ছোট ছোট গুটিকয়েক পাহাড়কে পাক খেয়ে, সোজা সাজানো পথে পা চালাব প্রায় দু মাইল। তারপরে শুরু হবে উৎরাই। একটানা মাইল তিনেক

উৎরাই ভেঙ্গে আমরা পৌঁছব মুনসিয়ারী। একটা ঝরণা পেরিয়ে, পশুপ্রজনন কেন্দ্রকে ডাইনে রেখে, ওপরের লেডিজ কলেজকে পাশ কাটিয়ে, সরকারী গুদাম-গুলোর গা ঘেঁষে আমরা শহরের জনবহুল অংশে এসে উপস্থিত হব। মহকুমা শহর মুনসিয়ারী, সীমান্ত শহর মুনসিয়ারী, ক্রমবর্ধমান শহর মুনসিয়ারী।

মুনসিয়ারীর স্থানীয় নাম টিকসেন। স্কুল-কলেজ, হস্টেল-হোটেল,হাসপাতাল সরকারী অফিস, দোকান বাজার ডাকবাংলো—সবই আছে এখানে। সালফার ও সালফাইড অব আর্সেনিকের খনি আছে এই মহকুমায়।

ডাকবাংলোটি কিন্তু শহর থেকে দূরে—দু মাইল নিচে, রাতি গ্রামে। আমরা সেখানেই আমাদের সাময়িক সংসার পাতবো। তাই সিঁড়ির মত ধাপে ধাপে পাথর বাঁধানো পথে আমরা নেমে যাব গৌরীগঙ্গার সৈকতে।

ডাকবাংলোর পরিবেশটি মনোরম। সামনে গর্জনময়ী গৌরীগঙ্গা আর পেছনে ও দুপাশে ধাপে ধাপে ক্ষেত—শ্যামল স্বপ্নময় হিমালয়।

রাতি মুনসিয়ারীর শহরতলি। আমরা কিন্তু রোজ কাজে-অকাজে শহরে আসব। কোনদিন বা হাঁটতে হাঁটতে চলে যাব ডাণ্ডিধরের শ্রীগীতা সৎসঙ্গ আশ্রমে। শ্রী১০৮ স্বামী বিদ্যানন্দ সরস্বতী গীতাধর্মের প্রচার ও প্রসারকল্পে ১৯৪৬ সালে প্রতিষ্ঠা করেছেন এই আশ্রম। কোনদিন বা আমরা উদ্দেশ্যহীন ভাবে কেবল পথে পথে ঘুরে বেড়াব। এক কথায় শহর হলেও মুনসিয়ারীকে খারাপ লাগবে না আমাদের। শহরবাসী আমরা। পাহাড়-সাগর, গ্রাম-গঞ্জ, বন-জঙ্গল যতই আমাদের ভাল লাগুক, শহরের প্রতি সহজাত আকর্ষণ যাবে কোথায়?

এই আকর্ষণের জন্য আমরা প্রবাস-বাসের পরে ঘরে ফেরার জন্য আকুল হই, হিমালয় থেকে ফিরে আসার সময় ব্যাকুল হই, ব্যস্ত হই—দুদিনের পথ একদিনে হাঁটতে চাই। এ ব্যস্ততার জন্য অনেক সময় চরম মূল্য দিতে হয়। জীবন দিয়ে হিমালয়কে উপেক্ষা করার খেসারত দিতে হয়।

এ কথা শুনে তুমি যেন আবার বলে বসো না—দরকার নেই বাপু পিথোরাগড় পরিক্রমায় বেরিয়ে। তার চেয়ে চলো গাড়োয়াল কিংবা হিমাচলে।

মুনসিয়ারী পর্যন্ত পথ সত্যই নিরাপদ। অথচ এমন সৌন্দর্যের আলয় সচরাচর চোখ পড়ে না। পথের স্নিগ্ধ-শীতল সমীর তোমাকে পথ চলার প্রেরণা যোগাবে। কুমায়ুনের মাটি ও পাহাড়, নদী ও পাখী, ফুল ও ফল

তোমার মনকে আনন্দময় করে তুলবে। আনন্দ-পরিক্রমা পূর্ণ করে আমরা নির্বিঘ্নে ফিরে আসব ঘরে।

কিন্তু আজ ঘরে ফেরার কথা নয়, আজ কেবল হিমালয়ে যাবার কথা, মুনসিয়ারীর কথা, শুধু আমাদের দুজনের কথা। এসো, আমরা সেই কমনীয়া কুমায়ুনের কথায় ফিরে আসি। তার গিরি-কান্তারের সীমাহীন সৌন্দর্যের কথায় ফিরে যাই। ফিরে যাই রাত্তি—যেখানে রাত কাটাবো আমরা।

রাস্তা থেকে ভাল দেখা না গেলেও রাত্তির ডাকবাংলোটি বড়ই সুন্দর। দুখানি ছোট-বড ঘর নিয়ে ছোট্ট ডাকবাংলো। সামনে সবুজ লন আর কেয়ারি করা মরশুমী ফুলের বাগান। তারপরেই গর্জনময়ী গৌরীগঙ্গা। ওপারে পাহাডের রেখা। দু'পাশে বাহারী পাহাড়ী ক্ষেত। তারই পাশ দিয়ে নেমে এসেছে পথ—পথ নয়, যেন ধাপে ধাপে পাথর বাঁধানো সিঁড়ি। সিঁড়ি বেয়ে আমরা নেমে এসেছি গৌরীগঙ্গার বেলাভূমিতে।

রাত্তির রাত···না, রাত নয়। আগে বিকেলের কথা হোক। রাত্তির বিকেল বর্ণাঢ্য। বনপথের দু'পাশে ডাকবাংলোর সামনে জানা-অজানা রং-বেরংয়ের ফুল। তারা হেলে-দুলে তোমাকে স্বাগত জানাবে এই স্বর্গাশ্রমে।

রাত্তির গোধূলি গন্ধময়। বিকশিত-ফুলদল-গন্ধে তোমাকে মহুয়া-মাতাল করে তুলবে।

রাত্তির সন্ধ্যা সঙ্গীতময়ী। কুলায়-ফেরা পাখীদের কাকলির সঙ্গে ঘরে-ফেরা মেহনতী মানুষের গান মিলে সে তখন সুরলোক।

রাত্তির রাত নিরুদ্বিগ্ন হলেও নিঃশব্দ নয়। সুরধুনী গৌরীগঙ্গাকে তখন তোমার বড়ই ভাল লাগবে। মনে হবে সে শিয়রে বসে ঘুমপাড়ানি গান গাইছে। আমরা ঘুমিয়ে পড়লেও সে রইবে জেগে—মঙ্গলগীতি গাইবে। আমাদের মঙ্গলকামনা করবে।

রাত্তির সকাল? হ্যাঁ, রাত্তির রাত পোহালে আমাকে না জাগিয়ে তুমি চুপি চুপি দরজা খুলে বারান্দায় বের হবে। সামনের সিঁড়িতে বসে উষার আকাশে রংয়ের খেলা দেখবে। দেখবে চারিপাশের পাহাড়ের গায়ে আলোর লুকোচুরি আর বনের বুকে পাখীদের ছুটোছুটি। তুমি কান পেতে তাদের কাকলি শুনবে। শুনবে গৌরীগঙ্গার গান।

সেই সমবেত সঙ্গীত শুনতে শুনতে হঠাৎ তোমার খেয়াল হবে আমি

তখনও ঘুমিয়ে। তুমি তাড়াতাড়ি ঘরে এসে ডেকে তুলবে আমাকে। দুজনে বেরিয়ে আসব বারান্দায়।

স্বাতির দিন তখন শুরু হয়ে গেছে। গাঁয়ের মেয়ে-পুরুষরা চলেছে ক্ষেতে—যেখানে লাল আর হলুদের মেলা মিলেছে। তুমি ওদের সঙ্গী হবে। আমাকে নিয়ে চলবে তোমার সঙ্গে। ছেলেরা আমাদের সেলাম জানাবে, মেয়েরা নোলক দুলিয়ে, ঘুঙুর বাজিয়ে মুচকি হাসবে। তুমি ওদের সঙ্গে আলাপ করবে। ওদের হাসি-কান্নায় মেশা জীবনকাহিনী জানবে, ওদের ফসল তোলার গান শুনবে, নাচ দেখবে—অনুকরণ করতে চাইবে। ওরা তোমার দশা দেখে হেসে একে অন্যের গায়ে পড়বে গড়িয়ে।

এমনি হাসি আর গানের মধ্যে আমাদের স্বপ্নভরা দিনগুলো যাবে ফুরিয়ে। এক সকালে হঠাৎ খেয়াল হবে—ফিরে যাবার দিন সমাগত। তোমার মুখের হাসি যাবে হারিয়ে, কণ্ঠের সুর যাবে মিলিয়ে—আনন্দের অবসান হবে।

নিরানন্দ ছেলে-মেয়েদের ভিড়ে ভরে যাবে বাংলো। মেয়েরা আমাদের জিনিসপত্র দেবে গুছিয়ে, ছেলেরা দেবে বেঁধে।

অবশেষে সজল চোখে ওরা বিদায় দেবে আমাদের। তোমার চোখ দুটিও উঠবে ভিজে। তুমি আঁচলে চোখ মুছবে।'